ভজন সন্দর্ভ

প্রথম বেদ্য (খণ্ড)

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

ভজন সন্দর্ভ

প্রথম বেদ্য (খণ্ড)

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রামাণিক আচার্য্যগণের প্রকাশিত সর্ব্বসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহে গুম্ফিত, সকল সন্দেহ ও অপসিদ্ধান্ত মীমাংসক এবং ভজনের বিষয় সকল সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তত্ত্ব-ত্রয়ে বিভাগ পূর্ব্বক বিচার সম্বলিত অভিনব গ্রন্থ। প্রথম বেদ্যে (খণ্ডে) মহাজনগণ অনুমোদিত ও প্রকাশিত প্রমাণতত্ত্ব, সম্প্রদায় বিচার ও স্বীকার এবং তদাবশ্যকীয়তা, নানা-প্রকার সম্প্রদায়ের উৎপত্তির মূল ও বিস্তৃতি উদ্ধৃত হইয়াছে। নানাপ্রকার মতবাদ, দার্শনিক-মতবাদ, অপসম্প্রদায়, মায়াবাদ, প্রভৃতির সুবৈজ্ঞানিক বিচারে মীমাংসিত ও শোধিত হইয়াছে। শুদ্ধ সাত্বতসম্প্রদায় ও তাঁহাদের মতবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে সর্ব্ব-দর্শন সমন্বয় কারক গৌড়ীয়-দর্শন দ্বারা সকল সিদ্ধান্তের সুমীমাংসিত মহাজন বাক্য উদ্ধার দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের

অনুকম্পিত

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ

কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, ঈশোদ্যান, পোঃ—শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া হইতে প্রকাশিত ও পোড়ামা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, চরস্বরূপগঞ্জ হইতে মুদ্রিত।

উপ-সংগ্রহ

আমি সর্ব্বদোষের আকর, গুণলেশহীন ও সর্ব্বাধম হইলেও যাঁহার কৃপা ও প্রেরণায় এই গ্রন্থ-লেখনরূপ কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি সেই সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত সর্ব্বসিদ্ধান্তবিৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার একমাত্র আশ্রয় হউন। যাঁহার কৃপা-প্লাবনে নিমজ্জিত হইয়া নিজের অযোগ্যতাহেতু ক্ষুব্ধচিত্তে মহা-আশার সঞ্চার করিয়াছে, সেই নিত্যপ্রভুর পাদপদ্ম আমার সর্ব্বক্ষণ জীবাতু হউক।

পূর্ব্বাচার্য্য গুরুবর্গ যে সকল অমূল্য মহানিধি বিতরণ করিয়া সুকৃতিশালী জীবগণকে মহাধনে ধনী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পাদপদ্মের ধূলি মস্তকে ধারণ করত সেই সকল রত্ন সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থন-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। তাঁহার সুখবিধানরূপ সেবায় ভক্ত্যুম্মুখী আশীর্ব্বাদ লাভার্থে এই উপসংগ্রহ (পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম) জ্ঞাপন করিতেছি। বৈষ্ণবগণ অদোষ-দর্শিতা গুন প্রকট করিয়া কৃপা-প্রকাশপূর্ব্বক এ দীন-হীনকে অনুগৃহীত করুন, ইহাই প্রার্থনা। অযোগ্যতা নিবন্ধন বহু দোষ ত্রুটি থাকার বিশেষ সম্ভবনা থাকিলেও পরমবান্ধব বৈষ্ণবগণ তাহা শোধন করিয়া আমাকে তাঁহাদের পাল্যজ্ঞানে পালন করিবেন, ইহাই ভরসা।

এই গ্রন্থে প্রথমে প্রমাণতত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিচরণ তৎকৃত তত্ত্বসন্দর্ভে যে সকল প্রমাণতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন এবং অন্যান্য শ্রীরূপানুগ শ্রীগৌরপার্ষদগণ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্বল করিয়া 'প্রমাণ-প্রভাকর' নামক প্রথম অধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে। পূর্ব্বগুরুবর্গ যে সকল সিদ্ধান্তামৃত প্রকট করিয়াছেন, তাহাই ক্রমশঃ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব ত্রয় বিভাগে বিশ্লেষিত ও প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে দ্বিরুক্তি ও ক্রমভঙ্গদোষ আমার অযোগ্যতা নিবন্ধন বহুস্থানেই প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষমাশীল করুণাময় পাঠকবর্গ কৃপাপূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

গ্রন্থটী দার্শনিক বিচার-প্রধানরূপে প্রকটিত হওয়ায় লীলারসাস্বাদী রসিকভক্তবৃন্দের সম্যক্ আনন্দ বিধান করিতে সমর্থ না হইলেও লীলা পোষক সিদ্ধান্তগুলি অপ্রাকৃত রসপ্রকাশের সহায়ক হইবে। ইহা দ্বারা প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, রসিক, কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম সর্ব্ববিধ ভক্তের সেবা করিতে প্রযত্ন করা হইয়াছে। সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া যাহা যাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা সমস্তই এই গ্রন্থে গ্রন্থন করার চেষ্টা হইয়াছে। সর্ব্ববিধ প্রশ্নের সুমীমাংসা শাস্ত্র ও যুক্তিমূলে বিধান করিবার যত্ন হইয়াছে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে বর্ণিতব্য বিষয় যথাসম্ভব সঙ্কোচ করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থকলেবর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের সুবিধার জন্য প্রমাণবাক্যরূপে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক সমূহের বঙ্গানুবাদ যথা-সম্ভব সরল ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোক যথাসম্ভব কম দেওয়ারই চেষ্টা হইয়াছে। তথাপি পাঠকগণের সন্দেহনিরসন ও বিশ্বাসোৎপাদনার্থ যেগুলি বিশেষ আবশ্যক ও অনিবার্য্য প্রয়োজনরূপে বিবেচিত হইয়াছে, তাহা সরল এবং সুখবোধ্য বঙ্গানুবাদসহ দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন স্থলে পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রকটিত ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে মুগ্ধ ও তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ বর্ণন-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের সেই অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের হানি হইবার আশঙ্কায়ই তদ্বর্ণিত পয়ার ও ভাষা অবিকল উদ্ধার পূর্ব্বক তৎসমুদয়ের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

ভজনকারীর ভজন প্রতিকূল বিষয় ও ভাব যতপ্রকার বাধা প্রদান করিতে পারে, তাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ যত-প্রকার সুবৈজ্ঞানিক বিচারে উথাপন করিয়া তাহার বিশেষ বিশ্লেষণ ও নিরাশ করিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহা যথাসম্ভব সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং ভজনানুকূল যতপ্রকার সিদ্ধান্ত বিচার ও আচরণ দ্বারা ভজন বৃদ্ধির সহায়করূপে বিভিন্ন আচার্য্যগণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও যথাসম্ভব চিদ্বৈজ্ঞানিক বিচারমূলে সুমীমাংসিতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। একই বিষয় বিভিন্ন আচার্য্যগণ বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন যুক্তিতে, যাহা সিদ্ধান্তিত করিয়াছে, তাহার

বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন-দ্বারা এই গ্রন্থের গাম্ভীর্য্য, উপাদেয়তা ও উপযোগিতার মাহাত্ম্য সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত করিবার বিশেষ যত্ন হইয়াছে।

গ্রন্থ কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে কয়েকটি বেষ্টে (খণ্ডে) মুদ্রিত হইল। তাহাতে মুদ্রণব্যয় ও গ্রহীতার অর্থ গ্রহণ ব্যাপার সহজ হইবে। এই গ্রন্থরাজ ছয়টি বেষ্টে (খণ্ডে) প্রকাশিত হইলেন। প্রথমটি প্রমাণ ও তত্ত্ব নির্ণায়ক। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী ভগবত্তত্ত্ব; তন্মধ্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তার বিচার, ভগবদাবতারাবলী; স্বয়ং-ভগবত্তার-বিচার ও তাহার বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও যুক্তি-বিচারাদি-মূলে মহাজনগণ যে সকল নিরাশ করিয়া বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়াছেন, সেইভাবে সম্বন্ধ-তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। ভগবৎপরিকর, শক্তি, ধাম ইত্যাদির বিষয় সিদ্ধান্তিত করা হইয়াছে। চতুর্থ ও পঞ্চম বেষ্টে অভিধেয়তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। বিভিন্ন আচার্য্যগণ অভিধেয়তত্ত্বের চিদ্বৈজ্ঞানিকভাবে যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা এবং অভিধেয়সার ভক্তির বিভিন্ন প্রকার, অঙ্গ ও বিভাগাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ভক্তির যতপ্রকার প্রতিকূল ও অনুকূল বিষয়াদি আছে, তৎসমুদয়ের যথাসম্ভব বিশ্লেষিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ষষ্ঠ বেষ্টে প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ও পন্থায় যাহা প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সকলের তুলনা-মূলে বিচার করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোপাদেয় পরম প্রয়োজনের বিষয় চিদ্বৈজ্ঞানিকমূলে সিদ্ধান্তিত মহাজনবাণীগুলি উদ্ধার করা হইয়াছে। বিভিন্ন আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত বিষয়গুলি উদ্ধার করিয়া তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা প্রকাশিত করা হইয়াছে।

মহাজনগণের প্রকাশিত গ্রন্থসকল বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। অন্নগত-প্রাণ. দুর্ব্বল, পরমার্থে অলস, নানাব্যাধিতে আক্রান্ত, অর্থাভাবে ক্লিষ্ট কলিহত-ব্যক্তিগণের পক্ষে পরমার্থ-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার সারসংগ্রহ করতঃ তদনুযায়ী জীবন-যাপন করিবার পথে বহু বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরমার্থপথের পথিকগণের পক্ষে এত বাধাবিঘ্নের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া পরমার্থ পথে অগ্রসর হইয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য এই গ্রন্থরাজ উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করতঃ সুপথ প্রদানে পরম বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করিবে।

মায়াদেবী বহুপ্রকার মোহিনী বিদ্যাদ্বারা জীবমোহনার্থে নানা-পন্থা আবিষ্কার করিয়া তদ্দ্বারা হতভাগ্য মনুষ্যগণকে আকৃষ্ট করিয়া মুগ্ধ করিতেছেন। তাদৃশ দুর্ভাগ্যক্রমে অপসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকেই সৎপন্থা মনে করিয়া সেই মত পোষক শাস্ত্র ও সঙ্গ-দ্বারা মায়ার দৃঢ় পাশে আবদ্ধ হইয়া সৎপথ-গ্রহন ও সদুপদেশ লাভে বঞ্চিত হইতেছেন। শ্রেষ্ঠ-শুদ্ধ-সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের বিচার শ্রবনের সুযোগ ও রুচি না হওয়ায় নরকের পথের পথিক হইয়া অনন্তকাল দুঃখ প্রাপ্তিই লাভ হইতেছে। একারণ পরদুঃখে দুঃখী মহাজনগণ সমস্ত মতবাদের বিচার বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক যাহা চরম উপায় ও উপেয় বলিয়া মঙ্গলময় পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহাই সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণাদিদ্বারা গুম্ফিত হইয়াছে।

কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ সৎসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াও প্রকৃত-তথ্য ও সিদ্ধান্তের সম্যক সন্ধান না পাওয়াতে গতানুগতিক উপায়ে বৃথা কালযাপন ও জীবন নষ্ট করিতেছেন। অপসম্প্রদায়ের প্রবল যুক্তি ও সেনাপতিগণের মধু-পুষ্পিত ইন্দ্রিয়তর্পণময়ী বাক্য শ্রবণে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃত সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেহ বা বাহিরে কেহ বা অন্তরে অপসম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। এই গ্রন্থরাজ তাঁহাদিগকে পরম মঙ্গলময় শ্রেয়ঃ পন্থার সন্ধান, বল-প্রদান ও শক্তি সঞ্চারণে উপরিউক্ত সর্ব্বনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন।

আশাকরি সর্ব্বপ্রকার সাধকই এই গ্রন্থে তাঁহাদের সকল বিষয়ের সুমীমাংসা লাভ করিয়া পরম উপকৃত হইবেন। তারতম্য বিচার ও শুদ্ধাশুদ্ধবিচারাদি অবগত হইয়া নিজ ভজন শোধন ও উন্নতি লাভ করিয়া পরম উপকৃত ও পরমানন্দিত হইবেন। ইহাই আশা করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রীতিলাভে কৃতার্থ হইতে মহাজনগণের সিদ্ধান্ত সকল সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রন্থিত করিয়া পাঠকগণের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

বৈষ্ণবপদরেণু ও কৃপাপ্রার্থী

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী।

বিষয়-জ্ঞাপনী (সূচী)

প্রথম প্রকাশ—প্রমাণ-প্রভাকর—১—২৬ পৃষ্ঠা।

প্রশ্নষট্‌ক—১-২। দশপ্রকার প্রমাণ—২-৩। দোষ চতুষ্টয়ঃ—ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—৩। শব্দ-প্রমাণ বেদ—৩-৪। ষড়ঙ্গ বেদ—৪। ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণিকতা—৫। পুরাণ প্রমাণ—৬-৭। শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ-চক্রবর্ত্তী-চূড়ামণি—৬-১৪। পঞ্চরাত্র—১৪-১৬। প্রামানিক শাস্ত্র সম্বন্ধে শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিমত—১৭-২৩। অন্যান্য প্রামাণিক শাস্ত্র—২৩-২৬।

দ্বিতীয় প্রকাশ—সম্প্রদায় নির্ণয়। ২৬—৩৯।

দ্বাদশ মহাজন ও সাত্বত সম্প্রদায় চতুষ্টয়—২৬। শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী—২৭-২৮। শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্ব-সম্প্রদায়-স্বীকৃতি—২৮-৩৯।

তৃতীয় প্রকাশ—সম্প্রদায় বিস্তৃতি—৩৯—৫৭।

আচার্য্যগণের দ্বাদশ সিদ্ধান্তের নিরূপণ—৩৯-৪০। ঐতিহাসিক পরমার্থ—৪০-৪১। পঞ্চরসের ইতিহাস—৪১-৪৩। দর্শন—৭৩-৪৬। তান্ত্রিকমত—৪৬-৪৭। ভাববাদ—৪৭। সৎ-অসৎবাদ, জড়বাদ, সন্দেহবাদ ইত্যাদি নানা মতবাদ—৪৭-৪৮। ষড়্‌দর্শন (সংক্ষেপ)—৪৯-৫০। যুক্তি—৫০-৫৪। জড়ভজনবাদী—৫৪-৫৫। অদ্বৈতবাদ—৫৫-৫৭।

চতুর্থ প্রকাশ—দার্শনিক মতবাদ—৫৭—১১২।

দর্শন—৫৭। আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন—৫৮। ষড়্‌-দর্শন—৫৮। বিভিন্ন দার্শনিকের বেদ স্বীকৃতির তারতম্য—৫৯-৬২। দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তির মূল—৬২-৬৩। সাংখ্যদর্শন—৬৩-৬৫। সাংখ্যমত খণ্ডন—৬৫-৬৬। পতঞ্জলির যোগদর্শন—৬৭-৬৯। অক্ষপাদ গৌতমের ন্যায়দর্শন—৬৯ ৭১। ঔলুক্য কণাদের বৈশেষিকদর্শন—৭১-৭২। পরমাণু-কারণ বাদ—৭২। জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসা—৭২-৭৫। বেদান্তদর্শন বা উত্তরমীমাংসা—৭৫-৭৬। চার্ব্বাক মত—৭৬-৮০। জৈন-দর্শন—৮০-৮১। জৈন মতের দূষণ—৮১-৮৪। পাশুপত মতবাদ—৮৪। বৌদ্ধ-দর্শন—৮৪-৮৮। বৌদ্ধ ও জৈনমত খণ্ডন—৮৮-৯২। পঞ্চোপাসনা—৯২-৯৩। শাক্তিমতবাদ—৯৩-৯৪। সৌর মতবাদ—৯৪-৯৫। গাণপাত্য মতবাদ—৯৫-৯৬। শৈব মতবাদ—৯৬-৯৭। পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণব মত—৯৭-৯৯। তার্কিক মত—৯৯-১০১। ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্যকারগন—১০১। প্রস্থান ভেদ,—১০১। প্রাচীন বেদান্তাচার্য্যগণ—১০১-১০২। শঙ্কর-পূর্ব্ব ভাষ্যকারগণ—১০২। ব্রহ্মসূত্রের অনিবার্য্য স্বতঃসিদ্ধ-সিদ্ধান্ত—১০৩-১০৪। শঙ্করোত্তর বেদান্ত ভাষ্যকারগন—১০৫। মায়াবাদের প্রতিবাদকারী মহাজন ও আচার্য্যগণ ১০৫। আরম্ভবাদ, পরিনামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ—১০৫-১০৬। ভাস্করাচার্য্যের মতবাদ—১০৬-১০৭। শঙ্করমতের সহিত ভাস্কর মতের পার্থক্য—১০৭-১০৮। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ ও সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ—১০৮। শ্রীকণ্ঠের মতবাদ—১০৮-১০৯। শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ ও শ্রীকণ্ঠের মতের পরস্পর পার্থক্য—১০৯। রামানন্দের মতবাদ—১০৯-১১০। শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুর মত—১১০। শ্রীশঙ্কর ও শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু—১১১। শ্রীরামনারায়ন মিশ্রের 'সূক্ষ্মতমা' বৃত্তি—১১১ ১১২। সমঞ্জসাবৃত্তি—১১২।

পঞ্চম প্রকাশ—সৎসম্প্রদায় বিচার—১১২—১৭৪।

সাত্বত-সম্প্রদায়—১১২-১১৩। শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—১১৩-১১৪। শ্রীরামানুজীয় মত সংক্ষেপ—১১৪। চিদ্‌বিষয়ে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্ত—১১৪-১১৫। অচিদ্‌ বিষয়ে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্ত—১১৫। ঈশ্বর-বিষয়ে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্ত—১১৫-১১৬। পরিণাম-বাদ—১১৬। উপাসনা—১১৬। প্রয়োজন—১১৬। শ্রীরামানুজাচার্য্যের কতিপয় উপদেশ—১১৬-১১৮। গুরুপরম্পরা—১১৮। শ্রীমধ্বাচার্য্য ও মতবাদ—১১৮। মধ্বমত-সংক্ষেপ (ব্রহ্ম জীব, জগৎ ও মায়া —১১৯। শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বমতের পার্থক্য—১১৯-১২১। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত (জগৎ, জীব, ঈশ্বর ও মায়া)—১২০। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সদাচারাদি—১২৩। শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্ত (জীব, জড়, ঈশ্বর, উপাসনা, গুরুপরম্পরা—১২৪-১২৫। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ—১২৬-১২৯। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুর সিদ্ধান্ত (ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম, সম্বন্ধ, বিষয়, প্রয়োজন ও ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তি)—১২৯-১৩১। শ্রীবল্লভাচার্য্য-সিদ্ধান্ত—জীব ও মায়া—১৩১-১৩৪। পুষ্টিমার্গ—১৩৪-১৩৬। শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—১৩৬-১৩৮। তুলনামূলক আলোচনা (আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত)—১৩৮-১৩৯। ঐ ইষ্ট—১৩৯-১৪০। ঐ শাস্ত্র বা প্রমাণ—১৪০-১৪১। ঐ 'তত্ত্বমসি'র ব্যাখ্যা—১৪১-১৪২। ঐ ঐক্য, অনৈক্য ও বৈশিষ্ট্য—১৪২-১৪৫। শ্রীবল্লভাচার্য্য ও নিম্বার্ক হইতে শ্রীগৌড়ীয়সিদ্ধান্ত ও ভজনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য—১৪৫-১৪৬।

ষষ্ঠ প্রকাশ—সর্ব্বদর্শন সমন্বয়-কারক গৌড়ীয়-দর্শন—১৪৬-১৭৪।

শ্রীগুরুতত্ত্ব—১৪৬-১৪৭। স্ফোটবাদ-বিচার—১৪৭-১৫৩। গৌড়ীয়াচার্য্য ও মহাপ্রভুর স্ফোটের বিচার, জড়াকার, চিদাকার ও শব্দার্থ, শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই হরির কীর্ত্তন, কৃষ্ণতত্ত্ব কর্ম্মান্তর্গত নহে—১৫৩। গৌড়ীয়-দার্শনিকের বৈশিষ্ট্য, শব্দব্রহ্মের নিত্যারাধনাই কর্ত্তব্য, লীলাপ্রবেশ, সাধুসঙ্গই মূল, জড়াভিজ্ঞান ও গুরুকৃষ্ণের কৃপাসঞ্চারিত অভিজ্ঞান—১৫৪।

গৌড়ীয় ও অগৌড়ীয় দর্শন, সর্ব্ব-সমন্বয়, শ্রবণানুগ্রহে দর্শন, বদ্ধাভিমান কাল—১৫৫। অক্ষজ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, খণ্ডিতজ্ঞান, মায়ার অবকাশ, অধিরোহ-তর্কবিতর্ক, সেবোন্মুখতা—১৫৬। নায়ক-পূজা, মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণ—১৫৭। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, মহাজন-শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ, হরিকথা-শ্রবণকারী—১৫৮। ভক্তসঙ্গ, আরোহবাদী—১৫৯। গৌড়ীয় নির্ম্মল, গুরুবাদ, গুরুতত্ত্ব—১৬০। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত, শৈবমতবাদ-বিচার—১৬১-১৬২। ভগবানই মূল, নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার ও গতি, কৃষ্ণানুশীলনই পূর্ণমঙ্গল সাধক, শরণাগতি,—১৬৩। সেবা, কর্ম্ম, জ্ঞান, সর্ব্বকেন্দ্রী বিষ্ণু, নির্ব্বিশেষ বাদ বহু নাস্তিক্যমতবাদের জনক, পূর্ণ উপাসনা, পরিণামবাদ—বহু-বৈচিত্র্যের একত্ব-কিরূপে সম্ভাবনা, ত্রিতাপের আকর, পরমাণুর ব্যবধান, অদ্বয়জ্ঞানাভাব, চিন্মাত্রবাদ ও চিদ্বিলাস—১৬৫। অধোক্ষজরাজ্যে জড়াভাব, শ্রৌতশব্দের আবশ্যকতা, গুরুপাদপদ্মের পূর্ণতমসেবা, শ্রীরাধাগোবিন্দের ও শ্রীসীতারামের অবতার-কারণ ও বৈশিষ্ট্য—১৬৬। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষগতি, রসোৎকর্ষ প্রদর্শন—১৬৭। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অনুভব, প্রকৃতি ও পুরুষ বিচার—১৬৮। গৌড়ীয়-দর্শনের বৈশিষ্ট্য, রহস্য ও স্বরূপ—১৬৯। বাস্তবতা, সম্পূর্ণতা, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, ও ঔদার্য্য; বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তির ভূমিকা ও ফল—১৭০। অপ্রাকৃত দর্শন, পদ্মানীতি, সর্ব্ববিভক্তিতে গৌড়ীয়-দর্শনের সমন্বয়, গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয় ও সেবা—১৭১। সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রীতি, বেদদৃক ও মাংসদৃক—১৭২। ভক্তিচক্ষু, প্রকৃত মহাবাক্য, শ্রীকৃষ্ণ নামের বৈশিষ্ট্য, অচিন্ত্যত্ব; বেদসংহিতা—১৭৩। পঞ্চরাত্র, ভাগবত ও বেদান্তে গৌড়ীয়-দর্শনের কথা—১৭৪।

সাঙ্কেতিক-চিহ্নের পরিচয় +

ইঙ্গিত-স্বরূপ বোধিকা

অণুঃ ভাঃ = অণুভাষ্যম্। অঃ প্রঃ ভাঃ = অমৃত প্রবাহ ভাষ্য। অণুঃ ভাঃ = অণুভাষ্য। ঈঃ = ঈশোপনিষদ্। উঃ নীঃ মঃ = উজ্জ্বল নীলমণি। কৃঃ সং = কৃষ্ণ সংহিতা। কঃ কঃ তঃ = কল্যাণ কল্পতরু। গীঃ = গীতা। গীঃ বঃ = গীতাবলী। গোঃ পূঃ তাঃ = গোপাল পূর্ব্বতাপনী। গোঃ ভাঃ = গোবিন্দ ভাষ্য। গৌঃ গঃ দীঃ = গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। গঃ পুঃ = গরুড় পুরাণ। চৈঃ উঃ = চৈতন্যোপনিষদ্। চৈঃ চঃ = চৈতন্য চরিতামৃত। চৈঃ ভাঃ = চৈতন্য ভাগবত। চৈঃ শিঃ = চৈতন্য শিক্ষামৃত। চৈঃ মঃ = চৈতন্য মঙ্গল। ছাঃ = ছান্দোগ্যোপনিষৎ। জৈঃ ধঃ জৈব ধর্ম্ম। তঃ দীঃ নিঃ = তত্ত্বার্থ দীপিকা নিবন্ধ। তঃ সঃ = তত্ত্ব সন্দর্ভ। তঃ মুঃ = তত্ত্ব মুক্তাবলী। তঃ বিঃ = তত্ত্ব বিবেক। তৈঃ = তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। তৈঃ আঃ = তৈত্তিরীয় আরণ্যক। নৃঃ পুঃ = নৃসিংহ পুরাণ। নৃঃ তাঃ = নৃসিংহ তাপনী। পরঃ সঃ = পরমাত্ম সন্দর্ভ। প্রীঃ সঃ = প্রীতিসন্দর্ভঃ। বিঃ পুঃ = বিষ্ণু পুরাণ। বৃঃ = বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। বৃঃ ভাঃ = বৃহদ্ভাগবতামৃত॥ বেঃ কাঃ = বেদান্ত-কামধেনু। বেঃ স্যঃ = বেদান্ত স্যমন্তক॥ বিঃ সঃ = বিষ্ণু সহস্রনাম। ব্রঃ সূঃ = ব্রহ্মসূত্র। ব্রঃ সং = ব্রহ্মসংহিতা। ভঃ সঃ = ভগবৎ সন্দর্ভ। ভাঃ দীঃ = ভাবার্থ দীপিকা। ভঃ সঃ = ভক্তি সন্দর্ভ। ভঃ রঃ সি = ভক্তি রসামৃত সিন্ধু॥ ভঃ রঃ = ভক্তি রত্নাকর। মঃ ভাঃ = মহাভারত। মঃ শিঃ = মহাপ্রভুর শিক্ষা। মঃ তাঃ নিঃ = মহাভারত তাৎপর্য্য নির্ণয়। মঃ ভাঃ = মধ্বভাষ্য। মহাঃ নাঃ = মহানারায়ণোপনিষৎ। মাঃ = মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। মুঃ = মুণ্ডক। লঃ ভাঃ = লঘু ভাগবতামৃত। শাঃ ভাঃ = শাঙ্কর-ভাষ্য, শারীরক ভাষ্য। শাঃ পঃ = শান্তি পর্ব্ব। শঃ গঃ = শরণাগতি। শ্রীঃ ভাঃ = শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীঃ ভাঃ মঃ মাঃ = শ্রীভাগবতার্ক মরীচিমালা। শ্বেঃ = শ্বেতাশ্বরোপনিষৎ। সর্ব্বঃ সঃ সং = সর্ব্ব সম্বাদিনী। সঃ দঃ = সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ। সাঃ দীঃ = সারার্থ দীপিকা। সাঃ দঃ = সারার্থ দর্শিনী। সাঃ বঃ = সারার্থ বর্ষিনী। সিঃ রত্ন = সিদ্ধান্ত রত্ন। সূত্র ভাঃ = সূত্রভাষ্য।

মুদ্রণ-শোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	১৪	জ্যাতি	জ্যোতি	১০৬	৩১	বৈরান্তিক	বৈদান্তিক
১৪	২৩	তহাই	তাহাই	১০৬	৩২	ফাষ্যকার	ভাষ্যকার
১৭	৩০	উৎপাতে	উৎপাতের	১০৬	৩৪	ভেদা-উপাধিক	ভেদ-ঔপাধিক
২৫	২	From	Form	১০৮	২৯	ভীষণ	বিশেষ
২৫	৩০	অকৃপাত	অপ্রাকৃত	১১৫	১১	ভাবাকৃত	ভাবকৃত
২৭	২৫	নরেত্তম	নরোত্তম	১২১	১	শক্তির	শক্তির
২৮	১৬	সমম্ভূব	স্বয়ম্ভূব	১২১	২৮	অগ্নি	অগ্নি
৩৪	২৭	নিত্যা	নিত্যো	১২৫	২২	প্রেযাজনের	যাজনের
৩৭	২৭	শ্রীবাস	শ্রীব্যাস	১২৯	১	লীলাকলে	লীলাকালে
৩৭	৬৬	শ্রীমন্ম আচার্য্য	শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য	১২৯	১	কেবল দ্বৈতাবাদী	কেবলাদ্বৈতবাদী
৪৪	১১	কাদানশাস্ত্র	কণাদশাস্ত্র	১২৯	৩০	অদ্বিতী	অদ্বিতীয়
৪৯	১১	উপাসিদ্ধের	উপাস্তসিদ্ধের	১৩০	১১	স্বাতন্ত্রা	স্বতন্ত্রা
৫৭	৩২	অপ্রকুত ব্যক্তিপূর্ণ	অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব পূর্ণ	১৩১	৫	সজাতীয়	স্বজাতীয়
৬২	১৮	সত	সত্য	১৩১	২১	বাদেরা	বাদের
৬৫	১১	যন্ত্রাদি	যন্ত্রাদি	১৩৭	১৫	সূক্ষ	সূক্ষ্ম
৬৭	২	গুণ-স্পন্ন	গুণসম্পন্ন	১৩৯	১	বিশিষ্ট্যদ্বৈত	বিশিষ্টাদ্বৈত
৬৭	২২	অতিসূক্ষ্ক	অতিসূক্ষ্ম	„	২১	অচিন্ত	অচিন্ত্য
৭০	৩৪	অতাব	অভাব	„	২৫	অচিন্ত	অচিন্ত্য
৭৬	১৩	শ্রীনন্দনন্দের	শ্রীনন্দনন্দনের	„	২৮	অচিন্ত	অচিন্ত্য
৮১	৩০	বীয	বীর্য্য	১৫০	৩৫	দেবাত্মক	বেদাত্মক
৮৯	২৪	র্ব্বযুক্তিবলে	পূর্ব্বযুক্তিবলে	১৫৮	৪	নিম্বক	নিম্বার্ক
৯৯	১১	স্তমম	সমস্ত	১৬৩	৩৫	আবিস্কাকের	আবিষ্কারে
১০৫	৬	বাচতিস্প	বাচস্পতি	১৬৪	৩	পৃথিযী	পৃথিবী
১০৫	২৬	এক	এবং	১৭৪	২	যছস্ত্য	যজস্ত্য

শ্রীগৌরসুন্দরের পঞ্চশত বর্ষ-র্ত্তি আবির্ভাব বাসর সন—১৩৯৩। ইং ১৯৮৬

ভজন সন্দর্ভ ৫ম বেদের

শ্লোক সূচী

অঙ্গেতু বামে ১৭৬
অর্থোহয়ং ৩৭
অথাতো ৭৩
অনয়ারাধিতো ১৪৫
অনাবৃত্তি শব্দাৎ ৯৭৩
অনাদিসিদ্ধ ২৮
অন্ত্যজা অপি ৩৫
অপরেয়মিতং ১৬৮
অপাণিপাদঃ ১৩১।১৬৩
অমাত্যো রাজপদ ১৪২
অহং ব্রহ্ম ১৬৩
অহং ব্রহ্মাস্মি ৩০।
অংশো নানা ১২৪
অস্তি তৎপূর্ব্বং ৪৯
আত্যন্তিক ৬৪
আত্মলিঙ্গ ১৩৯
আত্মারামশ্চ ১৬২
আপ্তোপদেশ ২
আব্রহ্মস্তম্ব ৩৫
ইতিহাস ৪।১১
ইষ্টো ন রমাপতি ৯৪০
ঈশ্বরাসিদ্ধে ৪৯ ৬০
ঋগ্ যজুঃ ৩৭
ঋগাদয়শ্চ ৩৭
ঋতেঽর্থং ৯৫৬
একরূপ ৩৮
একমেবাদ্বিতীয়ং ১২৭
এবং প্রকৃতি ২৮
ঐতদাত্ম্যমিদং ১০৭

ওঁ আহস্য ১৭৩
কথং পুণ্যারিদ ৪৯
কলিং সভাজয়ন্ত ১২
কর্ত্তাশাস্ত্রার্থ ১৩৩
কষ্টেযেন ১০
কালেন নষ্টা ২৮
কীর্ত্তনীয়ঃ সদা ১৭৩
ক্লেশ কর্ম্ম ৫০
কৈবল্যৈক ১২৭
ক্ষীরং যথা ৯৬
গায়স্ত্য উচ্চৈঃ ৯৭০
গিরয়ো মুমুচু ৯৭৪
গুরু প্রসাদো ৩৬
গূঢ়ার্থস্য ৯
গোপিকা ৩৮
গৌতমস্য ৫৮
চিদ্রূপত্বেন ১৩৯
চিচ্ছক্তি ৫০
জগন্নিদানং ৯৪৭
জ্ঞানে প্রয়াস ১৫৬
জ্ঞানং যত্তদধীনং ৯২৭
জন্মাদ্যস্য ৮
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠ ৭৫।১৫৮
তত্ত্বমসি ৩৪।১৩৬
তত্ত্বমস্যাদি ১৪১
তৎসৎ ১৫৪
তদ্বিদ্ধিপ্রণিপাতেন ১৫৭
ততোভিন্নত্বেন ১৩৯
তথানতে মাধবা ৯৬
তদ্বচন আম্নায় ৭২

তদ্বিজ্ঞানার্থ ৩৫
তন্নিষ্ঠ ১২৬
তমেববিদিত্বা ৩৫
তেন স্মরন্ত ১৫৯
তাক্ত্বাসধ ১৪৮
ত্বমেব জীব ৪৭
দুঃখ জন্ম ৪৯
দ্বাসুপর্ণা ৩৪
ধর্ম্মস্তসাক্ষাৎ ২৯
ধর্ম্মো জগন্নাথ ২৯
নপ্রেত্যসংজ্ঞা ৭৭
নতত্র সূর্য্যো ৯৫
ন যত্র মায়া ৩৩
নমোহনন্তায় ৬২
ন সাধয়তি মাং ৬৯
নান্যপন্থা ৩৫
নামশ্রেষ্ঠং ১
নারায়ণ পরা ৩২
নাম চিন্তামণি ৭৪
নাস্তিকো ৫৮
নাস্ত্যকৃৎ ৩৫
নিত্যোনিত্যানাং ৩৪।১৬৫
নেত্থস্তাবেন ২৯
নৈরাশ্যমীশং ৫১
নৈষাতর্কেণ ৪৯
নায়মাত্মা ১৩৪
ন রোধয়তি মাং ১৫৯
নিত্যন্ত সাৎ ১৪৯
নাহংমন্যে ১৭৩

পরাস্য শক্তি ১৩১
পুনঃ স্বরূপ ৪৬
[illegible] ১৩২
প্রতীত্য প্রতীতি ১৪৯
প্রস্থান ১০১
পোষণংতদ্ ১৩৪
পোষণেঽপি ১৪৫
প্রব্যূহেভ্যো ৭৪
পরোক্ষবাদো ৭
পরিবৃংহিতা ১১
পরব্যোমেশ্বর ২৮
পরীক্ষ্য লোকান ৩৫।৭৪
পঞ্চরাত্র ৩১
পুরাণানাংসমরূপঃ ১১
পুনঃ স্বরূপ ৪৬
প্রমাণ প্রমেয় ৫৯
পুরুষার্থ ২০
প্রত্যক্ষ প্রবৃত্ত ৭২
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ১৭২
বর্ণাভিব্যঙ্গ ১৪৮
বন্দে চৈতন্য ১
বাধ্যমানোঽপি ১৫৯
বিজিতহৃষীক ৬৯
বিদ্যাতপ ৬১
বিসৃজতি ১৭০
বেদস্মৃতিধর্ম্মঃ ৪
বৈষ্ণবানাং ৯৭
ব্যষ্টিরূপেন ১৩৯
ব্রহ্ম সূত্রাতে ১০১
ভয়ংদ্বিতীয়াভি ১২৭
ভুক্তিমুক্তি ৬১
মায়াবাদ ৮৪
মন্দ হাসং ৩৮
মুক্তবন্ধয়ো ৪৯
মুক্তাঅপি ১২৩।১৬২
মুক্তির্হিত্বা ১৬২
যচ্চক্ষুরেষ ৯৫
ষৎপাদপল্লব ৯৬
জহদজহল্লক্ষনা ১৪১
যত্র ধর্ম্মায় ৩৬
যতো নারায়ণ ৩৫
যমেবৈষ ৬৫।৫৭।৯৭
যস্যদেবে ৩৫।১৪৭।১৫৪
যস্য প্রভা ৯৮
যমাদিভিঃ ৬৯
যথা মহান্তি ১৫৭
যদা পশ্যঃ ১৭৩
যাবন্নক্ষীয়তে ৪৭
যাবানহং ১৫৪।
যেঽপন্যদেবতা ১৭৪
যে জ্ঞানাত্ত ১৫৯
যো বৈ ভূমা ৬৩
রাম নারায়ণনামস্ত ৪২
লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং ১৭২
লৌকিকী ৩৫
লোকে ব্যবয়া মিসমদ্যসেবা ৮৩
শব্দ এব মূলং ১৪০
শৃণোতি য ইমং ১৫২
শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম- ২৭
শ্রীভাগবত ২৮
শ্রীমধ্বমতে ১১৯
শ্রুতেস্তশব্দ ১২৬
শতশোঽথ সহস্রেষু ১২
স আত্মাতত্ত্বমসি ১৪১
স ঈশো যদ্বশে ১২২
স উত্তমোঽধিকারী ৩৫
সতাং প্রসঙ্গৎ ১৫৪
সত্যং জ্ঞানানন্দ ১৩৯
সর্ব্বতঃ পাণি ১৩৬
সম্প্রদায়বিহীনা ৩১।১১২
সম্প্রদায়ানুরোধেন ২৮
সর্ব্বংহি বিজ্ঞানমতো ১২৪
সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ ১২
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন ১৪৭।১৬০
সিদ্ধান্তস্তত্ত্ব ১১
সুরর্ষে বিহিতা ৩৫
সৃষ্টেরাদৌ ৪৬
সৃষ্টি-স্থিতি ৯৩
স্যাৎ অস্তি ৮১
স্যাদবক্তব্যঃ ৮১
স্যাদস্তি চ নাস্তি চ ৮১
স্যান্নাস্তি ৮১
স্বর্গাপবর্গ ৭৩
স্বর্গকামো ৭৩
স্ত্রীপুত্রাদিকথা ১৬৪
স্বাগমৈঃ ৮৩
স্বয়ম্ভু নারদ ২৬
সংজ্ঞাকর্ম্ম ৭২
হরে কৃষ্ণ ৪৩
হরে মুরারে ৪৩
হিরন্ময়েন ৯৭
হ্লাদিন্যা ১২২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

ভজন-সন্দর্ভ।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্। রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতেঽস্মি॥ ব্রজোজ্জ্বলোন্নতরস-পীযূষস্বাদপর শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধরপাদাম্ভোজমকরন্দপানোন্মত্ত প্রিয়সেবকোঽধুনা শ্রীবার্ষভানবীদয়িত-দাসাখ্য শ্রীমন্নয়নমণিমঞ্জর্য্যাশ্চরণসীধুশীকরেণমমতপ্ত চিত্তমরু স্নিগ্ধাশা চাতকস্য ভবতু বারিদঃ॥

"বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া। প্রসভং নর্ত্ততে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্॥"

প্রমাণ-প্রভাকর নামক প্রথম প্রকাশ।

শ্রীগৌরহরির নিত্যলীলাক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপ ধামে শিমুলিয়া নামে এক সমৃদ্ধ জনপদ বিরাজিত। তথায় চারিটি বন্ধু বাস করিতেন। তাঁহারা একত্র অধ্যয়ন ও সাধুসঙ্গাদি করিতেন। তাঁহাদের নাম—১। হরিদাস, ২। মধুসূদন দাস, ৩। অনন্তদাস ও ৪। জগজ্জীবন দাস ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সঙ্গোপনের কিছুদিন পরেই তাঁহাদের জন্ম হয়। তখনও বহু গৌরভক্ত পৃথিবীর শিরোমণিরূপে প্রকট থাকিয়া শ্রীগৌরহরির মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছিলেন। উক্ত যুবক চতুষ্টয় একসময় প্রয়াগে মাঘস্নান করিবার মানসে গমন করিলেন। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর পূতপ্রবাহস্নিগ্ধ তীর্থরাজ প্রয়াগ-ক্ষেত্রে ঐ সময়ে বহু সাধু-মহাত্মার সম্মিলন হইয়া থাকে। উক্ত যুবক চতুষ্টয় ঐ সময়ে প্রয়াগে গমন করিয়া সঙ্গমক্ষেত্রের সন্নিকটে একটি বাসা ভাড়া করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। প্রত্যহ সঙ্গমে প্রাতঃস্নান, তীর্থদর্শন ও সাধুসঙ্গই তাঁহাদের দৈনন্দিন কৃত্য হইয়াছিল।

একদিন অপরাহ্নে তাহারা বাসা হইতে বহির্গত হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি ভক্ত-গোষ্ঠির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সাধুগণ তখন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহারা তথায় সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তর শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। যখন তাঁহাদের ব্যাখ্যা শেষ হইল তখন উক্ত যুবক চতুষ্টয়ের মধ্য হইতে শ্রীহরিদাস বিনীতভাবে করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন,—"আপনারা পর-দুঃখ-দুঃখী জীববান্ধব। আপনাদের তীর্থাদিতে ভ্রমণ কেবল মাদৃশ সংসারতপ্ত বহির্ম্মুখ দীনচেতা গৃহীগণের প্রতি কৃপাপরবশতার জন্যই। মাদৃশ দুর্গত অনর্থগ্রস্ত জীবের কি প্রকারে পরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কৃত্য কি, কৃপা করিয়া উপদেশ প্রদান করিতে প্রার্থনা।

উক্ত ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে বহু শাস্ত্রবিদ্ ভজনপরায়ণ মহাত্মা বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা যুবক চতুষ্টয়ের শ্রবণ-পিপাসা দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। সকলে বিচার করিয়া শ্রীমন্ সিংহানন্দতীর্থ স্বামীজীকে উক্ত যুবক চতুষ্টয়ের প্রার্থনা পূরণে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তখন শ্রীমন্ সিংহানন্দজী সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া দৈন্য সহকারে বলিলেন—যে সভায় আপনাদের ন্যায় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ভজনশীল মহাত্মাগণ বিরাজিত তথায় মাদৃশ মূর্খ ও ভজনহীন ব্যক্তির প্রতি এই প্রকার আদেশ, আমার প্রতি কৃপারই নিদর্শন। আমি আপনাদিগের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আপনাদের কৃপাদেশ পালন করিতে যত্ন করিব। আপনারা কৃপা প্রকাশে যাহা আমার হৃদয়ে প্রেরণা প্রদান করিবেন, আমি তাহাই প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপাশক্তি সঞ্চার করুন—ইহাই আমার সকাতর প্রার্থনা।

---

*গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তি শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থ-বত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভ কথ্যতে বুধৈঃ॥

মানব বিবেক লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি কে? আমার কর্ত্তব্য কি? দুঃখ কেহ চাহে না তথপি কেন আসে? সকলেই সুখ বা আনন্দ চায়, কিন্তু কেন পায় না? সেই দুঃখের হেতুই বা কি? এবং কি-প্রকারে সেই দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে? এই প্রশ্ন গুলি উদয় হয়। ইহার মীমাংসা করিতে বহু সম্প্রদায় নানা প্রকার গবেষণামূলক মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কলিহত জীবের পক্ষে প্রকৃত উপায় নির্ণয় করিয়া তদনুযায়ী জীবন যাপন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। আরার জীবের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটি দোষ থাকা-প্রযুক্ত সত্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ দশপ্রকার প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাণগুলি যথা—১। প্রত্যক্ষ, ২। অনুমান, ৩। শব্দ, ৪। আর্ষ, ৫। উপমান, ৬। অর্থাপত্তি, ৭। অভাব, ৮। সম্ভব,। ৯। ঐতিহ্য ও ১০। চেষ্টা।

প্রমাণ ব্যতীত কোন বাক্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। প্রমা—অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান যাহা দ্বারা লাভ হয় তাহাই প্রমাণ। আবার—তর্কেঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥ (মহাভারত বনপর্ব্ব-৩১৩ অঃ ১১৭ শ্লোক) অর্থাৎ তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠা-শূন্য, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি ঋষিই হইতে পারেন না; এতন্নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁহাকে 'মহাজন' বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে-পন্থাকে 'শাস্ত্র পন্থা' বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত।

চার্ব্বাক একমাত্র প্রত্যক্ষকেই স্বীকার করেন। বৈশেষিক প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে স্বীকার করেন। কপিল ও পতঞ্জলি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন। গৌতম প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিটী স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, পর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি—এই ছয়টিকে স্বীকার করেন। পৌরাণিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উ মান, শব্দ, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও ঐতিহ্য—এই আটটিকে স্বীকার করেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দোষচতুষ্টয় প্রযুক্ত কোন প্রমাণই সিদ্ধ হয় না। কারণ, অলৌকিক-অচিন্ত্যস্বভাববস্তুর স্পর্শে অযোগ্যতা-হেতু দশ প্রকার প্রমাণই দোষযুক্ত।

প্রত্যক্ষঃ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও অর্থ এবং বিষয় দ্বারা যে জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞান বলিতে সাধারণ জ্ঞানকে বুঝায়। আর প্রমা বলিতে যথার্থ জ্ঞানের কারণ। উহা তিন প্রকার—(১) অব্যপদেশ্য বা বিষয়নিষ্ঠ রূপরসাদির নিশ্চয়াত্মক বোধহীন, (২) অব্যভিচারী বা বিষয়ে যথাবস্থিত জ্ঞান, (৩) ব্যবসায়াত্মক বা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ের ও তদনুগত মনের (অনুব্যবসায়) বিষয়াভূত জ্ঞান। উহা ছয় প্রকার—পঞ্চইন্দ্রিয়জ ও মনোজ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান—নির্ব্বিকল্প বা সাধারণরূপে এই বস্তুর এই ধর্ম্ম—এইরূপ জ্ঞান এবং সবিকল্প বা এই বস্তুর এই ধর্ম্ম ইহা বিশেষরূপ জ্ঞান, ভেদে দুই প্রকার। আবার শ্রীজীবগোস্বামিপাদ—বৈদুষ বা বিদ্বানের ভ্রমাদিশূন্য নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় ও মনের প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞান। উহা শব্দানুগত ও নির্দ্দোষের জন্য 'প্রমা' স্বীকার করিয়াছেন। অবৈদুষ বা অজ্ঞের ভ্রমাদি ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয়ভূত দোষযুক্ত হওয়ায় অপ্রমাণ্য বলিয়াছেন।

অনুমান ঃ—প্রথমে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে পশ্চাতে অপ্রত্যক্ষ অন্যবস্তুর জ্ঞানকে অনুমান বলে। যেমন মেঘ দেখিয়া জল হইবার অনুমান, ধূম দেখিয়া অগ্নি আছে অনুমান। কার্য্য কারণকে হেতু না করিয়া সামান্যতঃ দৃষ্ট—যেমন—শৃঙ্গ দেখিয়া পুচ্ছের অনুমান (প্রাচীন ন্যায়) নিজের অনুমান হেতু স্বার্থ; এবং অপরকে বুঝাইবার জন্য পরার্থ অনুমান। উহা পাঁচ প্রকার আয়তযুক্ত (১) প্রতিজ্ঞা—যথা ধূম দেখিয়া পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত। (২) হেতু—ধূম আছে বলিয়া। (৩) উদাহরণ—রন্ধন ঘর, যাহা ধূমযুক্ত তাহা বহ্নিযুক্ত। (৪) উপনয়—তেমনি এই পর্ব্বত ধূমযুক্ত। (৫) নিগমন—সুতরাং এই পর্ব্বতও বহ্নিযুক্ত।

শব্দ ঃ—'আপ্তোপদেশঃ শব্দ' (ন্যায়দর্শন ১।১।৭)। আপ্তঃ—ভ্রম প্রমাদাদি দোষশূন্য—বিশ্বস্ত যথার্থ বক্তার উপদেশ বা বাক্য। যস্য বাক্যস্য তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত সংসর্গোমানান্তরেণ ন বাধ্যতে তদ্বাক্যং প্রমাণম্॥ (বেদান্ত পরিভাষা ৪ পঃ)।

যাহার বাক্যের তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত পদার্থের সম্বন্ধ অন্য কোন প্রমাণদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, সেই বাক্যই প্রমাণ। কপিল, কণাদ, গৌতমাদি তত্ত্ববাদী মহর্ষিগণের কোন বাক্যের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, এমন ঈশ্বর-প্রোক্ত বাক্যই এস্থলে শব্দ প্রমাণ জানিতে হইবে। বাক্য দুই প্রকার (ক) বৈদিক ঃ—বেদ সম্বন্ধি ঈশ্বর-কথিত হওয়ায় তাহার সকল অংশই প্রমাণ। সেই শব্দই শাস্ত্র। তাহার নাম বেদ, তাহা অনাদিকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। বেদ শ্রীভগবানের অনাদিসিদ্ধ বাক্য। এজন্য উহার নাম অপৌরুষেয়। সকল মানবের জনক-স্বরূপ শ্রীভগবান্ জীবকল্যাণ-নিমিত্ত যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা ভ্রমাদি-দোষশূন্য অব্যভিচারী প্রমাণ বলিয়া সর্ব্বজন-গ্রাহ্য। লৌকিকের মধ্যে বিশ্বস্ত যথার্থ বক্তার বাক্যই প্রমাণ। তদ্ভিন্ন অন্যের বাক্য অপ্রমাণ। অনাদি হেতু স্বয়ংসিদ্ধ শব্দই প্রমাণরূপে গৃহীত। সর্ব্বসুহৃদ্ শ্রীভগবানের অনাদিসিদ্ধ (মহাপ্রলয়েও অবিনশ্বর) বাক্যই ব্যভিচার শূন্য প্রমাণ।

আর্ষ ঃ—ঋষিগণ কথিত বাক্য।

উপমান ঃ—কোন এক প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্যে অপর বস্তুর পরিচয় প্রদান করা।

অর্থাপত্তি ঃ—অর্থসিদ্ধি হইতেছে না দেখিয়া অন্যরূপ অর্থকল্পনা। যথা স্থূল দেবদত্ত দিবাভোজন করে না। ভোজন না করিলে স্থূলত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং দিবসে ভোজন না করিলে রাত্রিতে অবশ্যই ভোজন করে। ইহাই অর্থাপত্তি।

অভাব ঃ—পদার্থের অনুপলব্ধি জন্য অভাব বোধ হয়।

সম্ভব ঃ—শতের মধ্যে এক বা দশ আছে এই সম্ভবনার নাম সম্ভব।

ঐতিহ্য ঃ—যাহাতে বক্তাকে জানা যায় না, কিন্তু পুরুষ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, যেমন এই বৃক্ষে যক্ষ বাস করে।

চেষ্টা ঃ—হস্তপদাদির দ্বারা যে সঙ্কেত করা হয়।

শ্রীহরিদাস বলিলেন—প্রভু, ভ্রম প্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয় একটু বিস্তৃত-ভাবে বলিতে আজ্ঞা হউক। তদুত্তরে শ্রীমন্নৃসিংহানন্দ স্বামিজী বলিলেন—**'ভ্রম'**—অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যামতি। একবস্তুতে অন্যবস্তুর জ্ঞান। ভ্রম দুই প্রকার—বিপর্য্যাস ও সংশয়। দেহে আত্মবুদ্ধিই বিপর্য্যাস ; আর এটি পুরুষ বা স্থাণু (শাখাপল্লবহীন বৃক্ষ)—এই বুদ্ধিই সংশয়। পিত্ত, দূরত্ব, মোহ ও ভয় ইত্যাদি কারণে ভ্রম হয়। পিত্তরোগাক্রান্ত রসনায় মধুর শর্করাদি তিক্ত বোধ হয়। দূরত্ব হেতু সূর্য্য চন্দ্রকে ক্ষুদ্র থালার মত দেখা যায়। আত্মা অবিকারী, নিত্যবস্তু ; কিন্তু দেহকে আত্মা বিচার করিয়া মোহবশতঃ 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ' ইত্যাদি বিচার হয়। আর ভয়-বশতঃ অন্ধকার রাত্রে রজ্জুকে সর্প বা শাখাপল্লবহীন বৃক্ষকে অপদেবতা বুদ্ধি হয়।

প্রমাদ ঃ—অন্যমনস্কতা। চিত্ত চাঞ্চল্যহেতু কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ না হইলে তাহার উৎপত্তি।

বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনা করিবার চেষ্টা। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা লইয়া অন্যলোককে বঞ্চনা করিয়া নিজের সুখ-সুবিধা লাভের ইচ্ছা।

করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও বস্তুর উত্তমরূপ অনুভবের অভাব।

উপরিউক্ত দোষ সকলের নিমিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণকে অবলম্বন না করিলে বাস্তব বস্তুর বিচার হওয়া সুকঠিন। যথার্থ জ্ঞানের নাম 'প্রমা', যাহা দ্বারা প্রমা জন্মায় তাহাকে প্রমাণ বলে। আমফল দেখিয়া আম্রবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হয়, কিন্তু রজ্জুতে সর্প বোধ হইলে তাহা প্রমা নহে, **'ভ্রম-জ্ঞান'**। প্রমাণ লইয়া দার্শনিক মতবাদীদের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

শব্দ-প্রমাণ বেদ ঃ—পূর্ব্বোক্ত প্রমাণসকল জীবের বুদ্ধিবৃত্তি হইতেই নানারূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু জীবের বুদ্ধি ভ্রমাদি চারিটি দোষে দুষ্ট হওয়ায় ঐ সকল প্রমাণে ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তুর জ্ঞান বিষয়ে বেদই একমাত্র অব্যভিচারী প্রমাণ। লৌকিক প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান শ্রীভগবানের সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের সাধন

হইতে পারে না। সংসারে আমরা যে নিয়মে পরস্পর ব্যবহার বা কর্ম্মাদি করি—চেতন, অচেতনাদি পদার্থের নাম-গুণ-ক্রিয়াদি অবগত হইতে পারি। বেদই সেইসকল জ্ঞানের কারণ।

অলৌকিত জ্ঞানেরও পরিচয় বেদে পাওয়া যায়। তাহা তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না, একজন তার্কিকের মত অপর কোন তার্কিক যুক্তি দ্বারা নিরস্ত করিয়া দিতে পারে। কিন্তু অলৌকিক অপ্রাকৃত পরমেশ্বরের সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা জীবগণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। এজন্য ব্রহ্মসূত্রে (২।১।১১) 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' সূত্রে এবং মহাভারতে অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ', 'শাস্ত্র যোনিত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) এবং 'পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বরঃ। শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্য-সাধনয়োরপি।' (ভাগবত ১১।২০।৪) ইত্যাদি শ্লোকে উহা দৃঢ়রূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

কলিকালে বেদের প্রচার অতি অল্প। তন্মধ্যে কোন বেদ বা বেদাংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আবার বেদার্থের গ্রাহকগণ কালবশে মন্দমেধাবিশিষ্ট হওয়ায় দুর্গম বিষয়ে ধারণাশক্তিহীনত্বহেতু বেদের দুষ্পারত্ব ও দুরধিগমত্ব অনুভূত হইয়াছে। অতএব বেদের অর্থনির্ণায়ক ইতিহাস-পুরাণাদি লইয়াই পরমার্থ বিচার করা কর্ত্তব্য। ইতিহাস, পুরাণ বেদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাহা শাস্ত্র-প্রমাণে দৃষ্ট হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য নিজপত্নী মৈত্রেয়ীর নিকট বলিতেছেন—অয়ে মৈত্রেয়ী! ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ—এ সকলই পূর্ব্বসিদ্ধ বিভু পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস-স্বরূপ অর্থাৎ নিঃশ্বাসবৎ অনায়াসে তাঁহা হইতে বহির্গত হইয়াছে।

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ (মহাভারত আদি ১।২।৬৭)। ইতিহাস ও পুরাণে বেদের অর্থ সম্যক্ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণে কথিত আছে—পুরাকালে পিতামহ ব্রহ্মা উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই তপস্যার ফলে ষড়ঙ্গ পদক্রমের সহিত বেদ আবির্ভূত হন। তৎপরে তাঁহার মুখ হইতে নিত্য শব্দব্রহ্মময় শতকোটী শ্লোকে নিবদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রময় নিত্যপুরাণ আবির্ভূত হন। তাহার ভেদ—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদীয়, বারাহ, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, কূর্ম্ম, স্কন্দ, মৎস্য, ভবিষ্য, বামন, মার্কণ্ডেয়, শৈব ও অগ্নি।

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নিজ মুখসকল হইতে ইতিহাস ও পুরাণাত্মক পঞ্চমবেদ প্রকাশ করেন।

বেদের ছয়টী অঙ্গের নাম ষড়ঙ্গ,—

অকারাদি বর্ণের উচ্চারণ-স্থলের বোধক—**শিক্ষা**। বেদবিহিত যাগাদি ক্রিয়ার উপদেশক—**কল্প**। সাধ্য-সাধন-কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-ক্রিয়া-সমাসাদির নিরূপক—**ব্যাকরণ**। শব্দের শব্দবোধের অতিরিক্ত কতিপয় শব্দের অর্থনির্ণায়ক—**নিরুক্ত**। অক্ষর ও মাত্রাসংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট পদ্যবিশেষ—**ছন্দঃ**। গ্রহ-গণনাদিরূপ গণনশাস্ত্র—**জ্যোতিষ**। বৈদিকগণ এই ছয়টীকে বেদাঙ্গ বলেন। বেদের পদ—ছন্দঃ, হস্ত—কল্প, নেত্র—জ্যোতিষ, শ্রোত্র—নিরুক্ত, প্রাণ—শিক্ষা ও মুখ—ব্যাকরণ বলিয়া উক্ত। এই সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মলোকে নিবাস হয়।

পদক্রম—বেদের ক্রমপাঠ ও পদপাঠ—এই দ্বিবিধ রীতির প্রসিদ্ধি আছে।

'বেদ'-শব্দের অর্থ ন্যায়শাস্ত্রকার বলেন—মীন শরীরাবচ্ছেদেন ভগবদ্বাক্যং—বেদঃ।

বেদশব্দের অর্থ বেদান্ত বলেন—ধর্ম্ম ব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং—বেদঃ।

বেদ শব্দের অর্থ পুরাণ বলেন—ব্রহ্মমুখনির্গত ধর্মজ্ঞাপকশাস্ত্রং—বেদঃ। বেদ শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয় প্রতিপাদ্য-অর্থ—"বেদয়তি ধর্ম্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ"—যিনি ধর্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব জানাইয়া থাকেন তিনিই—বেদ।

(১) ঋগ্‌বেদঃ—একবিংশতি শাখাত্মক। আয়ুর্ব্বেদ ইহার উপবেদ। (২) যজুর্ব্বেদ—শত শাখাত্মক। ধনুর্ব্বেদ ইহার উপবেদ। (৩) সামবেদ—সহস্র শাখাত্মক। গান্ধর্ব্ববেদ ইহার উপবেদ। (৪) অথর্ব্ববেদ—নবশাখাত্মক। স্থাপত্য বেদ ইহার উপবেদ। মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করিয়া প্রথমে পৈল ঋষিকে ঋগ্‌বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ এবং সূতকে ইতিহাস পুরাণ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

ইতিহাস পুরাণের পঞ্চমবেদরূপে বায়ুপুরাণে সূতবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। "ভগবান্ ঈশ্বর প্রভু আমাকে (বেদব্যাসকে) ইতিহাস পুরাণের প্রধান বক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।" পূর্ব্বে একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিলেন, শ্রীবেদব্যাস সেই বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেন। সেই বিভাগ চতুষ্টয়ে চাতুর্হোত্র কর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া যজ্ঞ কল্পনা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে যজুর্ব্বেদ বিভাগে অধ্বর্য্যু-কর্ম্ম, ঋগ্‌বেদ বিভাগে হোতৃ-কর্ম্ম, সামবেদ বিভাগে উদ্‌গাতার কর্ম্ম এবং অথর্ব্ববেদ বিভাগে ব্রহ্মকর্ম্ম। এই চারিটি বিভাগে চারিটি কর্ম্ম কল্পনা করা হয়। তাহার পর সেই পুরাণার্থবিশারদ শ্রীবেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান এবং গাথা এই কয়টির সন্নিবেশে পুরাণ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অধ্বর্য্যুলক্ষণ বেদ হইতে কতকগুলি অংশ গ্রহণ করিয়া যজু প্রভৃতি নামে বেদ চার প্রকারে বিভক্ত হইলে পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও যজুর্ব্বেদ নামে অভিহিত হয়, পরে তৎদ্বারাই পুরাণ ইতিহাসের প্রকাশ হয়। এজন্যই পুরাণ ইতিহাসকে 'পঞ্চমবেদ' বলা হইয়াছে। ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের নির্ণীত অর্থ।

ইতিহাস ও পুরাণ উভয়কেই বেদবৎ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। সুতরাং তাহাও বেদাতিরিক্ত বস্তুতে কখনই সম্ভাবিত হয় না। মৎস্যপুরাণেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"কালদোষে মানবগণের বিপুল পুরাণ অর্থ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে না।" এই বিবেচনায় আমি ব্যাসরূপ প্রকট করিয়া ঐ পুরাণকে সংহরণ করিয়া থাকি। ইহাতে পুরাণ সকল পূর্ব্বসিদ্ধই। লোকের অনায়াসে আয়ত্ত করিবার জন্য ভগবান্ সংহরণ-সংক্ষেপ করিয়া থাকেন"। অনন্তর এই অর্থকে বিশদ করিয়াছেন:—"চারলক্ষ পরিমিত শ্লোক: প্রতিদ্বাপরে অষ্টাদশ ভাগে অষ্টাদশ পুরাণরূপে এই ভূলোকে প্রচার করা হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সেই পুরাণ সমষ্টি দেবলোকে শতকোটি শ্লোকে বিরাজ করিতেছেন, তাহারই সারাংশ যাহা এই পৃথিবীতে চতুর্লক্ষ শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রতিষ্ঠিত। 'যজুর্ব্বেদে যাহা অবশিষ্ট ছিল'—এই কথা বলায়, যজুর্ব্বেদের অবশিষ্টাংশের অভিধেয় ভাগ চতুর্লক্ষ শ্লোক তাহাই মর্ত্তালোকে সার সংগ্রহরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীবেদব্যাস পৃথক রচনা করিয়া সন্নিবেশ করেন নাই।

ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু—এই চারজন যজ্ঞ সম্পাদক—ইহাদিগকে ঋত্বিক্ বলা হয়। এই চারজনের অনুষ্ঠিত কর্ম্মই চাতুর্হোত্র। প্রথমে একবেদ হইতেই উক্ত চারজনের কার্য্য সমাধান হইত। তাহার পর চাতুর্হোত্র কর্ম্মের সুবিধার জন্য ঋগ্‌বেদাধ্যায়ী অধ্বর্য্যু বেদীনির্ম্মাণাদিরূপ যজ্ঞশরীর সম্পাদনাত্মক কর্ম্ম—'আধ্বর্য্যব', যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী হোতার হোমাদি যজ্ঞালঙ্কাররূপ কর্ম্ম—'হোত্র,' সামবেদাধ্যায়ী উদ্‌গাতার—যজ্ঞের বৈগুণ্যাদি নাশক শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ-কীর্ত্তনাদিরূপ কর্ম্ম 'ঔদ্‌গাত্র' এবং অথর্ব্ববেদাধ্যায়ী ব্রহ্মার ত্রুটি সংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণাদিরূপ কর্ম্ম—'ব্রহ্মত্ব' বা 'ব্রাহ্ম'—এই সমস্ত বিষয় চারবেদে শ্রীবেদব্যাস-কর্ত্তৃক পৃথক পৃথক ভাবে সন্নিবেশিত হয়। পরে দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বাচনে বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় সাধারণে বিস্তারের জন্য যজুর্ব্বেদের অবশিষ্ট শতকোটি অংশের সারাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচলক্ষ শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া তন্মধ্যে ইতিহাস মহাভারতে একলক্ষ, বাকী পুরাণ সমূহে চারিলক্ষ শ্লোক।

আখ্যান:— পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণ। **সর্গ**:—ত্রিগুণের বৈষম্যকর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে বিরাট্‌রূপে এবং স্বরূপত: আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশইন্দ্রিয় মহত্তত্ত্ব এবং অহংকারতত্ত্ব—ইহাদের সৃষ্টি।

বিসর্গ:—ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি।

বংশ:—ব্রহ্মার সৃষ্ট রাজন্যবর্গের বংশাবলী।

মন্বন্তর:—মনু এবং মনুপুত্রগণের সচ্চরিত্র কীর্ত্তনের দ্বারা সদুপদেশ।

বংশানুচরিত:— পূর্ব্বোক্ত রাজন্যবর্গের বংশধরগণের কীর্ত্তন। কিন্তু মহাপুরাণে দশলক্ষণ ইহার বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৭) বর্ণিত আছে অথবা **আখ্যান**:—নিজের দৃষ্ট বিষয়ের বর্ণন বা প্রশ্নোত্তরময় বাক্যের বন্ধন। যথা—সূত-শৌনক সংবাদ।

উপাখ্যান:—পুরাবৃত্ত বা শ্রুত অর্থের বর্ণন অথবা প্রথমে বক্তব্য গ্রন্থের অভিধেয় প্রকাশক। যেমন—শুক-পরীক্ষিত সম্বাদ।

গাথা ঃ—ছন্দোবিশেষ। পিতৃলোক এবং পৃথিবী প্রভৃতির গীতিকা বা পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস ও সংবাদাত্মক।

কল্পশুদ্ধি ঃ—বারাহপদ্মাদি কল্পের নির্ণয়।

শ্রীব্যাসদেবের বিভাগ করার পূর্ব্বেও বেদের ঋগ্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব নাম ছিল। তবে অধিকার ও কার্য্য-বিভাগ শ্রীব্যাসদেব করিয়াছেন।

পুরাণ প্রমাণ ঃ—অষ্টাদশ পুরাণের 'স্কান্দ' 'আগ্নেয়' ইত্যাদি নাম যে দেখা যায়, সেইটি সৃষ্টির আদিতে যে পুরাণের যিনি প্রথম অধ্যাপক তাঁহারই নাম অনুসারে হইয়াছে। যেমন কঠ প্রভৃতি উপনিষদ প্রথমে 'কঠ' কর্ত্তৃক অধীত হইয়াছে বলিয়া 'কাঠক, কাঠ বা 'কঠ' ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ ; এস্থানেও সেইরূপ জানিতে হইবে। অথবা গ্রন্থের উপক্রম, উপসংহার পর্য্যন্ত কোনও এক আনুক্রমিক নির্ম্মাণ-নিবন্ধনই সেই সেই নামের সৃষ্টি হইয়াছে। ফল-কথা—ব্রাহ্ম, স্কান্দ, আগ্নেয় প্রভৃতি পুরাণ কোনরূপেই ব্রহ্মা, স্কন্দ, অগ্নি প্রভৃতির রচিত হইতে পারে না। পুরাণাদি 'নিত্য'—একথা সত্য, তবে কোন কোন স্থানে যে বেদব্যাস কৃত বলিয়া তাহার অনিত্যত্ব শ্রবণ করা যায়, সেটি আবির্ভাব, তিরোভাব অপেক্ষায় বলা হইয়াছে। এইরূপে ইতিহাস ও পুরাণের অপৌরুষেয়রূপে বেদত্ব সিদ্ধ হইল।

বেদাধ্যয়নাদি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের অধিকার না থাকায় পুরাণাদির যদি বেদের অভিন্ন হয় তবে পুরাণাদিও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের অধিকারাভাব হওয়া উচিৎ। ইহার নিরাসনকল্পে বলিতেছেন—"ক্ষত্রিয় পুরুষ ও ব্রাহ্মণ স্ত্রীতে জাত সন্তানকে 'সূত' বলা হয়। উহা প্রতিলোমজ, শূদ্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আবার ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয় পুরুষ হইতে ক্ষত্রিয়াদি নিম্নজাতীয় পরিণীতা পত্নীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহাকে অনুলোমজ বলা হয়। ইহারা সকলে শূদ্র হইতে নিকৃষ্ট। অতএব পুরাণাদিতে তাহাদেরও অধিকার নির্ণয়ে শ্রীকৃষ্ণ নামের ন্যায় যাহা বেদকল্পলতিকার পরমোৎকৃষ্ট ফলস্বরূপ তাহা একবারমাত্র গ্রহণে যে কোন জীবকে পরমোৎকৃষ্ট ফলস্বরূপ প্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিতে সমর্থ। সেইরূপ পুরাণাদিও অধিকার বিচার না করিয়া পঠনকারীকে কৃতার্থ করিতে পারেন।

ইতিহাস ও পুরাণে বেদের যাবতীয় অর্থ নিহিত আছে। সুতরাং তাহার অধ্যয়নেই বেদার্থজ্ঞান লাভ করা যায়। পৃথক্‌ভাবে বেদধ্যয়নের অপেক্ষা থাকে না।

পুরাণের বেদার্থ-নির্ণায়কতা ঃ—বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—"মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারত প্রকাশচ্ছলে সমস্ত বেদের অর্থ দেখাইয়াছেন এবং পুরাণেও যে নিখিলবেদ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ বেদের দুর্ব্বোধ্যভাগের ব্যাখ্যা এবং তাহার ছিন্নভাগের অর্থ পূরণ হওয়ায়, বেদ পুরাণেই নিশ্চলভাবে রহিয়াছে"। আরও দেখা যায় বেদার্থ প্রকাশক মন্বাদিশাস্ত্রের মধ্যপাতী বলিয়া ইতিহাস পুরাণকে স্মৃতিশাস্ত্র-রূপে লাভ করা গেলেও প্রকাশক শ্রীবেদব্যাসের বিশিষ্টতা নিবন্ধন ইতিহাস পুরাণেরই উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা বুঝিয়াছিলেন ব্রহ্মাদি দেবগণও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সমস্ত পণ্ডিতের বিদিত বিষয় তিনিই জানিতেন, কিন্তু তাহার বিদিত বিষয় অপরে বুঝিতে পারেন নাই।

জগতের লোক বেদব্যাসের হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন বাঙ্ময় শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া অন্যান্য মুনিগণও অধ্যয়ন—অধ্যাপনাদিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

'স্কন্দ' পুরাণে আছে,—নারায়ণ হইতে প্রকাশিত জ্ঞান সত্যযুগে সম্পূর্ণই ছিল। ত্রেতা যুগে সেই জ্ঞানের কিছু অন্যথা হয়, তাহার পর গৌতম ঋষির অভিসম্পাতে জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হওয়ায় লোকে স্বরূপ উপলব্ধি বিষয়ে অসমর্থ হইলে, ব্রহ্মা, রুদ্র প্রমুখ দেবগণ শুভাশুভ বিচার-বিমূঢ় হইয়া শরণাগত পালক নির্ব্বিকার শ্রীনারায়ণের শরণ গ্রহণ করিয়া ঐ বিষয়ে নিবেদন করিলে, শ্রীপুরুষোত্তমভগবান্ স্বয়ং হরি, পরাশর পত্নী সত্যবতী হইতে মহাযোগী শ্রীব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিলুপ্তপ্রায় সমস্ত বেদ ইতিহাস ও পুরাণাদি উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতএব পুরাণ ইতিহাসও বেদের ন্যায় অপৌরুষেয় ও বেদার্থ-নির্ণায়ক। পরমার্থজ্ঞান সম্যক্‌রূপে ইহা হইতে হইতে পারে।

বেদার্থ অপেক্ষাও পুরাণার্থকে অধিক মনে করা যায়। কারণ নিখিল বেদ-শব্দ পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত, এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যিনি পুরাণকে বেদ হইতে অন্যপ্রকার মনে করেন তিনি তির্য্যগ্যোনি লাভ করেন। তাহার উত্তম-গতি কখনই লাভ হয় না।"

"পরোক্ষবাদোবেদোঽয়ম" বেদের সাধারনতঃ কর্ম্মপরতা ও পরোক্ষভাবে ভগবৎপরতা বর্ণিত হইয়াছে। এ কারণ বেদ পড়িয়া প্রায়ই কর্ম্মবাদী হয়; কদাচিৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী হন। পুরাণাদিতে সাক্ষাৎভাবে ভগবৎপরতা থাকায় সেরূপ হয় না।

অল্পশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বেদের অর্থ বিচার করিতে না পারিয়া অপসিদ্ধান্ত করিয়া বেদকে বিচলিত করিবে, এই ভয়ে সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃকই ইতিহাস পুরাণ দ্বারা বেদকে নিশ্চল করা হইয়াছে।

যে বিষয় বেদে পরিলক্ষিত হয় না, তা মন্বাদি স্মৃতিতে দেখা যায়। আবার বেদ ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না, তাহা পুরাণে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং যে ব্যক্তি অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারিবেদ জ্ঞাত আছে অথচ পুরাণ অর্থ অবগত নহে, তাহাকে বিচক্ষণ বলা যাইতে পারে না।

এইরূপে পুরাণ যথার্থ জ্ঞানের কারণরূপে স্থিরীকৃত হইলেও পুরাণের সম্পূর্ণ অংশ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় প্রচলিত অংশে নানাবিধ দেবতার মহিমা ও উপাসনাবিধি দেখিয়া প্রকৃত তত্ত্বানাভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন ব্যক্তির পক্ষে পুরাণের তাৎপর্য্য ও অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়ে। তন্নিমিত্ত উপাঙ্গ-বিষয়গত সংশয়ও ক্রমে জটিলই হইতে থাকে। পুরাণের সাত্ত্বিকাদিভেদে বিবিধ দেবতার মহিমা—মৎস্য পুরাণে বর্ণিত আছে। পুরাণ—সর্গ—প্রতিসর্গ—বংশ—মন্বন্তর বংশানুচরিতভেদে পঞ্চলক্ষণান্বিত এবং উক্ত লক্ষণের অতিরিক্ত 'আখ্যান' নামক একটি লক্ষণ আক্রান্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক পুরাণাদিতে শ্রীহরির মহিমাই অধিক বলা হইয়াছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমা আধিক্য এবং তামসিক পুরাণে অগ্নি, শিব দুর্গার মহিমা অধিক-রূপে বলা হইয়াছে। সঙ্কীর্ণপুরাণে সরস্বতী পিতৃলোকের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'অগ্নি' শব্দে বিবিধ নামক অগ্নিতে করণীয় বিবিধ যজ্ঞ বুঝিতে হইবে। শিব শব্দের সহিত 'চ' থাকায় শিবপত্নী দুর্গাও বুঝিতে হইবে। 'সঙ্কীর্ণ' শব্দে সত্ত্ব-রজ-তমময় বিবিধ শাস্ত্র জানিতে হইবে। 'সরস্বতী' শব্দ অন্য দেবতার উপলক্ষণ— ("যে নিজেকে বুঝিয়া অপরকে বুঝাইয়া থাকে তাহাকে উপলক্ষন বলে।) অর্থাৎ সরস্বতী বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তৎদ্বারা নিজের ও দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'পিতৃ' শব্দে 'কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়,—এইরূপ শ্রুতি থাকায় পিতৃলোক প্রাপ্তির উপযোগী কর্ম্মসমূহ বোধ করাতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণঃ—মৎস্য পুরাণের পুরাণসংখ্যা ও পুরাণ দানের ফল কীর্ত্তনাত্মক অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ; প্রসিদ্ধ পুরাণগুলির কোনটি সাত্ত্বিক, কোনটি রাজসিক এবং কোনটি তামসিক—এইরূপ ব্যবস্থাই জানান হইয়াছে; কিন্তু সত্ত্বাদিগুণের তারতম্যেই পুরাণের উৎকৃষ্ট অপকর্ষ নিশ্চয় করা যায়। "সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে"—সত্ত্বই ব্রহ্ম দর্শনের কারণ—ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে সাত্ত্বিক পুরাণেই পরমার্থ জ্ঞান সাধনে প্রবল। ইহা অনুমান করা যায় বটে; কিন্তু তদ্বিষয়ে আশঙ্কা এই যে, উল্লিখিত পুরাণগুলির মধ্যে কোথাও সগুন, কোথাও নির্গুণ, কোথাও জ্ঞানগুন এবং কোথাও জড়গুন—ইত্যাদি বিষয়ে সকলের নানাবিধ কুটিল যুক্তি দ্বারা নিরাকরণ করাতে চিত্তের ভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ায় সংশয় ও বিপর্যয়ের কিঙ্কর হইয়া পড়ে; তাহার সমাধান কি? তদুত্তরে যদি বলা যায় সমস্ত বেদ ও পুরাণের অর্থ নিরূপণের জন্য ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস স্বয়ং যে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই অর্থ সকল নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য? তাহা হইলে অন্যান্য সূত্রকার গৌতমাদি মুনিগণের প্রদর্শিত কোন কোন যুক্তির অনুসরণে দোদুল্যমানচিত্ত"—তাহাদের অনুগত ব্যক্তিগণ ত ব্রহ্মসূত্রের নির্ণীত অর্থ মানিবে না! অথবা যদি বল বেদান্ত সম্বাদ-সমন্বিত—ব্রহ্মসূত্রের প্রদর্শিত যুক্তিবলে গৌতমাদি সূত্রের অনুগত ব্যক্তিগণের পরাভব করিব? তথাপি সন্দেহের অবকাশ থাকিল। "কারণ—ব্রহ্মসূত্রস্থ সূত্রগুলির অর্থ অতি গূঢ় এবং অল্পাক্ষরে

নিবদ্ধ। তাহার উপর সূত্রের ভাষ্যকারগণও বিভিন্ন মতাবলম্বী বলিয়া তাহারা নিজ নিজ ভাষ্যে নানা অর্থের কল্পনা করিয়াছেন ; সুতরাং কিরূপে এবিষয়ে সমাধান হইতে পারে ? তদুত্তরে যদি সমস্ত বেদ, ইতিহাস এবং পুরাণের সারার্থযুক্ত ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ স্থির হয় এমন একখানি অপৌরুষেয় পুরাণ এ জগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হইলে সকল সন্দেহ দূর ও সমস্যার সমাধান হইতে পারে। তাহাই—শ্রীমদ্ভাগবত।

ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস নিখিল পুরাণ ইতিহাস প্রকাশ এবং ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও যখন চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিলেন না, তখন ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া সমাধিস্থ হইলেন এবং সমাধিতে ও শ্রীনারদের কৃপায় ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যসদৃশ শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া তাহা জগতে প্রচার করিলেন ; যে শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য (সমন্বয়) দেখা যায়। তাহার প্রধান কারণ—যাহা হইতে সকল বেদের তাৎপর্য্য—পরমেশ্বরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সূত্ররূপ গায়ত্রী আশ্রয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি।

ইহা মৎস্য পুরাণেও কথিত হইয়াছে—"গায়ত্রী অবলম্বনে যাহাতে পরমধর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে বৃত্রাসুরের বধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে ; তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত নামে অভিহিত। যে ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই শ্রীমদ্ভাগবত স্বর্ণ সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক দান করিবে, সে উৎকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হইবে।" শাস্ত্রে আছে—"এই পুরাণ আঠার হাজার শ্লোকে পরিপূর্ণ"।

এস্থানে 'গায়ত্রী' শব্দে—গায়ত্রীর সূচক ও তাহা হইতে অভিন্ন 'ধীমহি'—এই পদের সহিত যে সমগ্র গায়ত্রীর অর্থ—ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ সমস্ত মন্ত্রের আদি গায়ত্রীকে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করা উচিত হয় না। "যাহা হইতে জন্ম হইয়াছে এবং যিনি সঙ্কল্প মাত্রেই ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন"—এই অর্থের সর্ব্বলোকের আশ্রয়ত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরকত্বাদিরূপ গায়ত্রীর অর্থের সহিত সমতা থাকায় শ্রীমদ্ভাগবতের গায়ত্রীর অর্থের প্রকাশকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত মৎস্য পুরাণের বচনে—"ধর্ম্মবিস্তর" এই যে পদ আছে, সেটী পরমধর্ম্মের বিস্তার জানিতে হইবে। কারণ—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ"—এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় বচনেই ধর্ম্মের পরমত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং সেই ধর্ম্মও যে শ্রীভগবদ্ধ্যানাদি লক্ষণই"—ইহা পরে প্রকাশ পাইবে।

জন্মাদস্য যতঃ = সবিতু (জন্ম-স্থিতি ও প্রলয়)। পরং = বরেণ্যং।

সত্যং = ভর্গঃ (ব্রহ্ম)। তৎ = সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম।

স্বরাট = দেবস্য। তেনেব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে = ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

ধীমহি = উভয় স্থানেই এক প্রকার॥ অথবা জন্মাদস্য যতঃ" = ওঁ প্রণব জন্মস্থিতি ও নাশক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক। যত্রত্রিসর্গোমৃষা = ভূঃ, ভূবঃ, সঃ (চতুর্দ্দশভুবন)।

স্বরাট = সবিতুঃ ও ভর্গঃ। "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে = ধিয়োযো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ এবং স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে চঃ—

"যে শ্রীমদ্ভাগবতের গায়ত্রী অবলম্বনে পরম ধর্ম্মের বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে ইত্যাদি। সারস্বত কল্প মধ্যে যে সমস্ত ভগবৎলীলা হইয়াছে এবং ঐ লীলা সম্বন্ধি যে সকল দেবতা ও মনুষ্য হইয়াছিল, সেই বিষয়গুলি যে গ্রন্থের স্থল বিশেষে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। "লিখিত্বাতচ্চযোদদ্যাৎ" এবং "অষ্টাদশ সহস্রানি"—ইত্যাদি মৎস্য পুরাণের অনুরূপ শ্লোকের দ্বারাও এখানে বলা হইয়াছে। স্কান্দপুরাণান্তরেও আছে—'যাহাতে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা ও বৃত্রাসুর বধ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে এবং যাহার প্রারম্ভেই (প্রথম শ্লোকেই) গায়ত্রীর অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে ; এমন আঠার হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ দ্বাদশ স্কন্ধ-যুক্ত গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ।" উক্ত শ্লোকে "হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা—যাহা বলা হইয়াছে, তাহার বৃত্রবধের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাহাকে "নারায়ণ-ধর্ম্ম"ই বলা হইয়া থাকে। 'হয়গ্রীব' শব্দে এ স্থলে 'দধীচি' মুনি কথিত হইয়াছে ; সেই দধীচি মুনির অশ্বমুণ্ড ছিল।

তাঁহারই প্রচারিত "নারায়ণ বর্ম্ম" নামক ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্দে, দধীচিমুনির অশ্ব মুণ্ডের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে :— সেই দধীচিমুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে 'অশ্বশিরো' নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন, যাহার বলে উভয়ে জীবন্মুক্ত হয়। অশ্বশির দধীচির নামানুসারে ঐ বিদ্যার নাম অশ্বশির বা হয়গ্রীব হইয়াছিল। শ্রীধর টীকায় নারায়ণ বর্ম্মের ব্রহ্মবিদ্যায় প্রকাশ পাইয়াছে :— "অথর্ব্ববেদবিৎ দধীচিমুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ভয়ে, প্রবর্গ্য (প্রাণবিদ্যারূপ) ব্রহ্মবিদ্যা (নারায়ণ বর্ম্ম) উপদেশ করিয়াছিলেন।"

পদ্মাদি ৫ সাত্ত্বিক পুরাণের দ্বারাই পরমার্থ বিচার হউক ? তদুত্তরে :—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের অতিশয় প্রিয়, তন্নিমিত্ত তাঁহার ভক্তগণেরও অত্যন্ত অভীষ্ট ; সুতরাং অন্য সাত্ত্বিক পুরাণাপেক্ষা ইহারই অধিক সাত্ত্বিকতা।

পদ্মপুরাণে অম্বরীষ প্রতি গৌতমের প্রশ্নে—"যাহাতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ চরিত্র বর্ণিত আছে, তুমি সেই ভাগবতকে শ্রীহরির অগ্রে পাঠ করিয়া থাক ?" উক্ত পুরাণেই বাঞ্জুলীব্রত-মাহাত্ম্যে মঃ অম্বরীষকে গৌতমোপদেশ—"বাঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর রাত্রিতে জাগরণ এবং শ্রীবিষ্ণুর লীলাগুণ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। তাহার মধ্যে শ্রীহরির প্রীতি কামনায় শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম এবং শ্রীশুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত।" পদ্মপুরাণে স্থানান্তরে :— "অম্বরীষ ! **তোমার যদি সংসার ক্ষয় করিবার বাসনা থাকে, তবে নিত্য শ্রীশুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কর এবং স্বয়ং নিজমুখেও পাঠ কর।"** স্কান্দে প্রহ্লাদ সংহিতায় দ্বারকা-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে :— "যিনি হরিবাসরের দিন শ্রীহরির নিকটে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি স্বয়ং তো শ্রীভগবদ্ধাম লাভ করেনই, এমনকি তাহার সমস্ত কুল পর্য্যন্ত শ্রীবৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া থাকেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত অতিশয় পূর্ণ, অতি প্রাঞ্জল অর্থ ইহাতে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে ; ব্রহ্মসূত্রের এবং মহাভারতের অর্থ ইহাতে বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া গায়ত্রীর ভাষ্য বলা হয় ; বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্যও শ্রীমদ্ভাগবতে সন্নিবিষ্ট আছে। সামবেদ যেমন বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি ঐ সকল কারণে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের মধ্যে প্রধান। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক কথিত বলিয়া এই গ্রন্থকে 'ভাগবত' বলা যায়। ইহাতে দ্বাদশস্কন্দ, তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায় এবং আঠার হাজার শ্লোক বিদ্যমান আছে।" 'ব্রহ্মসূত্রের অর্থ'—অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমে সমাধিস্থ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের চিত্তে সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত হয়েন, পরে তিনি তাহার বিস্তৃত অর্থ সংক্ষেপ করিয়া সূত্ররূপে প্রকাশ করেন, তাহার পর তাহা হইতেই বিস্তাররূপে সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবত জগতে প্রচারিত হইয়াছে :— সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে আধুনিক অপর ভাষ্যকার-গণের স্বকপোলকল্পিত ভাষ্যগুলি, শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূল হইলেই আদর করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। নিম্নলিখিত লক্ষণাক্রান্ত মহাভারতের অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে নির্ণীত হওয়ায় ইহাকে 'ভারতার্থ বিনির্ণয়'—এই উপাধি দেওয়া হইয়াছে। ইহা গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে।

মহাভারতে বর্ণিত আছে— "যাহাতে সকলশাস্ত্রের নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহাকেই 'ভারত' বলা হয়। পূর্ব্ব-কালে শ্রীবেদব্যাসের অনুমতি অনুসারে ব্রহ্মাদি দেবগণ ঋষিগণের সহিত একত্রিত হইয়া **পরিমাপক যন্ত্রের একদিকে সমস্ত বেদ এবং অপরদিকে সমস্ত ভারতকে রক্ষা করেন, তখন ভারতই ভার হইয়াছিল।"** এইরূপে বেদ হইতে ভারতের মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বা উপলব্ধি হওয়ায় ঐ গ্রন্থ মহাভারত নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। মহাভারতেরও শ্রীভগবানেই তাৎপর্য্য। তাহা মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মের নারায়ণীয় উপাখ্যানে শ্রীবেদব্যাসের প্রতি জনমেজয়ের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে— "হে তপোনিধে ! যেমন দধি হইতে নবনীত, মলয় পর্ব্বত হইতে চন্দন, সকল বেদ হইতে আরণ্যক-উপনিষদ, এবং ঔষধি হইতে অমৃত আবিষ্কৃত হইয়াছে।"—তেমনি লক্ষশ্লোকাত্মক বিস্তৃত মহাভারত আলোচনা পূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ জ্ঞানরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া নারায়ণ-কথাশ্রয় উপাখ্যানরূপ অমৃত আপনা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দে বিদুর-মৈত্রেয়সংবাদে :—"হে মুনিবর আপনার সখামুনি (সর্ব্বজ্ঞ) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীভগবানের গুণ বর্ণনে অভিলাষী হইয়া মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন—যাহাতে গ্রাম্যকথা অর্থাৎ গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য-

রূপে নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারিক মূষিক-বিড়াল-গৃধ্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তযুক্ত কথাকীর্ত্তন-দ্বারা ভারত সভায় সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত হরিকথা রসে আকৃষ্ট হইয়াছে। হেমাদ্রিকরের শ্রীভারতে পদ্য উল্লেখে মহাভারতকে বেদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। স্ত্রী-শূদ্র এবং অধম ব্রাহ্মণগণের শ্রুতি শ্রবণের অধিকার নাই। তাহারা বৈদিকধর্ম্ম শ্রবণ করিতে না পারিয়া, কোন্টী সাধারণ জীবের কর্ত্তব্য, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন, এজন্য পরমকৃপালু ভগবান্ শ্রীব্যাস এই মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন। 'ভারতার্থ বিনির্ণয়'—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শব্দে মহাভারতকে বেদার্থের তুলনায় স্বীকার করা হইয়াছে। এই অর্থ হেমাদ্রির মতানুসারেই করা হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে 'গায়ত্রীর ভাষ্য' উল্লিখিত প্রমাণ মহাভারত যখন ভগবৎপররূপে স্থিরীকৃত হইল তখন সেই মহাভারতের বেদার্থ নির্ণয় হওয়ায়, বেদও ভগবৎপর এবং বেদমাতা গায়ত্রীও ভাগবৎপরা ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য? সুতরাং "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং" এই লক্ষণাক্রান্ত ভগবৎপর শ্রীমদ্ভাগবত ও গায়ত্রীর অর্থ বিস্তারকরূপে বর্ণন করায়, ভগবৎপর গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ ইহা যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীম্—ইত্যাদি শ্লোকেই সমর্থিত হইয়াছে এবং অগ্নিপুরাণে তাহা বিস্তারিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"সেই জ্যোতিঃ—চেতনই পরব্রহ্ম; যেহেতু—'ভর্গ' শব্দ তেজের বাচক; তেজ স্বয়ং প্রকাশ হইয়াও অপরকে প্রকাশ করেন সুতরাং তাহাকে 'চৈতন্য' বলা যায়, এবং চৈতন্যও তাহার আশ্রয়ী ব্রহ্ম, এই দুই পদার্থের অভেদ থাকায়, উহার চেতনেই তাৎপর্য্য।" এস্থলে বুঝিতে হইবে—'জ্যোতিঃ' শব্দে গায়ত্রীর 'ভর্গ'—ইহার ব্যাখ্যা হইল। এই অংশ উল্লেখ করিয়া পুনরায় কিঞ্চিত বিস্তাররূপে বলিতেছেন—"সেই জ্যোতিই জগতের জন্ম-স্থিতি-নাশের কারণ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু। তাঁহাকেই কেহ শিব, শক্তি, সূর্য্য, অগ্নি এবং অগ্নিহোত্রি-গণ নানা দেবতা নামে উপাসনা করিয়া থাকেন, কারণ বেদাদিতে এক বিষ্ণুকেই কোন কোন স্থানে অগ্নি প্রভৃতি দেবতারূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। কখনও বা তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্তই বিষ্ণুপর—ইহাই জানিতে হইবে।"

"জন্মাদ্যস্য" এই শ্লোকে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিতে বিষ্ণুপর ব্যাখ্যাই দেখান হইবে। কেবল ঐ প্রথম শ্লোকেই নহে, শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্দের "কস্মৈযেনবিভাসিতোঽয়ম্"—ইত্যাদির উপসংহার বাক্যেও 'শুদ্ধং, বিমলং, বিশোকং, অমৃতং, সত্যং, পরং এবং ধীমহি"—ইত্যাদি শব্দের সহিত, অগ্নিপুরাণের 'নিত্যং, শুদ্ধং, পরং ভর্গং, অধীশ্বরং, জ্যোতিঃ, অহং ব্রহ্ম এবং ধ্যায়েমহি'—এই সকল বাক্যের সমতা রহিয়াছে। অগ্নিপুরাণে যে "অহংব্রহ্ম" এই শব্দটি দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই বোধ হয়—"নাদেবোদেবমর্চ্চয়েৎ"—ন্যায়ানুসারে ভজনের যোগ্যত্বরূপে অর্থাৎ **'আমি নিত্যমুক্ত ভগবদ্দাস'—এইরূপ ভাবনাই সঙ্গত হইবে।** কারণ শুদ্ধভক্তগণের অহংগ্রহোপাসনা (আমিই ব্রহ্ম এইরূপ উপাসনা মুমুক্ষুগণের সাযুজ্যমুক্তির অনুকূল) অভীষ্ট নহে। অগ্নি পুরাণের ঐ বাক্যে যে; 'ধ্যায়েমহি' ক্রিয়া আছে, ইহার বহুত্ব বিবক্ষা না রাখিয়া 'অহং ধ্যায়েম্'—আমি ধ্যান করিতেছি—অর্থাৎ আমরা সকলে ধ্যান করিতেছি' এই অর্থ পর্য্যন্ত পৌছিবে।

মতান্তরে সকারান্ত 'ভর্গস্' শব্দ থাকিলেও অগ্নি পুরাণের মতে অকারান্ত 'ভর্গ' শব্দই পাওয়া যাইতেছে—তবে গায়ত্রীতে যে ভর্গঃ'—এই বিসর্গযুক্ত আছে। উহাও দ্বিতীয়ার একবচন—'অম্' বিভক্ত্যন্তই বুঝিতে হইবে। কারণ "সুপাংসুলুক"—এই ছান্দসসূত্রে 'অম্' এর স্থানে 'সু'—এই বিভক্তি করা হইয়াছে। শ্রীভাগবতঃ (১২) "ওঁ নমস্তে ভগবতে আদিত্যায়"—ইত্যাদি পদ্যে যে সূর্য্যকে স্তব করা হইয়াছে, সেটি পরমাত্ম-দৃষ্টিতে অর্থাৎ সূর্য্যেরও পরমাত্মা ভগবান্ঃ—তাঁহার সহিত সূর্য্যের ঐক্য বুদ্ধিতে এবং শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান—'সূর্য্য; ভগবান্ অধিষ্ঠাতা—এই অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতার অভেদ বুদ্ধিতে জানিতে হইবে। এস্থলে স্বতন্ত্র ভাবে সূর্য্যকে স্তব করা হয় নাই—সুতরাং ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎপরতার হানি হয় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশৌনক বাক্যেই ঐ সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইতেছে—"সূত! আমরা শ্রদ্ধালু সুতরাং তুমি সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা ভগবান্ শ্রীহরির অবতার কীর্ত্তন কর। ঐ ভর্গের সূর্য্যমণ্ডলমাত্রই যে অধিষ্ঠান; তাহাই নহে,

গায়ত্রীর 'বরেণ্য' এই শব্দের দ্বারা এবং এই শ্রীমদ্ভাগবতের পর শব্দের দ্বারা তাহার পরমৈশ্বর্য্য পর্য্যন্ত বৃত্তি দেখান হইয়াছে। এইরূপ অর্থ অগ্নিপুরাণেও পাওয়া যায়—

'সূর্য্যমণ্ডলে এই পুরুষ—শ্রীবিষ্ণুরূপ এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখিবে অর্থাৎ ত্রিলোকীস্থিত জীবগণের উপাসনার নিমিত্ত প্রলয়কালে বিনশ্বর সূর্য্যমণ্ডলেও এই পুরুষ শ্রীবিষ্ণু অন্তর্যামিরূপে প্রাদুর্ভূত আছেন। এই ভাবে উপাসনা করিবে। সূর্য্যমণ্ডলাত্মক অধিষ্ঠান—অনিত্য, তবে শ্রীভগবানের কোন্ অধিষ্ঠান নিত্য? তদুত্তরে—শ্রীমহাবিষ্ণুর মহাবৈকুণ্ঠ-নামক যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান, তাহা তিন কালের ব্যাভিচারশূন্য অর্থাৎ কোনরূপ অবস্থায় পরিবর্ত্তন হয় না এবং ঐ ধামে কোন উপদ্রব নাই, কারণ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠকে কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে 'মহাবৈকুণ্ঠ' শব্দ আছে, তাহার দ্বারা মহাবৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ভগবদ্ধামের কথাই বলা হইয়াছে, কারণ শ্রীমথুরাদি ধামও তো শাস্ত্রে নিত্যরূপে বিরাজমান। আর দেখা যাইতেছে 'বিষ্ণুশব্দে' ভগবত্তা নির্ব্বিশেষে 'শ্রীকৃষ্ণ'কেও গ্রহণ করা হইয়াছে—সুতরাং অগ্নিপুরাণের গায়ত্রীর উপাস্য নিশ্চয়রূপে ইহা স্বীকার না করিলে শ্রীকৃষ্ণপর শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্য একথার সঙ্গতি হয় না। কারণ "ধ্যানেনপুরুষোহয়ঞ্চ"—এই পদ্যে গায়ত্রীর অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে এবং প্রকরণে শ্রীমদ্ভাগবতের সহ গায়ত্রীর অর্থের সামঞ্জস্য দেখান হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে বিষ্ণু শব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ' না বুঝাইলে শ্রীমদ্ভাগবতের গায়ত্রীর ভাষ্যরূপতা সুসিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবিষ্ণুতে সিদ্ধান্ততঃ তেমন কিছু ভেদ দেখা যায় না। "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতেকৃষ্ণরূপমেষারসস্থিতিঃ"॥ শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবানের নিত্যাধিষ্ঠান; এই নিমিত্ত ইহাকেও ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে। গায়ত্রীও শ্রীকৃষ্ণপর—এই নিমিত্ত অগ্নিপুরাণ;—গায়ত্রীকে বলিয়া পরে পুরাণ লক্ষণ বলিবার সময় "যত্রাধিকৃত্যগায়ত্রীং" ইত্যাদি পদ্যে গায়ত্রীর অর্থের উৎকৃষ্টতা কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণ বলাতেই তাহার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে—"অগ্নিপুরাণ, ভগবতপরা গায়ত্রীকে ব্যাখ্যা দ্বারা দেখাইয়াছেন এবং সেই গায়ত্রীতে জগতে জন্মাদির কারণ শ্রীভগবান্‌কে নির্ণয় করিয়া সমস্ত জগতের সার অর্থের প্রকাশ করায় নিরন্তর জয়যুক্ত হইতেছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতও সেইরূপ শ্রীভগবান্‌কে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্যরূপে নিশ্চয় করিয়া জগতে সর্ব্বোৎকর্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

পূর্ব্বে যে শ্রীমদ্ভাগবতের সারস্বতকল্পত অধিকার করিয়া প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত নহে; কারণ সরস্বতীও গায়ত্রীর ভগবৎ প্রতিবাদক বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবী, যেহেতু অগ্নিপুরাণে বলা হইয়াছে—"উকথ—(বেদমন্ত্রাত্মক) শাস্ত্র, ভর্গাখ্য ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয় এবং সাবিত্রী গান (প্রকাশ) করেন বলিয়া 'গায়ত্রী' বলা হয়, বেদাদি শাস্ত্রকর্ত্তা—সবিতার বাক্যস্বরূপ হওয়ায় সরস্বতী গায়ত্র্যর্থ প্রকাশ করেন।"

এইরূপ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি গ্রন্থে গায়ত্রীর ব্যাখ্যাস্থলে শ্রীভগবান্‌ই বিস্তাররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এখানে "জন্মাদ্যস্য" ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা গায়ত্রীর অর্থের সহিত সমন্বয় করিয়া দেখান যাইবে। এখন গরুড় বচনের কয়েকটি বিশেষণ পদের ক্রমিক ব্যাখ্যা দেখান যাইতেছে:—"পরিবৃংহিতঃ"—যাহাতে সমস্ত বেদার্থের বিস্তার রহিয়াছে—এই অর্থ—"ইতিহাস পুরাণাভ্যাম্‌" ইত্যাদি শ্লোকে প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ বেদে যে বিষয়গুলি স্বল্পাক্ষরে ও পরোক্ষভাবে বলা হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতে সেই বিষয় বিস্তৃত এবং স্পষ্টরূপে রহিয়াছে।

"পুরাণানাংসামরূপঃ"—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সকলের মধ্যে সামরূপ অর্থাৎ বেদের মধ্যে যেমন সামবেদ শ্রেষ্ঠ, তেমনি পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ। কোন কোন পুরাণের আপাততঃ রজোগুণ এবং তমোগুণের আধিক্য দেখিয়া সাধারণের হৃদয়ে ঐ সমস্ত পুরাণের সাক্ষাৎভাবে স্বয়ং ভগবতপরতা বিষয়ে প্রতীতি না হইলেও যেমন অন্যান্য বেদের কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং দেবতাকাণ্ডেই সাক্ষাৎভাবে তৎপরতা দেখা যায়, কিন্তু সামবেদে প্রতিপাদিত ভগবানেই ঐ সকলবেদের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত হয়; তেমনি অন্যান্য পুরাণেও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবানেই পরম্পরারূপে পর্য্যবসান জানিতে হইবে। শাস্ত্রে—"বেদ, রামায়ণ, পুরাণ এবং ভারত—এই সকল শাস্ত্রের আদি, মধ্য এবং অন্ত—সর্ব্বত্রই শ্রীহরি কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহা পরমাত্ম সন্দর্ভে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে ;—কলিকালে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বর্ত্তমান নাই, তাহার অপরাপর শতসহস্র শাস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন কি ? তাহাকে কি করিয়া বৈষ্ণব বলিয়া জানা যায় ? সে ব্রাহ্মণ হইলেও অধম চণ্ডালতুল্য। হে নারদ ! কলিতে যথায় শ্রীমদ্ভাগবত বিরাজমান—ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত দেবগণের সহিত তথায় আবির্ভূত আছেন। যে ব ক্তি সংযত চিত্তে শ্রীমদ্ভাগবতের িত্য একটি শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশ পুরাণ পা'ঠর ফললাভ করিয়া থাকেন।

"সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ"—সাক্ষাৎ ভগবান্ যে শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—"কস্মৈযেনবভসিতোহয়মতুলোজ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা"—ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে এবং এস্থলেও ঐ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। "শতবিচ্ছেদসংযুক্তঃ"— তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়যুক্ত। এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে চক্রবর্ত্তীত্ব পদ লাভ করিয়াছেন বলিয়া "হেমসিংহাসনে আরূঢ়"—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই নিমিত্তই **"শতশোহথসহস্রৈস্ত"**—(ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ণ-শ্রবণাদি আবশ্যকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়াছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত স্বতঃসিদ্ধ অনন্তগুণরাশি থাকাতে পরমার্থ জিজ্ঞাসু মানবগণের শ্রীমদ্ভাগবতই যে একমাত্র বিচারের বিষয় ইহাই স্থিরীকৃত হইল।)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১৩।৪২ শ্লোকে—কলিকালে সকল লোকেরই চক্ষুঃ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে বিনষ্ট হইয়াছিল। ঐ সময় এই পুরাণস্বরূপ সূর্য্যোদয় হয়। তদ্ব্যতীত অন্যান্য বহুশাস্ত্রের সর্ব্বাংশে বস্তু প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে বিবিধ শাস্ত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে যে তন্ত্রভাগবতের নাম দেখা যায়, উহা শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যস্বরূপ অর্থাৎ অবিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ ; আবার ঐ সাক্ষাৎ শ্রীহনুমদ্ভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থ-দীপিকা ও পরমহংসপ্রিয়াদি বহু বহু ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং মুক্তাফল, হরিলীলা, মুক্তাবলী প্রভৃতি নিবন্ধগুলিও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মত প্রচারক মহানুভবগণ-কর্ত্তৃক রচিত হইয়া এখনও জগতে প্রচলিত রহিয়াছে।

হেমাদ্রিকৃত স্মৃতিসংগ্রাহক গ্রন্থের দানখণ্ডে পুরাণ দানের প্রসঙ্গে, মৎস্যপুরাণ-বচনে ও শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৩) "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা" ; বাক্যের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্ত্তনরূপ ধর্ম্মই মুখ্যধর্ম্মরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

যদি শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বজনাদৃত ; তবে তাহা শঙ্করাচার্য্য-কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইল না কেন ? তদুত্তরে শিব অবতার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য "যে শ্রীমদ্ভাগবত মোক্ষকে অতিক্রম করিয়া একমাত্র ভক্তি সুখেরই নিরতিশয় উৎকর্ষের প্রকাশক সুতরাং তিনি আমার মতের উপরেও বিরাজমান"—ইহা অনুভব করিয়া, পাছে ভগবান্ কুপিত হয়েন—এই ভয়ে অপৌরুষেয় বেদান্ত ব্যাখ্যারূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে চালনা করেন নাই, তবে ইহার পর বর্ণিত হইবে যে, শ্রীভগবানের নিজতত্ত্ব গোপন বিষয় আজ্ঞা—তদনুসারে আপনার প্রবর্ত্তিত—অদ্বৈত মতাবলম্বনে, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীব্রজেশ্বরীর বিশ্বরূপ দর্শন জন্য বিস্ময় এবং শ্রীব্রজকুমারীগণের বস্ত্রহরণাদি লীলাগুলিকে নিজকৃত গোবিন্দাষ্টক নামক গ্রন্থে তটস্থভাবে বর্ণন করিয়া নিজ বাক্যের সাফল্য বিধান মানসে স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র জানিতে হইবে। (ব্যাখ্যা গ্রন্থ :—যে কোন একখানি গ্রন্থস্থিত বিষয়ের ক্রমিক ভাবে শব্দার্থ এবং তাৎপর্য্য নির্ণায়ক গ্রন্থ। নিবন্ধ গ্রন্থ :—এক বা বহুগ্রন্থের কিছু কিছু অংশ সংগ্রহ করিয়া তাহার শব্দার্থ ও তাৎপর্য্য নির্ণায়ক গ্রন্থ।)

শ্রীমাধবাচার্য্য দেখিলেন—"অদ্বৈতব দণ্ডরু শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে বিচলিত না করিয়া আদরই করিয়াছেন ; কিন্তু তাহার শিষ্য "পুণ্যারণ্য" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্নরূপ, ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা সাধারণ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া 'ভাগবত'—নির্গুণ-নিরাকার চিন্মাত্র-ব্রহ্মপর, এইরূপ ভ্রম আনিতে পারে, এ কারণ পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণের ভ্রান্তি অপনোদন মানসে 'শ্রীমদ্ভাগবতের সগুণ-সবিশেষ ভগবৎপর—একটি তাৎপর্য্য লিখিয়া একটি সম্প্রদায়ও গঠন করিয়া যান"—প্রাচীন ভক্তগণ ইহা বলেন।

বহুতর জ্ঞানিকুল চূড়ামণি বিদ্বদ্গণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্দে যুক্তিযুক্ত বচন—

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন আত্মজ্ঞানিগণের মধ্যে প্রধান শ্রীশুকদেবকে সমস্ত বেদ ও ইতিহাসের সারাংশ এই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।" দ্বাদশ স্কন্ধেও কথিত আছে :—

শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বেদান্তের সার, যিনি ইহার কথামৃতে পরিতৃপ্ত, তাঁহার অন্য কোথাও রুচি হয় না। প্রথম স্কন্ধে—"অহো কি আনন্দ—সমস্ত পুরুষার্থ বিতরণে সমর্থ, নিগম-কল্পতরুর ফল—এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশুকের মুখ হইতে এই পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছেন। ওহে রসবিশেষ-ভাবনাচতুর রসিকগণ! অনতিবিলম্বে এই দ্রবীভূত অমৃতময় ফল—মোক্ষ পর্য্যন্ত নিরন্তর পান করিতে থাকুন।"

প্রথমস্কন্ধেও বলা হইয়াছে—"যাহারা পথহারা পথিকের মত, নিবিড় অন্ধকারময় এই সংসার অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে বিষয়-কণ্টকে ব্যথিত হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া চীৎকার করিতেছে, তাহাদের প্রতি করুণা করিয়া যিনি—'অসাধারণ শক্তিশালী, নিখিল বেদের সার, আত্মতত্ত্ব দর্শনের একমাত্র প্রদীপ—শ্রীমদ্ভাগবত দেখাইয়াছেন, আমি সেই মুনিগণের পূজনীয় ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আশ্রয় করি'।"

শ্রীমদ্ভাগবতের মত যে সর্ব্বশাস্ত্রের অধিনায়ক, তাহা উক্ত শ্লোকে সূচিত হইয়াছে এবং মুনিগণের সভামধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপদেশ করায় শ্রীশুকদেবেরও সেই সকল মুনিগণ অপেক্ষা জ্ঞানের আতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিলে জগৎ পবিত্রকারী তীর্থ পর্য্যটন-ছলে স্বয়ংতীর্থকুল—অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্র, প্রমদ, ইদ্মবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিসেন, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষঃ, অগস্ত্য, বেদব্যাস-দ্বৈপায়ন, ভগবান্ নারদ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও অরুণাদি রাজর্ষিবর্গও তথায় আসিয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাদিগকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজদত্ত আসনে উপবেশনে শ্রমাপনোদন করিলে, মহারাজ পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া নিজ অভিষ্ট জ্ঞাপন করেন। "বিপ্রগণ! আমার বহু সৌভাগ্যফলে আপনাদিগকে একত্রে পাইয়াছি। আপনাদিগের নিকট সদুত্তরের আশায় আমার জিজ্ঞাস্য এই—'কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি বহু কর্ত্তব্য বিষয় শ্রবণ করা যায়, কিন্তু ঐগুলির মধ্যে সকলের সকল অবস্থাতে, বিশেষতঃ আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির সম্বন্ধে নির্দ্দোষ সর্ব্বোত্তম কার্য্য কি? তাহা সকলে একবাক্যে নিশ্চয় করিয়া আমাকে আদেশ করুন।"

"মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে প্রশ্ন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিতে পরমানন্দময়, আশ্রমাদি চিহ্ন-শূন্য অবধূত বেশধারী, নিস্পৃহ, ব্যাসনন্দন ভগবান্ শ্রীশুকদেব সদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বালকগণে পরিবৃত হইয়া পরীক্ষিৎ-সভায় উপস্থিত হইলেন।" তাহার পর "সেই গূঢ়তেজা শ্রীশুকদেবকে অবলোকন করিবামাত্র সমস্ত মুনিগণ নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইলেন।" ইত্যাদি বর্ণনান্তে সূত পুনরায় বলিয়াছিলেন—'মহতেরও মহৎ সেই শুকদেব সভামধ্যে ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি এবং রাজর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্রগণে সুশোভিত শশধরের ন্যায় অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষিৎ সভাতে উপস্থিত শ্রীব্যাস ও নারদ শ্রীশুকদেবের গুরু ও পরমগুরু; তথাপি পুনর্ব্বার শ্রীশুকদেবের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের উভয়ের নিকট যেন 'পূর্ব্বে কোন দিন ইহা শ্রবণ করেন নাই' বলিয়া বোধ হইতেছিল—এইভাবে শ্রীশুকদেব, ব্যাস ও নারদকে উপদেশ্য বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের বিষয়-বিশেষে আবেশ থাকায় শ্রীমদ্ভাগবতের অতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য সে সময় স্মরণ ছিল না। শ্রীশুকদেব তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, এস্থানের ইহাই অভিপ্রায়।' শ্রীব্যাসদেবও বলিয়াছেন—"শ্রীশুকমুখ-নিসৃত এই শ্রীমদ্ভাগবত দ্রবীভূত অমৃতময় ফল।" বক্তা শ্রীশুকদেবের সকলের গুরুত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হইতেছে। পুরাণের মধ্যে মৎস্যাদি পুরাণের যে আধিক্য শ্রবণ করা যায়, সেটি আপেক্ষিক অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন অন্য পুরাণ অপেক্ষায় মৎস্যাদি পুরাণ শ্রেষ্ঠ ইহাই বুঝিতে হইবে।

অহো ! আর অধিক কি বলিব, এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্ব সদ্গুণ-যুক্ত যাহা প্রথম স্কন্ধে বলা হইয়াছে :— "শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিপাদক ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং বিবেকাদির সহিত নিত্যলীলায় প্রবি হইলে, সম্প্রতি অজ্ঞানান্ধ (তাদৃশ ধর্ম্মাদিহীন) কলির জীবের সম্বন্ধে এই পুরাণ-সূর্য্য (শ্রীমদ্ভাগবত) সমুদিত হইয়াছেন।" এজন্য "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র" ইত্যাদি শ্লোকে, শ্রীমদ্ভাগবতকেই নিখিলগুণের খণিরূপে অবগত হওয়ায় এবং "বেদ, পুরাণ ও কাব্যশাস্ত্র—ইহারা ক্রমান্বয়ে প্রভু, মিত্র এবং প্রেয়সীর ন্যায় হিতজনকে উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত উক্ত তিনরূপেই নিয়ত সদুপদেশ দিয়া জীবের কল্যাণ করিয়া আসিতেছেন।" এইরূপে হেমাদ্রিকার শ্রীবোপদেবের মুক্তাফল টীকাধৃত বচনেও শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বগুণাকরত্ব দেখা যায়। তবে "বেদোক্ত বাক্য হইতেই পুরাণের প্রামাণ্য"—এইরূপে কেহ কেহ অন্যান্য পুরাণের বেদের সাপেক্ষত্ব মনে করিতে পারেন বটে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে সে সম্ভাবনা নাই—ইহা ভাগবতীয় বাক্যেই পাওয়া গিয়াছে ; অতএব পরমার্থের জ্ঞাপক হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতও বেদান্তের ন্যায় পরমশ্রুতিস্বরূপ। একথা প্রথম স্কন্ধেই বলা হইয়াছে :— "তাত সূত ! কি প্রকারেই বা পাণ্ডুকুলনন্দন পরীক্ষিতের শ্রীশুকদেবের সহিত সম্বাদ হইয়াছিল ; যাহাতে এই সাত্বতী (বৈষ্ণবী) শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব হইয়াছিল ?" শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সমস্ত পুরাণাদি আবির্ভাব করিয়া পরে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব করেন—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।" প্রথম স্কন্ধে শ্রীব্যাস-নারদ-সংবাদ দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এইরূপে যখন শ্রীমদ্ভাগবতেরই সর্ব্বশাস্ত্রশ্রেষ্ঠত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব স্থাপিত হইল, তখন পরমমঙ্গলময় বস্তু এবং তাহার সাধন নির্ণয় কল্পে পূর্ব্বাপর অবিরোধে শ্রীমদ্ভাগবতেরই বিচার করা যাইতেছে। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতই বাস্তবতত্ত্বের প্রকাশক ইহা জানান হইতেছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতকে ভিত্তি করিয়া তাহার অনুগত যে যে শাস্ত্রবাক্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিও প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। (তত্ত্ব সন্দর্ভ)

পঞ্চরাত্র

'পঞ্চরাত্র'—নামটির বিভিন্ন প্রকার নিরুক্তি পাওয়া যায়। শ্রীনারায়ণ পঞ্চ আয়ুধাংশস্বরূপ পঞ্চঋষিকে (শাণ্ডিল্য, ঔপগায়ন, মৌঞ্জ্যায়ন, কৌশিক ও ভরদ্বাজ) এক এক অহোরাত্র ব্যাপিয়া যে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, তাহাই 'পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই শাস্ত্রের নাম—'একায়ন', 'মূলবেদ', 'সাত্বতশাস্ত্র', বা 'ভাগবত শাস্ত্র' ছিল (ঈশ্বর সংহিতা)।

অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—তত্ত্ববস্তুর পর, ব্যূহ, বিভব ও স্বভাবাদি-নিরূপণ এবং একমাত্র মোক্ষফলের উদ্দেশক যে তন্ত্র, তহাই 'পঞ্চরাত্র' নামে কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন,—অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ—এই 'পঞ্চকাল উপাসনা' যে শাস্ত্রে আছে, তাহাই 'পঞ্চরাত্র'। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মন্দির-মার্জ্জনাদি-দ্বারা সংস্কারকে 'অভিগমন', গন্ধপুষ্পাদি-দ্বারা পূজাসম্পাদনের নাম—'উপাদান', 'শ্রীবিষ্ণুপূজাকে—'ইজ্যা', অর্থানুসন্ধান পূর্ব্বক মন্ত্র জপকে—'স্বাধ্যায়' এবং স্তোত্র-পাঠ, নাম-কীর্ত্তন ও তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসকে—'যোগ' বলে। 'রাত্রি' শব্দের অর্থ অজ্ঞান ও 'পঞ্চ'-শব্দের অর্থ নাশক ; সুতরাং 'পঞ্চরাত্রের' অর্থ—অজ্ঞান-নাশক শাস্ত্র। (প্রশ্ন সংহিতা)। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রের মতে রাত্র-শব্দে—'জ্ঞান' উহা পাঁচ প্রকার। প্রথম ও দ্বিতীয় জ্ঞান—'সাত্বিক-জ্ঞান' অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও জরানাশক পরমতত্ত্ব-জ্ঞান ও শুদ্ধমুক্তিপ্রদ জ্ঞান ; তৃতীয় জ্ঞান—শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি-প্রদায়ক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নির্গুণ-জ্ঞান' ; চতুর্থ যৌগিকজ্ঞান—'রাজসিক' ; ভক্তগণ উহা অভিলাষ করেন না। পঞ্চম-জ্ঞান—'তামসিক' ; ইহা জ্ঞানিমাত্রেরই অবাঞ্ছনীয়। এই পঞ্চ প্রকার জ্ঞানকে পণ্ডিতগণ পঞ্চরাত্র বলেন। (নারদ-পঞ্চরাত্র)

প্রামাণিকতা :—পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র অত্যন্ত বিপুল ও বিস্তৃত। প্রশ্ন, বিষ্ণুতিলক ও অন্যান্য সংহিতার উক্তি-অনুসারে আদি-পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র দেড়কোটি শ্লোকে গ্রথিত ছিল। পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তের অন্তর্গত যে সকল গ্রন্থের শ্লোক-সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র পর্য্যন্ত ; সেই সকল গ্রন্থ 'সংহিতা' নামে কথিত। পঞ্চরাত্র-সংহিতা বিভিন্ন অধ্যায়ে বা পটলে বিভক্ত। পঞ্চরাত্রে সাধারণতঃ দশটি বিষয়ের বিবৃতি দৃষ্ট হয়— (১) চতুর্ব্যূহ—সিদ্ধান্ত, (২) মন্ত্র, (৩) যন্ত্র, (৪) মায়াযোগ, (৫) যোগ

(৬) শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ, (৭) প্রতিষ্ঠাবিধি, (৮) সংস্কার-আহ্নিক, (৯) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও (১০) উৎসব।

পঞ্চরাত্র—সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ শাস্ত্র বা বেদ। ইহা শ্রীনারায়ণ শ্রীনারদের নিকট কীর্ত্তন করেন। শ্রীনারদ হইতে শ্রৌত-পারম্পর্য্যে ঋষিগণ ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—'এই চতুর্ব্বেদ-সমন্বিত মহোপনিষৎ সাংখ্য-যোগযুক্ত হইয়া 'পঞ্চরাত্র'-নামে কথিত হইয়াছেন। ইহা শ্রীনারায়ণের শ্রীমুখ-বিগলিত এবং পূর্ব্বে শ্রীনারদ ইহা অন্যান্য ঋষিগণকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত হয় যে, শ্রীনারদ শ্রীসনৎকুমারের নিকট হইতে 'একায়ন'-শাস্ত্র লাভ করেন। বেদকল্পতরুর এই একায়ন-স্কন্ধ হইতেই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছেন। ঈশ্বরসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—শ্রীশাণ্ডিল্য, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীসুগ্রীব, শ্রীহনুমান, শ্রীবিভীষণ, শ্রীসনক, শ্রীশঠকোপ-প্রমুখ মুনিগণ পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক।

যাঁহারা পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে 'পাঞ্চরাত্রিক', 'ভাগবত' বা 'সাত্বত' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়; আর যাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক বিধি-অনুসারে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের আরাধনা করেন, তাঁহারা 'পরমৈকান্তী' 'সূরি' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (পাদ্ম-সংহিতা)।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—'সমস্ত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ। ন্যায়ানুমোদিত শাস্ত্রোক্ত বস্তুতত্ত্ব বিচার করিলে জানা যায়,—সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বেদ ও আরণ্যক (বেদের যে অঙ্গ অরণ্য মধ্যে পঠিত হয়) পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবাপন্ন। এই শাস্ত্র সমূহই 'পঞ্চরাত্র' নামে কথিত হয়। শ্রীবরাহপুরাণ, শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, শ্রীকূর্ম্মপুরাণ, শ্রীস্কন্দপুরাণ, শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে পঞ্চরাত্রের প্রচুর মাহাত্ম্য পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, শ্রীবিষ্ণু তৃতীয়বারে মুনিগণের মধ্যে প্রাদুর্ভূত দেবর্ষিরূপ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনারদরূপে সাত্বত-পাঞ্চরাত্রাগম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চরাত্রের উক্তি হইতে ভগবদ্ধর্ম্মসমূহ কর্ম্মবন্ধন-মোচনের কারণ হয়। যিনি শীঘ্রই স্বীয় হৃদয়গ্রন্থিছেদনে অভিলাষী তিনি তন্ত্রোক্ত বিধিক্রমে শ্রীকেশবদেবের আরাধনা করিবেন।

পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র—(১) 'দিব্য' অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীভগবৎপ্রদত্ত ও (২) মুনিভাবিত অর্থাৎ ঋষিপ্রোক্ত-ভেদে দ্বিবিধ। অন্য প্রকারে—পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত। এই চতুর্ব্বিভাগের ক্রম ভিন্ন ভিন্ন সংহিতায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ঈশ্বর-সংহিতায় এই চারিভাগের ক্রম এইরূপ—আগম, মন্ত্র, তন্ত্র ও তন্ত্রান্তর, কিন্তু পাদ্ম-সংহিতায় প্রথম—মন্ত্র, দ্বিতীয়—আগম, তৃতীয়—তন্ত্র ও চতুর্থ—তন্ত্রান্তর।

কপিঞ্জল-সংহিতায় ১০৬টি পঞ্চরাত্র-সংহিতার নাম, পদ্মতন্ত্রে ১১২টি নাম, বিষ্ণুতন্ত্রে ১৪১টি নাম, হয়শীর্ষসংহিতায় ৩৪টি নাম, নারদীয়-পঞ্চরাত্রে ৭টি নাম, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ৫টি, অগ্নিপুরাণে ২৫টি নাম পাওয়া যায়। 'আগম-প্রামাণ্যে' শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ ৫টি সংহিতা' 'শ্রীভাষ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ ৩টি সংহিতা (সাত্বত-সংহিতা, পরম-সংহিতা ও পৌষ্কর-সংহিতা), শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্য 'পাঞ্চরাত্র-রক্ষা'য় ২৮টি সংহিতায় নাম এবং 'ন্যায়সিদ্ধাঞ্জনে' ১টি আগম, ২টি তন্ত্র ও ৩টি সংহিতা, মোট ৬টি পঞ্চরাত্র-গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ২৭টি সংহিতা ও ১০টি তন্ত্র মোট ৩৭টি এবং 'বেদান্তভাষ্যে' ৮টি সংহিতা ও ৫টি তন্ত্র—মোট ১৩টি পঞ্চরাত্র-মূলক গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্য একবাক্যে শ্রীপঞ্চরাত্রের মহিমা গান করিয়াছেন। 'শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র-বিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি ও উৎপাতের হেতু', ইহা ব্রহ্মযামলে উক্ত হইয়াছে। 'পৌষ্কর-সংহিতা' শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রেরই অন্তর্গত বা উহা হইতে অভিন্ন। পাণিনির ও পতঞ্জির সময়ে 'বাসুদেব-উপাসনা' বর্ত্তমান ছিল।

ছান্দোগ্যোপনিষদে, শতপথ-ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে যে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রকে শ্রীনারায়ণ-মুখোদ্গীর্ণ বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখবিগলিত বাণী—তাহাই 'উপনিষদ্'—তাহাই 'বেদ'। আপ্তবাক্য-বিশ্বাসী দিব্যসূরিগণ সকলেই একবাক্যে সাত্বত-পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের 'সনাতনত্ব' কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐতরেয় ও শতপথ-ব্রাহ্মণে 'সাত্বত' শব্দের প্রয়োগ আছে এবং শতপথ-ব্রাহ্মণে 'পঞ্চরাত্র'-সূত্রের উল্লেখ আছে। 'সাত্বত' ও 'পঞ্চরাত্র' একই পর্য্যায় শব্দ। 'আগম-প্রামাণ্যে' শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন,—'বেদমূলকতা হেতু শ্রীপঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যের আবশ্যকতা

নাই ; বেদের প্রমাণ যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ, পঞ্চরাত্রের প্রমাণও সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ' একমাত্র মোক্ষমার্গই 'পঞ্চরাত্র'। এইজন্য ইহার নাম "একায়ন"—এক (অদ্বিতীয়) + অয়ন (পথ বা মার্গ)।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ পঞ্চরাত্রের ব্যূহ-সিদ্ধান্ত, পঞ্চকাল-উপাসনা এবং পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য শ্রীবাসুদেবের পরাৎপরত্ব, অপ্রাকৃতত্ব প্রভৃতি মূল বিষয়গুলি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যাহা পঞ্চরাত্রের বা কোন সাত্বত শাস্ত্রের আদৌ সিদ্ধান্ত নহে, ঐরূপ কয়েকটি কল্পিত মতকে পাঞ্চরাত্রিকগণের মত বলিয়া নিজের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ও শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু সেই সকল শঙ্করাচার্য্যের পঞ্চরাত্রবিরোধী মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পঞ্চরাত্রবিরোধী মতবাদের খণ্ডনে শ্রীলরূপপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের (২।২।৪৩) শাঙ্কর-ভাষ্য-খণ্ডনপর সিদ্ধান্তরূপে মূল-সঙ্কর্ষণ হইতে অন্যান্য যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের প্রাকট্যের বিষয় 'ব্রহ্মসংহিতা'য় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—'এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্ত্তিগত হইয়া বিস্তারহেতু সমান-ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ চরিষ্ণুভাবে যিনি প্রকাশিত হন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি'। ভাগবতগণ ভগবানের চতুর্ব্ব্যূহ স্বীকার করায় 'বহ্বীশ্বরবাদ' স্বীকার করেন নাই ; তাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বলিয়াই জানেন। তাঁহারা শ্রুতি-বেদান্ত-মহাভারতাদি শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে শ্রীভগবানের অচিন্ত্যমহাশক্তিমত্তায় দৃঢ় বিশ্বাসী। শ্রীবাসুদেব, শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীঅনিরুদ্ধ—এই তত্ত্বচতুষ্টয়-মধ্যে কারণ-কার্য্যভাব নাই। তাঁহারা সকলেই মায়াধীশতত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয় ; তাঁহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা বিকার অথবা পরিণাম বা খণ্ডত্ব থাকিতে পারে না। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" (বৃহদারণ্যক ৫।১) ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ।

শ্রীজীবপাদ শ্রীরূপপাদের লঘুভাগবতামৃতের সিদ্ধান্তের অনুসরণে সর্ব্বসম্বাদিনীর উপসংহারে বলিয়াছেন,— শ্রীভগবান্ ও (১) 'শ্রীবাসুদেব' এক। পুরুষের নিরুপাধিক অবস্থাই 'বাসুদেব', তিনিই পরমাত্মা' ইহা পাঞ্চরাত্রিক-দিগের অভিপ্রায়। এই বাসুদেব কোন সময়ে রক্তবর্ণ, কোন সময়ে শ্যামবর্ণ, কোন সময়ে বা গৌরবর্ণ ; আবার কখন চিত্তের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাসনা-বিশেষে শাস্ত্রে ইহার নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। পুরুষের সঙ্কর্ষণাদি আবির্ভাব আছে। (২) শ্রীসঙ্কর্ষণ —ইনি সৃষ্ট্যাদির জন্য মহাসমষ্টি জীবের ও প্রকৃতির এবং এক অংশে সংহারার্থ রুদ্র, অধর্ম্ম, যম, সর্প ও দৈত্যাদির নিয়মন করেন। ইনি—শুক্লবর্ণ। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাসনা-বিশেষে ইঁহার নির্দ্দেশ পরিলক্ষিত হয়। শেষাবিষ্ট—ইঁহারই অংশ। (৩) শ্রীপ্রদ্যুম্ন—ইনি স্থূলকার্য্যের উৎপত্তি-নিমিত্ত সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডের এবং এক অংশে বিশ্বসর্গের জন্য ব্রহ্মা, প্রজাপতি ও কামদেবের নিয়মন করেন। ইনি কখন গৌরবর্ণ, কখন শ্যামবর্ণ ধারণ করেন। ইনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাসনা-বিশেষে উপাস্য। কামাবিষ্ট প্রদ্যুম্ন ইঁহারই অংশ। (৪) শ্রীঅনিরুদ্ধ—ইনি স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মন করেন। স্থূল সৃষ্টি প্রভৃতির জন্য ব্রহ্মাদির আবির্ভাবন এবং স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপে ধর্ম্ম, মনু, দেব ও নৃপতিগণের নিয়মন করেন। ইনি শ্যামবর্ণ ও মনের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাস্য। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে—মনের অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন এবং অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ। ইহা পাঞ্চরাত্রিক মত। পদ্মোত্তর ৯১ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে,—ইঁহারা পরমবৈকুণ্ঠের আবরণস্থ পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে এবং প্রপঞ্চে জলাবরণস্থ বেদবতীপুরে, দ্বারকা প্রভৃতিতে বিরাজ করেন। পঞ্চরাত্রাদিতে শ্রীসঙ্কর্ষণাদিকে জীব, মন ও অহঙ্কার বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে জীবাদি নহেন, কিন্তু জীবাদির অধিষ্ঠাতৃদেবরূপেই উপাস্য—এই অভিপ্রায়ই লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ইঁহাদিগকে শ্রীবাসুদেব তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এক দীপ হইতে যেমন বহু তুল্য দীপের উৎপত্তি হয়, ইঁহারাও সেইরূপ। 'আবির্ভাব' অর্থ বুঝাইতে এখানে 'উৎপত্তি'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলেই তুল্য হইলেও শ্রীবাসুদেবেরই আধিক্য-স্বীকারে দোষ হয় না ; কারণ অংশ ও অংশীর একত্ব-বোধার্থই সকলকে তুল্য বলা হইয়াছে। ব্যূহ—অনন্ত, কেবল মুখ্যত্ব-বিচারে ব্যূহ চতুষ্টয়ের কথা আলোচিত হইল।

শ্রীব্যাসদেব পুরাণাদিতে পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়াসমূহ ও ব্যূহ সম্বন্ধেও শত শত স্থানে উল্লেখ ও বিচার করিয়াছেন। শ্রুতিরও শত শত স্থানে এ সকল প্রক্রিয়া দেখা যায়। এক বস্তুরই গুণ-গুণিস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন,—'অশেষ জ্ঞান শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ এই সকল ভগবৎ-শব্দবাচ্য।' শ্রীমহাভারতে পঞ্চরাত্রবিদ্‌গণের সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। যে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীবাসুদেব ব্যতীত অন্য দেবের পরমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা পঞ্চরাত্র নহে। মহাভারতে বলেন,—'সমগ্র পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বক্তা—স্বয়ং ভগবান্।' ইহাতে অধিক মাহাত্ম্যই সূচিত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চ্চন-নিষ্ঠ ও ভাগবতগণ ভজন-নিষ্ঠ। উভয় ধারার মধ্যে বিরোধ বা উদ্দেশ্য ভেদ নাই। পাঞ্চরাত্রিকগণ ভাগবতত্ব-লাভার্থে অর্চ্চন করেন। 'অন্যবাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম'। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥ এই 'শুদ্ধ ভক্তি' ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়। পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৮, ১৬৯।)

প্রামাণিক শাস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুরভক্তিবিনোদের অভিমত "শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আধুনিক নয়, বেদের ন্যায় নিত্য ও প্রাচীন, পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী "তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের নিতান্ত সাধন করিয়াছেন। সমস্ত নিগমশাস্ত্ররূপ কল্পবৃক্ষের চরমফল বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ পরিলক্ষিত হইয়াছেন। প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিল বেদ, তাহা হইতে ব্রহ্মসূত্র, তাহা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত উদিত হইয়াছেন। পরব্রহ্মের অচিন্ত্য-সত্যসমূহ জীব-সমাধিতে প্রতিভাত হইয়া সচ্চিদানন্দস্বর্থস্বরূপ এই পারমহংসী সংহিতা জাজ্জ্বল্যরূপে উদিত হইয়াছেন। যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা দর্শন করুন; যাঁহাদের কর্ণ আছে, তাঁহারা শ্রবণ করুন; যাঁহাদের মন আছে, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য-সকলের নিদিধ্যাসন করুন। পক্ষপাতরূপ অন্ধতা-পীড়িত পুরুষেরাই কেবল ভাগবতের মাধুর্য্যের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত আছেন। আমরা বলিতে পারি যে,—"যদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রীয় পুস্তক সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যায় এবং একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত রাখা যায়, তাহা হইলে আর্য্য-পুরুষদিগের (জীব-সাধারণেরও) কোন ক্ষতি হয় না। বহু ভাগ্যক্রমে জীবের শ্রীমদ্ভাগবতে রুচি হয়। জগতে যত প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, শ্রীমদ্ভাগবত সকলের চূড়ামণি-স্বরূপ।" (সজ্জনতোষণী)

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্বন্ধে শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—"শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইহা তৎকৃত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত', ও 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র 'সারঙ্গরঙ্গদা' টীকা পাঠে সুন্দররূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। 'শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও পরমভক্ত ছিলেন'। এই বাক্য প্রমাণ করিতে আমাদিগের চেষ্টা করার কোন আবশ্যকতা করে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থাবলীই তাহার সুন্দর প্রমাণ। অপার-মহিম কবিরাজের দয়া দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। তিনি সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন জনগণের প্রতি করুণা করিয়া কি সুন্দর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় যদি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ঐপ্রকার করুণা প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে দর্শনাদি-শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশূন্য মনুষ্যগণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদিষ্ট সনাতন-বৈষ্ণব-মত জানিতে পারিতেন না। তাঁহাদের গতি যে কি হইত, তাহাও বলা যায় না। ধন্য কবিরাজ! তুমি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়কেই ঋণী করিয়া রাখিয়াছ। তোমার গুণ আমরা একমুখে কত গান করিব? শুদ্ধ বৈষ্ণব-জগৎ তোমার গুণ সর্ব্বদাই গান করিতেছেন। কবিরাজ! তোমার সিদ্ধ-বাক্য স্মরণ করিলে কোন্ পাষণ্ড তোমার চরণ আশ্রয় করিতে না চাহে? তুমি চরিতামৃতে বলিয়াছ যে,—"যদি বা না জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ" ইত্যাদি তোমার সেই সিদ্ধ-বাক্য-গুণেই এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত (তথা-কথিত) বহু মূর্খের চরিতামৃতে উত্তম অধিকার দেখা যাইতেছে। তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম।" (সঃ তোঃ ২।১০-১১)

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

"ঠাকুর বৃন্দাবনদাস কেবল বৈষ্ণব-জগতের রত্ন ন'ন, তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের একটি অলঙ্কার-স্বরূপ।

ইংরাজী ভাষায় যেরূপ Chaucer নামক কবির সম্মান আছে, বঙ্গীয় ভাষায় ঠাকুর বৃন্দাবন দাসেরও ততোঽধিক হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঠাকুর বৃন্দাবনের পূর্ব্বে আর কেহ বঙ্গভাষায় শুদ্ধ ভক্তির পদ্য-গ্রন্থ রচনা করেন নাই। 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থ তাঁহার অমূল্য দান। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে শ্রীব্যাসদেবের অবতার, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সাধ্বী জননী সমস্ত বৈষ্ণবেরই পূজনীয়া।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত-সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন :—(সঃ তোঃ ২।২)

'ওরে মূঢ়লোক, শুন 'চৈতন্য মঙ্গল'। চৈতন্য-মহিমা যা'তে জানিবে সকল ॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন-দাস ॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল, 'চৈতন্যমঙ্গল'। যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা ॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার। লিখিয়াছেন, ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার ॥
'চৈতন্য মঙ্গল' শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন। সেই মহা-বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥
বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার। ঐছে গ্রন্থ করি' তেঁহো তারিলা সংসার ॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন। তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত-বর্ণন। যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৮।৩৩-৪২)

চৈতন্যভাগবতের পূর্ব্বে 'চৈতন্যমঙ্গল' নাম ছিল। লোচনদাস ঠাকুর নিজকৃত চৈতন্যমঙ্গল গান আরম্ভ করিলে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিজ গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করিলেন—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য ঐ ৩৩।)

গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিম্নলিখিত বাক্য পাওয়া যায় :—

শ্রুতি প্রস্থান :—উপনিষদ্—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ বেদ-শিরোমণি উপনিষদ্।

সূত্র :—ব্রহ্মসূত্র, চারি অধ্যায়, ষোলপাদ। এই দুইটী শাস্ত্রমধ্যে প্রধান। (অঃ প্রঃ ভাঃ ৭।১০৮)

"উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা—সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ ভক্তিশাস্ত্র। স্থলবিশেষে আবশ্যক-মতে ঐ সকল শাস্ত্রে 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'মুক্তি', 'ব্রহ্ম-লাভ' ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু চরম মীমাংসাস্থলে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই। (অবতরণিকা বঃ রঃ ভাঃ)

"ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই তিন বেদ সর্ব্বত্র মান্য ও অধিকস্থলে উক্ত আছে। ইহাতে বোধ হয় যে, অতি পুরাতন মন্ত্র-সকল ঐ তিন বেদরূপে সংগৃহীত হয়। কিন্তু অথর্ব্ব-বেদকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া অবহেলা করা যায় না; যেহেতু, বৃহদারণ্যককে,—অথর্ব্ববেদের কথা উল্লেখ আছে; বৃহদারণ্যককে কদাচ আধুনিক বলা যায় না; যেহেতু ব্যাসকৃত সংগ্রহ-সময়ের পূর্ব্বে উহা রচিত হইয়াছে বোধ হয়। উহাতে মন্ত্রে যে পুরাণ ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বৈদিক পুরাতন কথা—যাহা বেদে বর্ণিত আছে, তদ্বিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে।"

মীমাংসক জৈমিনি বেদকে নিত্য বলিয়া স্থাপন করিবার জন্য যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে-সমস্ত কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের উপকারার্থ কথিত হইয়াছে। জৈমিনির সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই যে, যত সত্য বিষয় আবিষ্কৃত হয়, সে-সকলই পরমেশ্বর-মূলক, অতএব নিত্য। কিকট, নৈচসক, প্রমঙ্গদ—এই সকল অনিত্য বর্ণন দেখাইয়া যাঁহারা বেদের মূল-সত্য সকলকে অনিত্য বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা সত্যকাম নহেন; ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত।" (উপক্রমণিকা কৃঃ সং)

"ঈশ, কেনাদি একাদশ তাত্ত্বিক উপনিষদ্ এবং গোপাল-তাপনী ও নৃসিংহ-তাপনী প্রভৃতি কয়েকখানি উপাসনা সহায়ক-রূপ তাপনী এবং ব্রাহ্মণ, মণ্ডল প্রভৃতি ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বান্তর্গত কাণ্ড-বিস্তারক বেদ-গ্রন্থসমূহ আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য-পরম্পরা-ক্রমে এই সকল বেদ-গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ইঁহাদিগকে সংপ্রাপ্ত প্রমাণ আপ্তবাক্য বলা যায়। (জৈবধর্ম্ম ১৩ অঃ)

ন্যায় প্রস্থান :—"ভারতবর্ষে যে সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ-নিজ মত সংস্থাপন করিয়াছেন। এমত কি, যে-সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে-সম্প্রদায় ভারতে কিছুমাত্র আচার্য্যের সম্মান লাভ করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে,—বেদান্ত-সকল উপনিষৎ-আকারে নিত্য বর্ত্তমান। উপনিষদ্বাক্যসকল সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য, এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ, তাহা সহজে বুঝা যায় না, সুতরাং বিদ্যার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ-পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদ্গুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্ত্তব্য কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদের অর্থ না জানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয়-বিভাগ-পূর্ব্বক যে সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচারমাত্র নয়, কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য্য নির্ণায়ক আর্য্য-গ্রন্থ বলিয়া ইহাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান-সংগ্রহের জন্য যাঁহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন। ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করা জীবের পক্ষে সহজ নয়, সূত্র পাঠ করিলেই যে অর্থ বোধ হয়, এরূপ নহে, সূত্রের ভাষ্য ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না। অতএব কোন সদ্গুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। এস্থলে একটি কঠিন প্রশ্ন এই,—সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায়? অথবা যথার্থ সূত্রার্থ-নির্ণায়ক সদ্গুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়? বোধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু যত্ন সহকারে শ্রীরামানুজস্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রীভাষ্য রচনা করেন, সংস্কৃত 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থে এরূপ দেখা যায়। সারদাপীঠ—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থান-বিশেষ। শঙ্করস্বামী অনেক যত্নে ঐ বোধায়ন-ভাষ্য-রচনা নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি? শঙ্করস্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার, তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরক-ভাষ্য রচনা করেন। সেই ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য বোধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন,—এরূপ জনশ্রুতি আছে।"

বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা, সূত্র সকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন, যে-যে-কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক সূত্র রচনা করিলাম, তাহা সফল হইল না। আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইবে? অতএব যে-সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, শ্রীনারদের উপদেশে তিনি তখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে। মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বোধায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটি রীতিমত ভাষ্য প্রণয়ন করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটি ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদাজ্ঞা পালনরূপ কার্য্যোদ্ধারের জন্য মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করত পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষ্য যাহাতে গোপন হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মসূত্র—চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়; দ্বিতীয়ে—সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার; তৃতীয়ে—ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন এবং

চতুর্থে—ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিষ্কামধর্ম্ম-নির্ম্মলচিত্ত সৎপ্রসঙ্গলব্ধ শ্রদ্ধালু শম-দমাদি-সম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রে অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ংবাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য; সুতরাং পরস্পর বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য-বিষয়—নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্ত-শক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষ বিনাশ-পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন। এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটী ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যারের অংশ বিশেষের নামই—'ন্যায়'; বিচার-যোগ্য বাক্যের নাম—'বিষয়'; এক-ধার্ম্মিত্বে পরস্পর-বিরোধী নানা-অর্থের বিচারের নাম—'সংশয়'; প্রতিকূল অর্থের নাম—'পূর্ব্বপক্ষ' এবং প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম—'সিদ্ধান্ত'।

সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ বৌধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করত শ্রীভাগবত অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বীয় 'শ্রীভাষ্য' জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে দিয়াছিলেন। সেই শ্রীভাষ্যে যে মধুর-রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্য শ্রীমদ্গোবিন্দদেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত সর্ব্ববেদাধ্যায়নশীল বলদেব জয়পুর প্রদেশে এই গোবিন্দভাষ্যের আবিষ্কার করেন।

অনেকেই মনে করেন,—'আমি বৈষ্ণব'; কিন্তু কি কি বিষয় জানিলে ও কি কি করিলে জীব বৈষ্ণব-পদ-বাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য-নিধি। (সজ্জন তোষণী ৮।১)

বেদান্ত-শাস্ত্রটী সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্র। (তঃ বিঃ)

উপনিষদ্ বাক্যগুলিকে 'বেদান্ত' বলা যায়। সেই বেদান্তকে সুন্দররূপে অর্থ করিবার জন্য বিষয়বিভাগক্রমে অধ্যায়-চতুষ্টয়-সংযুক্ত 'ব্রহ্মসূত্র' নামে শ্রীবেদব্যাস যে সকল সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাকেই 'বেদান্তসূত্র' বলা যায়। বিদ্বজ্জগতে বেদান্তসূত্রগুলি বিশেষ সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে,—ঐসকল বেদান্ত-সূত্রে যাহা উপদিষ্ট আছে, তাহাই যথার্থ বেদার্থ। মতাচার্য্যগণ বেদান্ত-সূত্র হইতে স্বীয় মত-পোষক সিদ্ধান্ত বাহির করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্র হইতে, 'বিবর্ত্তবাদ', উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মের পরিণতি করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না, অতএব পরিণামবাদ ভাল নয়; বিবর্ত্তবাদই ভাল। বিবর্ত্তবাদের অন্য নাম 'মায়াবাদ'। তিনি বেদমন্ত্রসকল আবশ্যকমত সংগ্রহ করত বিবর্ত্তবাদের পোষকতা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, পরিণামবাদ পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত। শ্রীশঙ্কর বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়া পরিণামবাদকে কুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিবর্ত্তবাদ একটি মতবাদ; ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'দ্বৈতবাদ' সৃষ্টি করেন। দ্বৈতবাদ-স্থাপক বেদমন্ত্রসকল সজ্জিত হইয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছে। এইরূপে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য কতকগুলি বেদমন্ত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক, 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। আবার, শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য অনেকগুলি শ্রুতি-বচন অবলম্বন পূর্ব্বক 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী কতকগুলি শ্রুতি-বচন অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই বেদান্ত-সূত্র হইতে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে যে মায়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা ভক্তিতত্ত্ব-বিরুদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয় পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচার করিয়াও তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে ভক্তিমূলক করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত শ্রুতি-বচনের সম্মান-পূর্ব্বক যেমন সার-সিদ্ধান্ত হয়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন; তাহার নাম—'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্ব। তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও তাঁহার মতের সার-মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। (জৈঃ ধঃ ১৮)

স্মৃতি-প্রস্থান (পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি):—সকল নিগমবল্লীর সারতত্ত্বরূপ কৃষ্ণনামে যেমত সকলেরই অধিকার আছে, তদ্রূপ বেদতুল্য পুরাণ-ইতিহাসে সকলেরই অধিকার থাকায় তাহাদের মাহাত্ম্যের খর্ব্বতা স্বীকার করা যায় না। যে ব্যাস বেদ-সকলকে বিভাগ করিলেন, তিনিই পুরাণ ইতিহাসের সংগ্রহকর্ত্তা; অতএব পুরাণ সকলের মাহাত্ম্য ও বেদ-তুল্যতা উপলব্ধ হয়। (ষট্ সন্দর্ভ, সঃ তোঃ ১১।১০)। ভাগবতকে "সাত্বতীশ্রুতি" বলা হইয়াছে। (ঐ ঐ)

যে-সকল গ্রন্থে শুদ্ধভক্তি উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মীমাংসা-গ্রন্থ পাঠ করা বিধেয়। অন্য মতের গ্রন্থে কেবল বৃথা তর্ক শিক্ষা হয়। (সঃ তোঃ ১১।৬)

পুরাণশাস্ত্রই বেদের যথার্থ অর্থ-প্রকাশক। উপনিষদাদি বেদে যে পরমতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, পরাশর, বেদব্যাসাদি প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বীয় স্বীয় পুরাণে তাহাই সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই সৎসম্প্রদায়ের বিশ্বাস। (তঃ মুঃ ২)।

বেদবাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ জগতে বেদবাক্য-তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য পুরাণবাক্যে বেদ-তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৬।১৪৩—১৪৮)

গীতাঃ—গীতা-শাস্ত্রে আঠারটি অধ্যায়; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম'; দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্-পৃথগ্‌রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি অত্যন্ত গূঢ়তত্ত্ব; অথচ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবনস্বরূপ এবং অর্থ-সাধক বলিয়াই ভক্তিবিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয়-অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

বিশুদ্ধ ভক্তিই গীতাশাস্ত্রে জীবের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে **"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য"** শ্লোকে ভগবৎশরণাপত্তিই যে **'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ**, ইহা পরিজ্ঞাত হইবে।

অর্জ্জুনের যুদ্ধাঙ্গীকার—কেবল অধিকার নিষ্ঠারই উদাহরণ মাত্র, গীতার চরম তাৎপর্য্য নয়। গীতার গূঢ়-তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি যে-স্বভাব-সম্পন্ন, তদনুযায়ীই তাহার অধিকার। সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট জীবন-যাত্রোপযোগি-কর্ম্ম স্বীকার করত পরতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্ত্তব্য; তাহাতেই শ্রেয় নিহিত। ('অবতরণিকা' গীঃ রঃ রঃ ভাঃ)

গীতাশাস্ত্রই সর্ব্বশাস্ত্রের পরিপাক-গ্রন্থ। যিনি গীতাশাস্ত্রের অমৃতময় উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার পক্ষে অন্য শাস্ত্রের ভার বহন করার অন্য নাম—শাস্ত্র-গর্দ্দভতা মাত্র। (সঃ তোঃ ১২।২)

দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার যে-সমস্ত টীকা বা বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকলগুলিই অভেদ-ব্রহ্মবাদীদিগের রচিত; বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি-সম্মত টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশিত নাই। শঙ্কর-ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা সম্পূর্ণ অভেদ-ব্রহ্মবাদপূর্ণ। শ্রীধরস্বামীর টীকা ব্রহ্মবাদপূর্ণ না হইলেও, তাহাতে সাম্প্রদায়িক শুদ্ধাদ্বৈতবাদের গন্ধ আছে। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর টীকাটী যেরূপ ভক্তি-পোষক বাক্যে পূর্ণ, চরম উপদেশ-স্থলে সেরূপ কল্যাণপ্রদ নয়। শ্রীরামানুজ স্বামীর ভাষ্যটী সম্পূর্ণ ভক্তিসম্মত বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-শিক্ষাপূর্ণ গীতাভাষ্যরূপে কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির আস্বাদক-দিগের আনন্দবৃদ্ধি হয় না। এতন্নিবন্ধন আমরা যত্নসহকারে শ্রীগৌরাঙ্গানুগত মহামহোপাধ্যায় ভক্তশিরোমণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিরচিত টীকাটী সংগ্রহপূর্ব্বক তদনুযায়ী 'রসিকরঞ্জন' নামক বঙ্গানুবাদ সহকারে গীতাশাস্ত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্মত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত একটী গীতা-ভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটী বিচার পর, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকাটী বিচার ও প্রীতিরস, এতদুভয় বিষয়ই পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাটী সর্ব্বদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিচার সরল এবং সংস্কৃত ভাষা প্রাঞ্জল। (গীঃ রঃ রঃ ভাঃ)

ঋষিগণ কোন সময়ে সমস্ত বেদকে একদিকে ও শ্রীমহাভারতকে একদিকে দিয়া তৌল করিলে শ্রীমহাভারত অধিক গুরুভারক্রমে নত হইয়া পড়েন। ইহাতে জ্ঞাতব্য এই যে, মহাভারতের তুল্য আর্য্যদিগের পূজনীয় ধর্ম্মগ্রন্থ আর নাই। সেই মহাভারতের মধ্যে দুইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন আছে। একটি 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও অপরটি 'শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম'। তত্ত্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ উক্ত দুই গ্রন্থ হইতে নিজ-মত সমর্থন করিতে না পারিলে সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকতা স্থাপন করিতে পারেন না। এতন্নিবন্ধন শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সমুদয় আচার্য্য নিজ নিজ

মতে বেদ-ভাষ্য, বেদান্ত-সূত্রভাষ্য, গীতা-ভাষ্য ও সহস্রনাম-ভাষ্য প্রস্তুত করত প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুই বেদান্তাচার্য্য। অতএব তৎকৃত 'সহস্রনাম-ভাষ্য' সর্ব্বাদৌ প্রকাশ করিলাম। 'বোধন' বিঃ সঃ নাঃ)

পূর্ব্ব মহাজনদিগের রচনা অপেক্ষা কিছুই আমাদের নিকট মধুর বলিয়া বোধ হয় না। আহা! ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু অপেক্ষা একখানি অধিক শিক্ষাপূর্ণ রসগ্রন্থ আর কে লিখিতে পারে? ধন্য শ্রীরূপগোস্বামী! ধন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী! তাঁহাদের রচনা অপেক্ষা মধুর ও তত্ত্বপূর্ণ রচনা আমরা দেখিতে পাই না। হে পাঠকবর্গ! প্রতিদিন শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীভাগবতামৃত-গ্রন্থের রস আস্বাদন করুন। (—'নিবেদন' সঃ তোঃ ১০।৬)

'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের মর্ম্ম অতি গূঢ়। শ্রীকৃষ্ণলীলা সর্ব্বত্র অপ্রাকৃত। প্রপঞ্চগত হইলেও ইহাতে প্রপঞ্চ-গন্ধমাত্র নাই। জীবের মঙ্গলের জন্যই এই অতি-পবিত্র রস-লীলা সর্ব্বোর্দ্ধ গোলোক হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহাশক্তিক্রমে জড়জগতে ব্রজের সহিত অবতারিত হইয়াছেন। মানবের জড়শরীরে যে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ দেখা যায়, সে অতি ঘৃণ্য। চিৎশরীরে জীবের যে গোপীদেহ-প্রাপ্তি ও কৃষ্ণ-সঙ্গ-লাভ, তাহা প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের অতীত। (সঃ তোঃ ১০।৬)

ষট্সন্দর্ভ :—কলিযুগপাবন স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচর বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা-পূজিত শ্রীরূপ-সনাতনের অনুশাসন অনুসারে শ্রীজীবগোস্বামী এই শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করা আমাদের সাধ্যাতীত। এই গ্রন্থ ছয়-অংশে বিভক্ত। তত্ত্বসন্দর্ভ—প্রথমাংশ, ভগবৎ-সন্দর্ভ—দ্বিতীয়াংশ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ—তৃতীয়াংশ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—চতুর্থাংশ, ভক্তি-সন্দর্ভ—পঞ্চমাংশ এবং প্রীতি-সন্দর্ভ—ষষ্ঠাংশ। শ্রীমদ্ভাগবতী-সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়; তৎকৃত গোপালচম্পূ গ্রন্থও অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণলীলাত্মক গ্রন্থ। —ষট্সন্দর্ভ (সঃ তোঃ ১১।১০)

"শ্রীগীতগোবিন্দ" সর্ব্বত্র পরব্রহ্মের লীলা প্রতিপাদক অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রসময় কাব্য-বিশেষ। জগতে এরূপ কাব্য-গ্রন্থ আর নাই। সাধারণ সমালোচকগণ প্রাকৃত রস ব্যতীত শৃঙ্গারের অনুভব করিতে পারেন না বলিয় তাঁহাদের শ্রীগীতগোবিন্দের সমালোচনা কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। জয়দেব-কবি সেই সকল সমালোচককে তাঁহার নিজ-গ্রন্থ সমালোচনার জন্য অর্পণ করেন নাই, বরং তাঁহাদিগকে এ গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাঁহারা অপ্রাকৃত ব্রজরসে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে জয়দেবের সম্বন্ধে কথা কহা নির্লজ্জতার পরিচয়-মাত্র (সঃ তোঃ ৭।২)

'প্রেমতরঙ্গিনী' :—শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য-কৃত সংস্কৃত 'প্রেমতরঙ্গিণী'-নাম্নী পুস্তিকা অতিশয় দুর্লভ। কবি কর্ণপূর-রচিত **'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক'** শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রামাণিক অপূর্ব্ব-লীলাগ্রন্থ। (সঃ তোঃ ৯।১১)

শুদ্ধভক্তগণ মহাজনকৃত ভক্তিগ্রন্থগুলিকে মধুচক্র বলিয়া জানেন। সেই সকল মধুচক্র যতপ্রকার নূতন নূতনভাবে নিকটবর্ত্তী হয়, ততই নূতন নূতন রসের উদয় হয়। (সঃ তোঃ ১০।৫)

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ভালরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতই সর্ব্বশাস্ত্রের সার। চারিবেদ ও বেদান্তশাস্ত্রে যে গভীর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সারভাগ, অষ্টাদশ পুরাণ, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়্দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে যে-সকল কল্যাণকর সদুপদেশ আছে এবং বিদেশীয় ধর্ম্ম শিক্ষায় ও স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মসমূহে যে কিছু সদ্বস্তু আছে, সে সমস্তই এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় কোন শাস্ত্রে যাহা পাওয়া যাইবে না, তাহাও এই উপাদেয় গ্রন্থে লভ্য হইবে। (চৈঃ শিঃ)

'শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা' গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে রচিত হইয়াছে। ('উপসংহার' শ্রী ভাঃ মঃ)

চিদাত্মার বিমলানন্দবিলাস-বর্ণনে আমার সরস্বতী অশক্তা; যেহেতু যে-বাক্যসকলের দ্বারা আমি তাহা বর্ণন করিব, ঐ বাক্য সকল জড় হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। যদিও বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বর্ণন করিতে অশক্ত

হইয়াছি, তথাপি সারজুট্ বৃত্তিদ্বারা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবদ্বার্ত্তা যথাসাধ্য বর্ণন করিলাম। বাক্য-সকলের সামান্য অর্থ করিতে গেলে বর্ণিত বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধি হইবে না, এতদ্ধেতুক প্রার্থনা করি যে, পাঠকবৃন্দ সমাধি অবলম্বন-পূর্ব্বক এতত্তত্ত্বের উপলব্ধি করিবেন। অরুন্ধতী-সন্দর্শন-প্রায় স্থূলবাক্য হইতে তৎসন্নিকৃষ্ট সূক্ষ্মতত্ত্বের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য; যুক্তি-প্রবৃত্তি ইহাতে অক্ষম; যেহেতু অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহার গতি নাই। কিন্তু আত্মার সাক্ষাদ্দর্শনরূপ আর একটী সূক্ষ্মবৃত্তি 'সহজ সমাধি' নামে লক্ষিত হয়; আমি যেমত সেই বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক বর্ণন করিলাম, পাঠকবৃন্দও সেইরূপ তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক তত্ত্বোপলব্ধি করিবেন। (কৃঃ সং ১।৩২।৩৩)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা:—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বনির্দ্দেশে কৃপা যস্য প্রয়োজনম্। বন্দে তং জ্ঞানদং কৃষ্ণচৈতন্যং রসবিগ্রহম্॥ সমুদ্রশোষণং রেণোর্যথা ন ঘটতে ক্বচিৎ। তথা মে তত্ত্বনির্দ্দেশোমূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ॥ কিন্তু মে হৃদয়ে কোঽপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ। স্ফুরন্ সমাদিশৎকার্য্যমেতত্তত্ত্বনিরূপণম্॥ (কৃঃ সং ১ম অঃ ১৩)

যে-সকল সংবাদপত্র প্রতিদিন নূতন কথা লিখিয়া পাঠকগণের সুখ বিধান করেন, তাঁহারা জড়-বিষয়ে বিচিত্র নূতন-কথা বলিতে পারেন; হরিকথা সেরূপ নয়। হরিকথা কখনই পুরাতন হয় না। যতবার বলা যায় বা শুনা যায়, ততই রসের উদয় হয়। হে পাঠকবর্গ! যদি হরিকথায় রতি থাকে, তবে মহাজনগণের বর্ণনা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করুন। এই পত্রিকার (সজ্জন তোষণীর) আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে প্রতি-সংখ্যায় পূর্ব্ব-মহাজন-কৃত ভক্তিরস-বর্ণন ও সিদ্ধান্ত এক-এক ফর্ম্মায় প্রকাশ করা উচিত বোধ করি। খোসগল্প যে-স্থলে নাই, সে-স্থলে পরমার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের পূর্ব্ব রচনা কিছু কিছু থাকা আবশ্যক। এই সংসার খোসগল্পময়, ইহার মধ্যে শ্রীসজ্জন তোষণীর যে হরিভক্তিতত্ত্ব ও লীলা-বর্ণন স্বল্পাক্ষরে পাওয়া যায়, তাহার আস্বাদনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমাদের নিজ রচনা অপেক্ষা পূর্ব্ব সাধুদিগের রচনা এবিষয়ে অধিক আদৃত হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? আর এক কথা এই—যাঁহারা কেবল কিছু রচনা পড়িলেই সুখ-পা'ন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বসাধুদিগের ভক্তিপূর্ণ-রচনা পড়া আবশ্যক। ক্রমে ক্রমে সেই সকল গ্রন্থের রস প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে সুখবৃদ্ধি করিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের নিজ-রচনা বা নবীন প্রণালীর রচনা ভাল লাগে, কিন্তু যখন আমরা গাঢ়রূপে পূর্ব্ব-মহাজন-দিগের রচনার রসে প্রবেশ করি, তখন আমাদের নবীন রচনা ভাল লাগে না। ইহার মূল-তাৎপর্য্য এই যে —'আমরা মনে করি, আমরা পূর্ব্বমহাজনগণ অপেক্ষা ভাল রচনা করিতে পারি'; কিন্তু এই ভ্রমটি যখন দূর হয়, তখন আর নবীন রচনা ভাল লাগে না। **মহৎ লোক ও কবি সর্ব্বদা জগতে আসেন না।** তাঁহারা বিরল, সুতরাং শ্রীজয়দেব-রূপাদির পর আর ভাল কবি দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার যখন শ্রীকৃষ্ণের কোন কৃপা-পাত্র জগতে আবির্ভূত হইবেন, তখনই আমরা শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় অন্যান্য গ্রন্থ দেখিতে পাইব। বর্ত্তমান কবিদিগের কাব্যে বা রচনায় সুখবোধ করা কেবল 'দুগ্ধাভাবে ঘোলে দুগ্ধের স্বাদ পাইয়াছি,' মনে করা মাত্র। (সঃ তোঃ ১০।৫)

আজকাল লোকেরা উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন। উপন্যাসের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ডোজে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। কেন না, বিষয়ীদিগের চিত্তে স্বল্প পরিমাণ তত্ত্বকথা প্রবেশ করিতে করিতে চিত্তকে ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত করিতে পারে। ('সমালোচনা' সঃ তোঃ ১০।১২)

"অমৃতরসাবলী"—গ্রন্থখানি আবার সহজিয়া-পুঁথি। ইহাতে লেখা আছে—'সহজ কাহাকে বলে বুঝিতে নারিল। সহজ না জন্মিলে জন্ম অসার্থক হইল।" এই প্রকার পুস্তিকা বাউল ও সহজিয়াদিগের নিকট অনেক আছে। আমরা কোনও সময় পুস্তক অন্বেষণ করিতে গিয়া এইরূপ অনেকগুলি পুস্তক পাইয়াছিলাম। পড়িতে পড়িতে ঘৃণা হইল। গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া পবিত্র হইলাম।—('সমালোচনা' সঃ তোঃ ১০।১২)

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী ভক্তগণের সদ্ধর্ম্মরক্ষার্থ এই **সৎক্রিয়াসারদীপিকা-পদ্ধতি** রচনা করিলেন। বৈদিকানুশাসনক্রমে অনিরুদ্ধভট্ট, ভীমভট্ট ও শ্রীমদ্গোবিন্দানন্দ ভট্টাদি কর্ম্মিগণের জন্য পদ্ধতিসমূহ রচনা

করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণ ভট্ট কর্ম্মিগণের এবং শ্রীভবদেব ভট্ট বেদানুষ্ঠাতৃগণের জন্য পদ্ধতি সমূহ রচনা করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমান্তর্গত ও অন্ত্যজ-বর্ণোৎপন্ন গোবিন্দ-ভক্তগণের জন্য বেদ, পুরাণ ও মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সপ্রমাণ বাক্য দ্বারা সেবা ও নামাপরাধ বিচার-পূর্ব্বক পিতৃদেবার্চ্চন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া এই সৎক্রিয়া-সারদীপিকা-পদ্ধতি রচিত হইল। (সঃ সাঃ দী ; বঙ্গানুবাদ)

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি মহদাবির্ভাবিত দোষচতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত বলিয়া প্রামাণ্য স্বীকার্য্য :—

শ্রুতি :—দশোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর, কৃষ্ণোপনিষৎ, চৈতন্যোপনিষৎ, কলিসন্তরণোপনিষৎ, গোপালতাপনী, চতুর্ব্বেদ-সংহিতা, অরণ্যসমূহ, ব্রাহ্মণসমূহ, তাপনীসমূহ, উপনিষৎসমূহ।

বেদান্ত :—গোবিন্দভাষ্য, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, শ্রীভাষ্য, পারিজাতভাষ্য (নিম্বার্ক), অনুভাষ্য (বল্লভ), রামানুজীয় বেদান্ত-তত্ত্বসার ; বেদান্তস্যমন্তক, সিদ্ধান্তরত্ন, (বলদেব) ; গীতা (রামানুজ, মধ্ব, বলদেব, চক্রবর্ত্তীভাষ্য), আম্নায়সূত্র (সভাষ্য) ও তত্ত্ববিবেক। বেদান্তসার (সদানন্দ), সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, শারীরকভাষ্য ও দশোপনিষদ্-ভাষ্য, পঞ্চদশী ও অপরোক্ষানুভূতি, বেদার্থ সংগ্রহ (রামানুজ), তত্ত্বসূত্র ও যুক্তিমল্লিকা।

ভাগবত :—শ্রীমদ্ভাগবত, ভাগবত-সন্দর্ভ (শ্রীজীব), বৃহদ্ভাগবতামৃত (শ্রীসনাতন)' লঘুভাগবতামৃত (শ্রীরূপ), সর্ব্ব-সংবাদিনী (শ্রীজীব), ভাগবত-তাৎপর্য্য (শ্রীমধ্ব), মন্ত্রভাগবত, ব্রহ্মসূত্র, সিদ্ধান্তদর্পণ (বলদেব)।

একায়ণ পঞ্চরাত্র :— নারদ পঞ্চরাত্র, হরিভক্তিবিলাস, সৎক্রিয়াসারদীপিকা, হারীত-সংহিতা, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, নৃসিংহ-পরিচর্য্যা ; বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র, সাত্বতপুরাণষ্টক্ ; সাত্ত্বিক তন্ত্র-সমূহ, রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, পঞ্চাঙ্গ ও কাল, সদাচারস্মৃতি, কৃষ্ণামৃত মহার্ণব, স্মৃতার্থ-সাগর, স্মৃতি-মুক্তাবলী, আগম-প্রামাণ্য।

সাহিত্য :—কাব —গোবিন্দলীলামৃত, চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণভাবনামৃত, চৈতন্যচন্দ্রামৃত, গোপালচম্পূ, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, সাহিত্য-দর্পণ, চৈতন্যভাগবত, নৃসিংহচম্পূ।

অলঙ্কার :—অলঙ্কারকৌস্তুভ, নাটকচন্দ্রিকা; চন্দ্রালোক।

নাটক :—চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ললিতমাধব, বিদগ্ধ মাধব, জগন্নাথবল্লভ নাটক।

ব্যাকরণ :—হরিনামামৃত ব্যাকরণ (শ্রীজীব)।

ছন্দ :—ছন্দোমঞ্জরী।

গীতি :—জয়দেব, পদকল্পতরু, জগন্নাথবল্লভ, চৈতন্যমঙ্গল, শরণাগতি,- কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, গীতমালা ইত্যাদি। প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

ঐতিহ্য :—মহাভারত, রামায়ণ, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ, ভক্তিরত্নাকর।

সিদ্ধান্ত, লীলা, সাহিত্য ও দর্শন :—স্তবমালা, স্তবাবলী, মধ্ববিজয়, প্রপন্নামৃত, ভক্তমাল (নাভাদাস হিন্দী), মঞ্জুষা-সমাহৃতি, গৌড়ীয়, সজ্জনতোষনী, গৌড়ীয় কণ্ঠহার, নদীয়াপ্রকাশ, হারমোনিষ্ট, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য-সিদ্ধান্ত, আচার ও আচার্য্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জলনীলমণি, স্তবামৃতলহরী, ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চমাধ্যায়, কৃষ্ণকর্ণামৃত, পদ্যাবলী, মাধুর্য্যকাদম্বিনী, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, পদাবলী, ভজনামৃত, জৈবধর্ম্ম, চৈতন্যশিক্ষামৃত, মুকুন্দমালা (কুলশেখর), স্তোত্ররত্ন (আলবন্দার), হরিভক্তিকল্পলতিকা, নিম্বার্ক-দশশ্লোকী, ষোড়শগ্রন্থ, সাধনপথ, ভজন-রহস্য, কিরণ-বিন্দু-কণা, অর্থপঞ্চক, মায়াবাদশতদূষনী, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ইত্যাদি।

ভাগবতার্কমরীচিমালা, মহাপ্রভুর শিক্ষা, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম (চক্রবর্ত্তী), গোপীগীতা, ভ্রমরগীতা, রাধারসসুধা-নিধি, মহাজন পদাবলী ইত্যাদি।

মহদাবির্ভাবিত কোন বাক্যই প্রাকৃত নহে। প্রাকৃত ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য মায়াকৃত নানাপ্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা চারিপ্রকার লেখপ্রণালী দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাহা ব্রাহ্মী, খরোষ্টি, সান্কি ও পুষ্করসাদী (Scrept) লেখ প্রণালী।

ব্রাহ্মী:—বাংলা হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরাজী ইত্যাদি। খরোষ্টি:—আরবি, উর্দ্দু ইত্যাদি ভাষা।
সান্কি :—চীনাভাষা, মার্শম্যাসের পাজি, জ্যোতিষ ও টেবিলের From এ লেখ।
পুষ্করাসাদী :—অঙ্কন প্রণালী বা চিত্রাদি।

মহদাবির্ভাবিত ও মহন্মুখরিত অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম অপ্রাকৃত বাস্তববস্তুকে প্রকাশ করিবার জন্য অপ্রাকৃত শক্তি-সমন্বিত, মায়িক-কুণ্ঠাদিধর্ম্ম নির্ম্মুক্ত বস্তুসত্তা হইতে অভিন্ন। কিন্তু প্রাকৃতশব্দ ও লেখপ্রণালীর ন্যায় বাহ্যত: অনুভূত হইলেও তাহা পূর্ণভাবে অপ্রাকৃত বস্তু ও ভাবকে প্রকাশ করে। **জড়ৈকসর্ব্বস্ববাদীর দৃষ্টিশক্তিতে জড়ীয় জ্ঞানাবরণ (চসমা) থাকায় উহা প্রাকৃতের ন্যায়ই অনুভূত হয়।** কিন্তু তাহা কখনই প্রাকৃত নহে। কখনও কখনও সেই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম সাধুমুখরিত ও কৃপোদ্ভাসিত হইয়া 'জারন শক্তিহীন লৌহের উপর অগ্নিশক্তি প্রবিষ্ট হইয়া তাদাত্ম্য ভাব-সম্পন্ন লৌহ যেমন অগ্নিশক্তি ধারণ করে' তদ্রূপ সেই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম প্রাকৃত ভাব, ভাষা, দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার উপর আবিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত শক্তির কার্য্য প্রকাশ করে। তাহা তখন আর প্রাকৃত ভাব-দ্যোতক না হইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্ব ও ভাবকেই প্রকাশ করে। তখন উক্ত ভাব, ভাষা, দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াদি আর প্রাকৃত থাকে না। অপ্রাকৃত সাধু ও শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত প্রাকৃত দেশ, কাল, জাতি, ক্রিয়া ও গুণের যে উপমা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কখনই প্রাকৃত নহে। তাহা অপ্রাকৃত রাজ্যস্থ ভাব ও দ্রব্যাদির উপমাই দেখান হইয়াছে। তাহা অপ্রাকৃত ভাবের দ্বারা বিভাবিত করিয়া সেই অপ্রাকৃত বস্তু ও ভাবের হৃদয়াঙ্গমার্থে কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিয়া জীব হৃদয়ে অপ্রাকৃত ভাবেরই উদ্দীপক, দ্যোতক ও প্রকাশক হইয়া অপ্রাকৃত শক্তিই কার্য্যকরী হয়। কারণ "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" কোন প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রকাশ বা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। বেদ পরোক্ষবাদ। আপাত দৃষ্টিতে বদ্ধজীব সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করিয়া প্রাকৃত বিদ্যাবুদ্ধি ও যোগ্যতার সম্বল লইয়া অপ্রাকৃত অপৌরুষেয় বাঙ্ময় বেদ আশ্রয় করিয়াও জড় কর্ম্মি-জ্ঞানী হইয়া পড়েন। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতেকথিতাহর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিলে অপ্রাকৃত শক্তির কৃপালাভ ব্যতীত প্রাকৃত বদ্ধজীবের অপ্রাকৃত তত্ত্বে প্রবেশাধিকার হয় না। এজন্য "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্যকর সঙ্গ। তবে ত বুঝিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। বিষ্ণু নিন্দা নহে আর ইহার উপর" ॥ "জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। (গীতা ৪।৯) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, শ্রীমূর্ত্তি, ধ্যান, ভক্তি ও প্রেম সকলই অপ্রাকৃত, উহা কখনই প্রাকৃত নহে। ভক্তগণের শ্রীঅঙ্গ, নাম, গুণ, সেবা ও আচরণাদিও প্রাকৃত নহে। অতএব কোন প্রাকৃত ভাব ও ভাষাদ্বারা তাহা কখনই প্রকাশ করিতে পারা যায় না। প্রকাশ করিতে গেলে তাহা মহানিন্দায় পর্য্যবসিত হয়। তাহা অপরাধের অন্তর্গত। অতএব তাহা ভক্তিবিরোধী ও ভক্তিবাধক। অপরাধের দ্বারা কখনও কৃপালাভ বা বস্তুসত্তার জ্ঞান লাভ হয় না। **এসম্বন্ধে জড়ৈক সর্ব্বস্ববাদী বহির্ম্মুখ পতিত জীবের একমাত্র অপ্রাকৃত শক্তি সমন্বিত শ্রীগুরুকৃপা ও সাধুসঙ্গই একমাত্র অবলম্বন।** তাঁহারা শরণাগত **জনকে নিজকৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিয়া অপ্রাকৃতশক্তি ও ভাবে তাদাত্ম্যসম্পন্ন করিয়া সেই অকৃপ্রাত** তত্ত্বে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। জীবের প্রাকৃত জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা ও কৃতিত্বের অভিমান ও অভিনিবেশ অপ্রাকৃততত্ত্বে প্রবেশের সহায়ক যে শরণাগতি, তাহার বাধকরূপে পতিত করায়। অতএব উক্ত অভিমান ও অভিনিবেশ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন কৃপাম্বুধি প্রকৃত সাধুগুরুর দৃঢ়ভাবে শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অন্যপন্থা অবলম্বন করিলে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া অনন্তকাল মায়ার দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মহাকষ্ট পাইতে হইবে। সেই প্রকৃত সাধুগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ও ভগবৎ কৃপালাভ ও পরম-স্বতন্ত্র ভাগবতের অহৈতুকী কৃপারূপ ভাগ্যই লক্ষিতব্য।

পূর্ব্বোক্ত মহাদাবির্ভাবিত প্রমাণ-শাস্ত্র সমূহ আবার মহন্মুখরিত হইলে মহাফল প্রদানে সমর্থ হয়। শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির অনুগত ও শিক্ষায় শিক্ষিত শুদ্ধভক্তগণ তাঁহার উপদেশাবলী বহুবিধ গ্রন্থে সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। গোস্বামিবর্গ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীলসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভৃতি গৌরপার্ষদগণ, এ জগতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত লেখনী ও ভাষণাদির দ্বারা মহামূল্যনিধি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। সেইগুলি অজ্ঞানান্ধ জীবের মহোজ্জল আলোকস্তম্ভরূপে বিরাজিত।

এই পর্য্যন্ত বলিতেই সন্ধ্যারত্রিকের সময় হওয়ায় সকলে শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারত্রিকে যোগদান করিলেন। যুবক চতুষ্টয়ও তাঁহাদের সহিত আরত্রিক দর্শনান্তে সকলকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া বাসায় ফিরিলেন। পথে বিচার করিলেন, ইহাঁরা নিশ্চয়ই প্রভু গৌরহরির অনুগত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। ইহাদের কণ্ঠে তুলসী মালিকা, শিখা, যজ্ঞসূত্র ও দ্বাদশাঙ্গে তিলক সুশোভিত! এ প্রকার শাস্ত্রের সুমীমাংসা অন্য সম্প্রদায়ে শুনা যায় না। যাহা হউক শুভক্ষণেই আমরা এখানে আসিয়া এই সুদুর্ল্লভ সঙ্গলাভ করিলাম।

সম্প্রদায়নির্ণয় নামক দ্বিতীয় প্রকাশ

'পরদিন শ্রীনবদ্বীপধামবাসী যুবকচতুষ্টয় একটু তাড়াতাড়ি প্রসাদ পাইয়া সেই সন্ন্যাসী সমাজে গিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া বসিলেন। সন্ন্যাসীগণও প্রসাদ পাইয়া ইষ্টগোষ্টি করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছেন; এমনিসময় যুবকগণকে উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে আদর করিয়া বসাইলেন। যুবকগণের মধ্যে শ্রীমধুসূদনদাস প্রশ্ন করিলেন:—"মহাজন কাহারা? সম্প্রদায় কি? এবং জগতে কতগুলি শুদ্ধ সম্প্রদায় জগৎ মঙ্গলকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া জীব উদ্ধার করিয়াছেন এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্য কৃপাপূর্ব্বক বর্নন করিতে প্রার্থনা।"

সকলে বিচার করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে-পারঙ্গত পণ্ডিতপ্রবর এবং শুদ্ধভক্ত শ্রীপ্রদ্যুম্নপুরীপাদকে এ বিষয়ে উত্তর দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গপদে প্রনত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

শাস্ত্রে আমরা দ্বাদশজন মুলমহাজনের সংবাদ পাই।

স্বয়ম্ভুর্নারদঃশম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্"

স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, দেবহূতিপুত্র কপিল; মনু, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি, প্রহ্লাদ, যম এই দ্বাদশ মহাজন।

ইহাদের সুষ্ঠু অনুগত সম্প্রদায় ও গুরুপরম্পরাক্রমে এ জগতে মহাজনের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অপ্রাকৃত মন্ত্র-নামশক্তি যাঁহারদ্বারা জগতে পূর্ণ অবিকৃত শুদ্ধ ভাবের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া জীবপ্রতি সেই মহাশক্তি সম্যকভাবে প্রদত্ত হয়, তাহাই এ জগতে সম্প্রদায় নামে অভিহিত। কলিতে চারিটি সম্প্রদায়ে সেই অপ্রাকৃত শক্তি জগতে প্রকাশিত আছে।

১। শ্রী বা লক্ষ্মী—এই সম্প্রদায়ের কলিতে আচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্য।
২। ব্রহ্ম সম্প্রদায়—অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে কলিতে আচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্য।
৩। রুদ্রসম্প্রদায়—কলিতে আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী।
৪। সনকসম্প্রদায়—কলিতে আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য!

শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব; শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য এই চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য। আরও যত বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াছেন, সকলেই এই চারি আচার্য্যের মধ্যে কোন না কোন আচার্য্যের অনুগত। "রামানুজবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, মধ্ব—শুদ্ধ দ্বৈতবাদী, বিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং নিম্বাদিত্য—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।"

তন্মধ্যে সর্ব্ব-অবতার-অবতরী স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মমাধ্ব সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া চারিসম্প্রদায়ের চতুর্ব্বিধ মতবাদকে সুষ্ঠুভাবে শুদ্ধ ও পূর্ণ করিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্ব্বক অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বল রসসমন্বিত ভক্তি প্রদান করিয়াছেন। সেই ধারা বর্ত্তমান জগতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়রূপে প্রকাশিত আছেন।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত অন্য তিন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিতেছেন; কিন্তু শ্রীমনমহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ধারাই বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ প্রেম প্রদানে সমর্থ। উক্ত সম্প্রদায়ে সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধারা শুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করিয়া আচার্য্যগণ আজিও সেই গুরুপ্রণালী পৃথিবীর মহা সম্পত্তিরস্বরূপে প্রকটিত আছেন সেই ধারা আমরা শাস্ত্রে এই প্রকার দেখিতে পাই।

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্ত-ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীঈশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥
মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ।
রূপসনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামিপ্রবরৌ প্রভূ॥
শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজ-শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভুর্মতঃ॥
তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীলঃ সেবাপরো নরোত্তমঃ।
তদনুগতভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ॥
তদ্দাসকশ্চ গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্যভূষণম্।
বিদ্যাভূষণপাদশ্রীবলদেবসদাশ্রয়ঃ॥
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথ প্রভুস্তথা।
শ্রীমায়াপুরধামস্ত নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ॥
শুদ্ধভক্তি প্রচারস্যমূলীভূত ইহোত্তমঃ;
শ্রীভক্তিবিনোদো দেব স্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ॥
তদভিন্নসুহৃদ্বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ॥
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্॥
মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্মবিকাশকঃ॥

দেবোঽসৌ পরমোহংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে।
প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ ॥
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়ঃ ॥
সর্ব্বে তে গৌরবংশ্যাশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্টগ্রহাগ্রহাঃ ॥

"ধারা বা সম্প্রদায় ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, ইহাকে গুরু-প্রণালী বলিয়াও উক্ত হইয়াছে আদিকাল হইতে সাধুগণ মধ্যে সৎসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পারম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অন্বয়ব্যাখ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা কলির গুপ্তচর।" (জৈঃধঃ ১৩ ও মঃ শিঃ ২য় পঃ)

সম-প্র-'দা' ধাতু কর্ম্মবাচ্যে যঞ্ (য-আগম) প্রত্যয় করিয়া 'সম্প্রদায়'-শব্দ নিষ্পন্ন। ভরত বলেন—'গুরুপরম্পরাগত-সদুপদেশঃ শিষ্টপরম্পরাবতীর্ণোপদেশঃ সম্প্রদায়ঃ।' অমরকোষে 'সম্প্রদায়' ও 'আম্নায়' এক-পর্য্যায় শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিচরণ—'সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বপর্য্যানুসারতঃ' প্রভৃতি বাক্যে সৎসম্প্রদায়-প্রণালীর তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন।

আদিগুরু ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত 'ব্রহ্মবিদ্যা' নাম্নী শ্রুতিই 'আম্নায়'। সেই আম্নায়বাক্য বা শিষ্যপরম্পরাবতীর্ণ উপদেশ একমাত্র সৎ-সম্প্রদায়েই লভ্য। "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম। (মুণ্ডক ১।১।১, ১।২।১৩) প্রভৃতি বাক্যে এইরূপ গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ বা সৎসম্প্রদায়ের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। উদ্ধবগীতায় ভগবান্ ব্রহ্মসম্প্রদায়-কথা এইরূপভাবে বলিয়াছেন—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদ সংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা যস্যাং ধর্ম্মো মদাত্মকঃ ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা। ইত্যাদি।
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
* * *
এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে ॥" (ভাঃ ১১।১৪।৩-৮)

পুনরায় শ্রীধরস্বামী ভবার্থ-দীপিকায় (ভাঃ ১২।১৩।১৯) "শ্রীভাগবত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে ভগবদ্ধ্যান লক্ষণং মঙ্গলমাচরতি,—কস্মৈ ব্রহ্মণে"

"ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' নামক একটি সম্পদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম 'আম্নায়' (আ—ম্না+যঞ্)। সে সকল লোক—"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ" ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদুক্ত "পাষণ্ডমত-প্রচারক" তত্ত্বসন্দর্ভে। (১০ম সংখ্যা) শ্রীলজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন'—"অনাদিসিদ্ধ-সর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিক-জ্ঞাননিদানত্বাদপ্রকৃত-বচন-লক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীত-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্ ॥"

অর্থাৎ "অনাদিসিদ্ধ পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত সর্ব্বলৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের নিদানস্বরূপ অপ্রাকৃত-বচন-লক্ষণ বেদ-বাক্যই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্যস্বভাবসম্পন্ন বস্তু-বিজ্ঞানেচ্ছু পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ।"

শ্রীল জীবগোস্বামী যে লক্ষণ-দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই লক্ষণ-দ্বারা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও তৎসহ শুকদেব ও ক্রমে বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মণ্যতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির তত্ত্বগুরু—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপ্রমিত শাস্ত্র-নিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসদিগের গুরুপ্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বকৃত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীল বিদ্যাভূষণপ্রভুও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন।

"নিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতমত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্য-বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায়স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ববৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক সমতার অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক ভেদে সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্য-বিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর "শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, তদীয়সর্ব্বস্বত্ব" এবং শ্রীনিম্বার্কের 'চিন্তাদ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটিমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—'শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়'। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্মসম্প্রদায়েই পর্য্যবসান লাভ করিবে" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মঃ শিঃ)

পূর্ব্বাপর সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় যে বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুদাসগণের দ্বারাই সর্ব্বকালে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। যদিও সনাতন-ধর্ম্মের মূল সনাতন পুরুষ শ্রীভগবান্—ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্‌ভগবৎপ্রণীতং" (ভাঃ ৬।৩।১৯) "ধর্ম্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষান্নারায়ণাৎ" (মঃ ভাঃ শান্তি—৩৪৮।৫৪) প্রভৃতি বাক্যে "শ্রীসনাতনধর্ম্ম" শ্রীভগবানেরই প্রণীত বলিয়া কথিত হইয়াছে, তথাপি 'অকর্ত্তা চৈব কর্ত্তা চ কার্য্যং কারণমেব চ" (মঃ ভাঃ শান্তি—৩৪৮।৬০) এবং "নেথত্থাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ" (ভাঃ ২।১০।৭৭) প্রভৃতি শব্দ-প্রমাণ-দ্বারা প্রমাণিত হয়, সর্ব্বকারণ কারণ শ্রীভগবান্ ধর্ম্মমূল হইলেও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনাদি-ব্যাপারে তাঁহার সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব নাই। তৎ শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষগণদ্বারাই তিনি সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। যদি অন্যথা হইত, তাহা হইলে 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়', 'চতুঃসন-সম্প্রদায়,' 'রুদ্র-সম্প্রদায়' বা 'শ্রী-সম্প্রদায়' নাম না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐসকল সম্প্রদায় "বাসুদেব-সম্প্রদায়", "সঙ্কর্ষণ-সম্প্রদায়", বা "নারায়ণ-সম্প্রদায়" প্রভৃতি নামেই খ্যাত হইত। বিষ্ণুতত্ত্বটি সৎ বা সাত্বত সম্প্রদায়ের উপাস্য অধিদৈবত; তন্মধ্যে বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-সম্প্রদায় 'সহস্রাধিদৈবত' নামে প্রসিদ্ধ।

যদি কেহ বলেন,—'বিধিভক্তি-প্রচার লক্ষ্মী-ব্রহ্মাদি বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুজনের দ্বারা সম্ভব হইলেও রাগভক্তি-প্রচারে একমাত্র কৃষ্ণেরই সামর্থ্য, তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও সামর্থ্য নাই'—এই বিচার যুক্তিযুক্ত বলা যাইতে পারে না, কারণ উন্নত-উজ্জ্বল-রস-প্রদান ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন এক কথা নহে। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনরূপ কার্য্য শাস্ত্র-শাসন, আম্নায়-অঙ্গীকার, বিধি-ধর্ম্ম-পালনাদি-মূলে অবস্থিত, উহা রাগমার্গীয় ব্যাপার নহে; উহা ঐশ্বর্য্যভাবব্যঞ্জক ব্যাপার, বিষ্ণু বা বিষ্ণুশক্তির কার্য্য-বিশেষ। কৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্‌গন স্বতন্ত্রেচ্ছ স্বয়ংরূপের ঔদার্য্যের সহিত তাঁহার বৈভব-প্রকাশ বা বিলাস বিষ্ণুতত্ত্বের কার্য্যকে একাকার করিয়া তত্ত্বানভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন না। কৃষ্ণপ্রিয়তম গুরুদেব আশ্রয়-জাতীয় তত্ত্ব, তিনি বিষয়-জাতীয় তত্ত্ব নহেন। বিষয়-তত্ত্ব হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়লীলাভিনয়কারী আশ্রয়-তত্ত্বমাত্র নহেন। তাঁহাকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গুরুমাত্র জানিলে তাঁহার সম প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় প্রকাশ আছে, এইরূপ প্রতীতি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতপাঠে জানা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্কর-সম্প্রদায়ী শ্রীমৎ কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা

গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে কেশব ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্র প্রদান করিয়া কেশবভারতীকেই সন্ন্যাস প্রদান বা পরাত্মনিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একাধারে কেশব-ভারতীকে কৃপা ও শাস্ত্রীয় বিধিমার্গ আচার-প্রচারার্থই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ অভিনয়। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮)

আরও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যই সন্ন্যাসের যাবতীয় বিধিযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্-মহাপ্রভু শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের বিকৃত পরিণতি-ক্রমে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দশনামি-সম্প্রদায়ের অন্যতম 'ভারতী'— এই নাম গ্রহণ না করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'—এই ব্রহ্মচারিনামই প্রচার করেন। ইহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, পরন্তু শঙ্কর-সম্প্রদায়ি-সন্ন্যাসিগণকে কৃপা করিয়া নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী, শ্রীকেশব ভারতী প্রভৃতি সকলেই তাঁহার কৃপায় উদ্ভাসিত। তৃতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য হইতেও জানা যায়,—'পরাত্মনিষ্ঠা' মাত্র বেষ-ধারণ। মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৩।৮১)

কেবলাদ্বৈতবাদ-ধ্বান্ত-মার্ত্তণ্ড শুদ্ধ-দ্বৈতবাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বা ভক্তিকল্পতরুর মূল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ দশনামীয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে যেমন মায়াবাদী বা শঙ্করের অনুগত বলা অযৌক্তিক, সেইরূপ বিচারেও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা নিতান্ত অজ্ঞতা। শ্রীমধ্ব ও শ্রীচৈতন্য শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবিশেষকে মায়াবাদ হইতে উদ্ধারের জন্য শিষ্যের প্রতি মান-দান-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় স্বীকার করিবেন বলিয়াই জগদ্গুরু হইয়াও শ্রীঈশ্বরপুরীকে 'দীক্ষা-গুরু'রূপে বরণ করিবার লীলা এবং সর্ব্বত্র সকল সময়ে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের প্রতি গুরুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন :—"সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার' আমারে। এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥" (চৈঃ ভাঃ আ, ১৭।৫৪)

শ্রীঈশ্বরপুরীর আবির্ভাবভূমি দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে লীলা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার হৃদ্গতভাব শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে "দশাক্ষর-মন্ত্র" গ্রহণ-লীলার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে, আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-মায়াবাদের প্রতিযোগী 'তত্ত্ববাদ' এবং তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য যে প্রেম, তহাই প্রচারার্থ শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। 'শ্রীমন্মহাপ্রভু যে মধ্বমতকে অঙ্গীকার করিলেন কেন?—তদুত্তর এই যে, মধ্বমত বা তত্ত্ববাদের বিশেষগুণ এই যে, উহা মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করে।"শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে অবস্থিত হইলে অভেদ-বাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে।" দুর্ব্বল মানবের নিশ্চিত মঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ বা মধ্বমত অঙ্গীকার করিয়াছেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রনালীতে উদিত হইয়াছে। তথাপি ঐ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত বিচার করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানে 'ভেদ' ও 'অভেদ'—এই উভয় বাদই স্বীকৃত, সেস্থানে ভেদবাদই প্রবল। 'ভেদাভেদ' শব্দদ্বয়ের মধ্যে 'ভেদ' শব্দটির প্রাবল্য না থাকিলে উহার ব্যবহারেরও কোন সার্থকতা থাকে না। তবে উহা প্রাকৃত ধারণার 'অচিন্ত্য'। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদধিক্কারকারী তত্ত্ববাদ বা শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া একদিকে যেমন অভেদবাদরূপ পীড়া হইতে জীবকুলকে দূরে রাখিবার জন্য শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের অধিকতর উপযোগীতা প্রচার করিলেন, অপরদিকে তেমনই নিজেকে একজন নবীনপন্থার সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক প্রচার না করিয়া সাত্বত-সম্প্রদায় ও শ্রৌত-পথ গ্রহন-কারীর লীলাদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সনাতনত্ব ও সৎসাম্প্রদায়িকত্ব প্রমাণ করিলেন। এইরূপ লীলার দ্বারা শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত সঙ্গতিও সাধিত হইল। সাত্বত শাস্ত্র বলেন, সৎ-সম্প্রদায়-স্বীকার-ব্যতীত মন্ত্রাদি ফলদায়ক হন না,—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥" (শ্রীপদ্মপুরাণ)

কেহ কেহ বলেন, "শ্রীঈশ্বরপুরীর ভক্তিভাবপ্রবণতার প্রাধান্য দর্শন করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। হয়ত তৎকালে বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের তাদৃশ কোন ভক্তিমান্ বৈষ্ণব তাঁহার নয়নগোচর হইলে তিনি তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিতেন, মধ্বসম্প্রদায়ের ভক্তিবিহীন ব্যক্তিকে কেবল সম্প্রদায়ানুরোধে গুরুত্বে বরণ করিতেন না।"

এইরূপ যুক্তিতে বহু ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। ভক্তিবিহীন ব্যক্তি 'গুরু' পদবাচ্যই নহেন। "গুরুত্ব জাতি বা বংশগত ব্যাপার নহে"—ইহা প্রচার করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সদ্গুরু-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি একমাত্র মধ্বসম্প্রদায়কেই স্বীকার করিবার উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী না হইয়া কোনও বিশেষ কারণবশতঃ অর্থাৎ কেবল পুরুষ-বিশেষের ভক্তিপ্রবণতা দেখিয়াই তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তৎকালে, দক্ষিণদেশে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-ব্যতীত দক্ষিণদেশের অন্য সম্প্রদায়ের লোকগুলি "নানা-মত-গ্রাহ-ব্যাপ্ত" ছিল। কারণ, তাহা না হইলে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই বা কেন শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীকে 'গুরু' স্বীকার করিবার লীলা প্রদর্শন করিবেন? আবার সেইরূপ ভ্রম শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুরই বা কেন হইবে? তিনিই বা কেন মধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি তীর্থ বা শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিবেন?

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, যেখানে তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তির বিচার হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববাদকে কোনও প্রকারে স্বীকার করেন নাই। তাই তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগতাভিমানী তদানীন্তন তত্ত্ববাদ-গুরু শ্রীরঘুবর্য্যতীর্থের মতবাদকে খণ্ডন করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শুদ্ধমত গ্রহণকারী অর্থাৎ তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য উপলব্ধিকারী শ্রীঈশ্বরপুরী'কই গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যদি মধ্বসম্প্রদায়কেই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার না করিবেন, তাহা হইলে লোকশিক্ষক প্রভুত্রয় যুগপৎ শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় হইতেই গুরু-বরণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন কেন? এমন কি, সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন-করিবার পরও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীকে 'গুরু'বলিয়া প্রচার করিতেন এবং শ্রীঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীপরমানন্দপুরী প্রমুখ আচার্য্যগণকে সম্মান করিতেন। তিনি শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দকে গুরুদেবের আদেশ-ক্রমে নিজ-সেবায় নিযুক্ত করিবার সময় "গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া" প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে, শ্রীপরমানন্দপুরীকে কিরূপ গুরুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের সারগ্রাহী-গনের অবিদিত নাই।

শ্রীবেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতি যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে 'শ্রীসম্প্রদায়ের' অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন, তাঁহারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভের পর শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ানুগত্যে শ্রীমধ্বের উপাস্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের ভজন জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আর যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায়কে স্বীকার না-ই করিবেন, তাহা হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে প্রেমামরতরুর 'প্রথম অঙ্কুর' বলিয়া বর্ণন করিবেন কেন? অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের সন্দর্ভ অর্থাৎ গূঢ় ও সারোক্তি-প্রকাশক, সিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্য-রক্ষৈক-সেনাপতি, শ্রীরূপানুগবর শ্রীমজ্জীব-গোস্বামি-চরণ তাঁহার সন্দর্ভের প্রারম্ভে "বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্-বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ।"—এই বাক্যে জানাইয়াছেন যে বৃদ্ধবৈষ্ণব পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বিলিখিত সিদ্ধান্তই সন্দর্ভের মূল; কারণ, দাক্ষিণাত্য-নিবাসী শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ সেই আকর গ্রন্থ হইতেই বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সার সংগ্রহ করেন। তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন,—"মধ্বাচার্য্যচরণৈরিতি অত্যাদর-সূচক-বহুত্ব-নের্দ্দিশঃ স্বপূর্ব্বাচার্য্যত্বাদিতি বোধ্যম।" গৌরপার্ষদ শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামি-প্রভু

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাগ্রন্থে (২১।২৬ সংখ্যায়) ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী শ্রীগৌরানুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যব্যর্গকে ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ের অধস্তনরূপে বর্ণন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য'; 'প্রমেয়রত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে "শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

আম্নায়-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের 'তীর্থ' নাম দৃষ্ট হয়। অতএব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বা শ্রীঈশ্বরপুরীকে শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে না। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী মধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভ্ক্ত না হইলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন বলাও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ যাঁহারা আম্নায়- বিজ্ঞান অবগত আছেন, তাঁহারা বলেন—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বা শ্রীঈশ্বরপুরীর 'পুরী' নাম তাঁহাদের সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার নাম। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের নিকট দীক্ষিত ও 'পুরী'-নাম-ধারী কোন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা আবিষ্কার করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ শ্রীকেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দীক্ষা-গুরু ও সন্ন্যাস-গুরু সকল ক্ষেত্রেই যে, একই ব্যক্তি হইবেন, তাহার কোন নিয়ম নাই। আবার কোন কোন স্থলে সন্ন্যাস-গুরু ও দীক্ষা-গুরু একই ব্যক্তি হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীলক্ষীপতি তীর্থের অনুকম্পিত শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রের নিকট হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা আবিষ্কার করায় তাঁহারা সকলেই শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন বলিতে হইবে।—

কেহ কেহ বলেন—"শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমকে 'সাধ্য' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং মুক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমধ্বমতে মুক্তিই সাধ্য। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মোক্ষকে 'সাধ্য' বলিয়া স্বীকার করিলেও জীবপরমাত্মৈক্যরূপ সাযুজ্য স্বীকার করেন নাই। পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত 'সাযুজ্য' শব্দদ্বারা সাধারণে যে 'জীব-পরমাত্মৈক্য' ধারণা করে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের বিচার তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তন্মতে সেইরূপ সাযুজ্যমুক্তি সর্ব্বতোভাবে তিরস্কৃত। যদি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জীবপরমাত্মৈক্যই স্বীকার করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা নিত্য-পঞ্চভেদ-বাদী বলিবার পরিবর্ত্তে ভাস্কর ভট্টাদির ন্যায় ঔপচারিক ভেদবাদী বলিতে হয়। ভাস্কর ভট্টের ঔপচারিক ভেদবাদ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের তাত্ত্বিকভেদবাদ শুদ্ধদ্বৈতসিদ্ধান্ত বিষয়ে বিজ্ঞান লাভ হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে আমরা কখনও জীব-পরমাত্মৈক্য স্বীকারকারী বলিব না। 'ভাস্কর'-মত 'বেদার্থ-সংগ্রহে' 'শ্রী'ভাষ্যকার খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমন্-মধ্বমতে কিরূপভাবে জীব-পরমাত্মৈক্যরূপ সাযুজ্য তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহা তাঁহার বিবিধ রচনা হইতে প্রদর্শিত হইতেছে।—

১।—বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়ে—"অতএব বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমতাই নিখিল সাত্বত-শাস্ত্রের মহাতাৎপর্য্য। অনেকের মধ্যে একের অতিশয্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতে তদ্বাচক শব্দের উত্তর 'তমপ্' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। বহু বস্তুর বিদ্যমানতা না থাকিলে তুলনা বা একের আতিশয্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। অতএব শ্রীবিষ্ণুকে পরতম-তত্ত্ব স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রমাণ-বিরুদ্ধ জীব-পরমাত্মৈক্য সর্ব্বশ্রুতির তাৎপর্য্যের কিরূপেই বা যোজনা হইতে পারে?

২।—সত্য, সত্য, পুনরায় সত্য ও কোটি কোটিশপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি বিষ্ণুমাহাত্ম্যের লেশমাত্রকে কোটিভাগেবিভক্ত করা যায়, পুনরায় তাঁহাকে অনন্তভাগে, পুনরায় তাঁহাকে অনন্তভাগে বিভক্ত করা যায়, তথাপি সেই একাংশের সহিতও শ্রীশেষ, ব্রহ্মা বা শঙ্করের মাহাত্ম্য সমান হইতে পারে না। "শ্রীনারায়ণের তুল্য বর্ত্তমানে কেহ নাই, অতীতে কেহ হন নাই, ভবিষ্যতে কেহ হইবেন না"—ইহাই নারদীয় বাক্যে কথিত হইয়াছে। —এই সত্য বাক্যের দ্বারা আমি আমার সর্ব্বার্থ অর্থাৎ জীরপরমাত্মার তাত্ত্বিকভেদ, মুক্তাবস্থায়ও তাঁহাদের নিত্যসেব্য-সেবক-সম্বন্ধ প্রভৃতি সাধন করিব। (গীতা-ভাষ্য)

৩। —"যিনি পরম ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন" এই মুণ্ডক-বাক্যেও (মুঃ ৩।২।৯) মুক্তজীবের ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মুক্তজীব ও ব্রহ্মের অবিভাগ সিদ্ধ হইল।

অতএব মুক্তির পূর্ব্বেও জীব ব্রহ্মস্বরূপই থাকেন; যদি তিনি তৎস্বরূপ না হইবেন, তাহা হইলে মুক্তদশায়ও ব্রহ্মত্ব-লাভ করিতে পারেন না। কারণ, একবস্তু কখনও অন্য বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হন না। অতএব যেহেতু জীব মুক্তদশায় ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন, কাজেই জীব ব্রহ্ম হইতে অন্য বা বস্বন্তর নহেন। এইরূপ যুক্তি যদি প্রদর্শন করা হয়, তবে তাহা সঙ্গত নহে। কারণ এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত আছে, যেমন, এক জল অন্য জলের সহিত মিশ্রিত হইলে লোকে বলিয়া থাকে যে, উহা এক হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ উভয় জল ভিন্ন বলিয়া উহাদের এক হওয়ার অর্থ 'একজল অন্য-জল-স্বরূপ হইয়া গিয়াছে' এরূপ নহে; কিন্তু এস্থলে তদন্তর্ভূত হওয়াই 'একীভাব' শব্দের অর্থ। এস্থলেও ঠিক ঐরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। শ্রুতি ও (২।৪।১৫) এইরূপ বলিতেছেন—"হে গৌতম, যেমন এক শুদ্ধজলে অপর শুদ্ধজল মিশ্রিত করিলে উহা তাহারই মত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী মুনির আত্মাও ব্রহ্মের মত হইয়া থাকে।" (ব্রঃ সূঃ)

স্কন্দপুরাণেও আছে যে—"যেমন একজলে অন্যজল নিক্ষেপ করিলে তাহার সহিত উহা মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় লোকের মনে হয় যেন নিক্ষিপ্ত জল পূর্ব্বজলস্বরূপ হইয়া গিয়াছে; সেইরূপ জীবও ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলেও "জীব ব্রহ্ম হইয়াছেন" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, বস্তুতঃ জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন না। কারণ, ব্রহ্ম—'স্বতন্ত্র', জীব—পরতন্ত্র (ব্রহ্মের অধীন); ব্রহ্ম—বিভুপদার্থ, কিন্তু জীব—অণুপদার্থ; এইরূপ উভয়ের স্বরূপগত বিবিধ পার্থক্য-বশতঃ একে অন্যের স্বরূপ হইতে পারেন না। ব্রহ্মা বা শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণও যাহা লাভ করিতে সমর্থ নহেন, সেই কৈবল্য-অবস্থা যাঁহার স্বরূপ—তিনি কেবলস্বরূপ পরমারাধ্য শ্রীহরি। (ব্রঃ সূ ২।১।১৩ মধ্বভাষ্য)

৪।—অতএব এস্থলে 'একীভাব' শব্দের অর্থ—এক জলে অপর জলের একীভাবের ন্যায় বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রেও আছে যে—যেমন—"শুদ্ধজলে শুদ্ধজল একীভূত হয় এবং যেরূপ নদীসকল মিলিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি। বস্তুতঃ যদি এক জলের সঙ্গে অপর জল মিলিত হইয়া পূর্ব্বজল-স্বরূপই হইয়া যাইবে, তাহা হইলে আর সে স্থলে জলের বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে।

৫।—যেমন সমুদ্রে বহু তরঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মেও আমরা বহুজীব অবস্থান করিতেছি, কিন্তু সেজন্য তরঙ্গ কখনও সমুদ্রস্বরূপ নহে। অতএব হে জীব, তুমি কিরূপে ব্রহ্মস্বরূপ হইবে (অর্থাৎ তুমি যে নিজকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অভিমান কর, উহা মিথ্যামাত্র)? ৭২ (তত্ত্ব মুক্তাবলী)

৬।—'অভেদঃ সর্ব্বরূপেষু জীবভেদঃ সদৈব হি'। (মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।৪৫)—ব্রহ্মের স্বীয় অনন্তরূপের মধ্যে কোন ভেদ নাই, কিন্তু জীব তাঁহা হইতে সর্ব্বদা ভিন্ন।

৭।—ন চ জীবে সমন্বয়োঽভিধীয়তে "সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মেবারুণ্যো মেবারুণ্যো মেবারুণ্যঃ"। (১।১।১২ মধ্বভাষ্যধৃত শ্রুতিবচন)

শ্রীমন্মধ্বমতে মুক্তাবস্থাতেও জীব-ঈশ্বরের ভেদ ও নিত্যোপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে:—

১।—ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ (ভাঃ ২।৯।১০) ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিষু তাৎপর্য্যং মুক্তানাং ভেদস্যৈবোক্তেঃ। (ছান্দোগ্যভাষ্য ৬ অঃ)—"অন্যের কি কথা, যথায় স্বয়ং মায়াও প্রবেশ-লাভে সমর্থা নহেন, তথায় দেবাসুরাদি নিখিল-জীব-পূজনীয় হরিসেবকগণ অবস্থান করিতেছেন" ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতির তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বত্রই মুক্তজীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন।

২।—(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ২।৬২, ৬০ ও সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭)—মোহরহিত মুক্তগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইয়া থাকেন। সেই একমাত্র পরমপুরুষই মুক্তজনের বন্দনীয়।

৩।—মুক্তের পক্ষে উপাসনা কর্ত্তব্য কিনা এই বিষয়ে বলিতেছেন—* * বিপ্রগণ মুক্ত হইয়াও নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় ভগবৎ উপাসনা এবং কুশাদি গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। (সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭)

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র বিগতমোহ অর্থাৎ নিবৃত্তানর্থ মুক্তপুরুষগণের দ্বারাই পূজিত হন। সেই অদ্বয়-জ্ঞান কৃষ্ণই একমাত্র মুক্তগণের বন্দ্য পুরুষোত্তম। এই সকল সুস্পষ্ট বাক্যের দ্বারা শ্রীমন্মধ্বমতের সাধ্য 'মোক্ষ' যে বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভ,' তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। তাই, শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যকার 'প্রমেয়-রত্নাবলী-গ্রন্থে' মধ্বমতের প্রমেয়সমূহ উদ্দেশ করিতে গিয়া 'মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভং'—এইরূপ লিখিয়াছেন। 'ভেদ-ব্যপদেশাচ্চ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৭)—এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'মুক্তির্হিত্বা হি অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' (ভাঃ ২।১০।৬) অর্থাৎ "মায়িক স্থূল-সূক্ষ্ম-রূপদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা ভগবৎ-পার্ষদরূপে অবস্থানের নামই মুক্তি"—এই ভাগবতীয় বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও 'মুক্তি-পদ'-অর্থে 'কৃষ্ণ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি 'মুক্তি' জীবপরমাত্মৈক্য বা নির্ভেদ-জ্ঞানানুসন্ধিৎসামূলা আত্মবিনাশরূপ পীড়া হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া নিত্যসেবাদ্বারা সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ বরন করিল, তাহা হইলে মুক্তিকে 'বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভ' বা ভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গ্রহন করিতে নিশ্চয়ই কোন বাধা থাকিতে পারে না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কথিত 'মুক্তি' শব্দের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া উহাকে 'বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভ' বা 'ভক্তি' হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিলে আভিধানিক বিবাদমূলে মায়াবাদধিক্কারকারী শুদ্ধদ্বৈতবাদের পরিপন্থী হইয়া জড়ভেদবাদকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কথিত সাধ্যসার-বিজ্ঞানে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইবে। নিত্য চিদ্‌বিলাসী বিষ্ণুর সেবায় প্রবেশলাভই যথার্থ মুক্তি। তাহা ভক্তি হইতে পৃথক্ নহে।

শ্রীমধ্বমতে সাধ্য—বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভরূপ মুক্তি ও মুক্তগণের মধ্যে ভেদ অর্থাৎ আনন্দের তারতম্য স্বীকৃত এবং ভজন-তারতম্যে অবস্থিত মুক্তগণের সেবানন্দময়ী পরাকাষ্ঠাবস্থা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রদত্ত ভজনমুদ্রায় অভিব্যক্ত। যেমন, ক্ষীর হইতে ঘৃতের শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়া 'ঘৃতে ক্ষীরের মৌলিকত্ব নাই'—এইরূপ বিচার নিতান্ত অসিদ্ধ, তদ্রূপ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রতিপাদ্য সাধ্য বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভরূপ মুক্তি হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সাধ্যসার প্রেমার উৎকর্ষ আছে বলিয়া 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্ মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই'—এইরূপ যুক্তিও নিতান্ত জড়ভেদমূলা।

সংসারার্ণব-তরণীস্বরূপ সুখময়ধাম শ্রীমদানন্দতীর্থ নিত্যকৃষ্ণদাস জীবকুলকে কেবলাভেদবাদরূপ পীড়া হইতে দূরে রাখিবার জন্য এবং ঔপচারিক ভেদবাদীর ছলনাময়ী দুর্গতি হইতে জীবকুলকে সতর্ক করিবার জন্য তাত্ত্বিক ভেদাভেদ বা শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া শুদ্ধভেদের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বমতে ভেদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও অভেদপর শ্রুতির অবমাননা হয় নাই; কেননা, শুদ্ধদ্বৈতবাদে যে অভেদপর শ্রুতির সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদই স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিচরণ সন্দর্ভে এইরূপ আভাসই প্রদান করিয়াছেন। "শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভেদকে 'নিত্য' বলিয়া স্থাপন করায় অচিন্ত্যভেদাভেদমতই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে।" (বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা)

'তত্ত্বমসি- (ছাঃ ৬।৮।৭) 'অহংব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ আঃ ১।৪।১০), প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে পরতত্ত্বের সহিত জীবাত্মার অভেদ প্রতীত হয়। আবার 'নিত্যো নিত্যানাং,' 'চেতনশ্চেতনানাং' (কঠ ২।১৩ ও শ্বে ৬।১০) 'দ্বা সুপর্ণাঃ' (মুঃ ৩।১ শ্বেঃ ৪।৬) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য--দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এইপ্রকার বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যের সমাধান কি প্রকারে হইতে পারে, তন্নিমিত্ত বলিতেছেন,—অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব বিষ্ণু জীবসঙ্ঘ হইতে ভিন্ন। পরমতত্ত্ব—পূর্ণ এবং জীব—অপূর্ণ অর্থাৎখণ্ডচেতন। অতএব 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৪।১), প্রভৃতি অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্যের সমাধান এইপ্রকার যথা, ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—জীব সকল ভিন্ন, পরতত্ত্ব ভিন্ন, উভয়েই চেতন অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বেদে সর্ব্বত্রই তদুভয়ের একত্ব বা জীবকে ব্রহ্মস্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (মধ্বভাষ্য ২।৩।২৮-২৯)

কবিগন ব্রাহ্মণবটুকে—অগ্নি, বদনমণ্ডলকে—পূর্ণচন্দ্রবিম্ব, চক্ষুকে—নীলপদ্ম, কুচতটকে—মেরু এবং করকে—পল্লব বলিয়া থাকেন; কেননা, আহার্য্যভ্রম অর্থাৎ কাল্পনিক ভ্রমবশতঃ অগ্নি ও ব্রাহ্মণবটুতে ভেদ-সত্ত্বেও সাদৃশ্য-ঐক্যবোধে প্রথমা ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ ১।৪।১০) প্রভৃতি শ্রুতিতেও 'ব্রহ্ম' ও 'অহং'—যে জীব, ইহাঁদের নিত্যভেদসত্ত্বেও প্রাদেশিক-সাদৃশ্য-বশতঃ অভেদমতি-প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রথমার ব্যবহার হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই

ব্রহ্ম ও জীবে নিত্যভেদ আছে। চিজ্জাতিত্বে ঐক্যবশতঃ এক প্রদেশে অভেদ থাকায় 'অহং' ও 'ব্রহ্ম'—এই উভয় পদে প্রথমা বিভক্তির ব্যবহারে দোষ নাই।

একদিকে যেমন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার শ্রুতিকে নিত্যরূপে (ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদীর ন্যায় ব্যবহারিকরূপে নহে) গ্রহণ ও সম্মান করিয়া প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকার করিয়াছেন, অপরদিকে তেমন সনাতনপুরুষ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্যাভেদাভেদসিদ্ধান্তমধ্যে নিত্যভেদবাদেরই প্রাবল্য প্রদর্শন করিয়া মধ্বমতকেই অঙ্গীকারপূর্ব্বক উহাকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আকার প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত 'ব্রহ্মতর্কে'র বাক্যে "অচিন্ত্য" ও "ভেদাভেদ" শব্দের প্রয়োগও ঐ সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

যথা—জনার্দ্দনে অবয়বী ও অবয়বসমূহ, গুণী ও গুণসমূহ, শক্তিমান্ ও শক্তি, ক্রিয়াবান্ ও ক্রিয়া এবং অংশী ও স্বরূপাংশ—ইহাদের পরস্পর নিত্য অভেদ বর্ত্তমান। জীবস্বরূপসমূহ এবং চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও ঐরূপ অভেদ রহিয়াছে। অভেদ হেতু (অংশপ্রভৃতির সহিত অংশিপ্রভৃতির অভেদহেতু), গুণাদির পৃথক্ অবস্থানের (গুণিপ্রভৃতি হইতে গুণপ্রভৃতির পৃথক্ অবস্থানের) অভাবহেতু এবং অংশিপ্রভৃতি ও অংশপ্রভৃতি—এই উভয়ের নিত্যত্বহেতু তাহারা (অংশিপ্রভৃতি) অনংশ, অগুণ, অক্রিয় ও অবয়বহীনরূপে কথিত হয়। আর বিষ্ণুর অচিন্ত্যশক্তিত্ব-নিবন্ধন এই সমস্তই সম্ভব। ক্রিয়াদির নিত্যত্ব, প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বরূপে ব্যবহার এবং বিশেষ ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্রূপেই সিদ্ধ হয়। অচিন্ত্যশক্তিত্ব-নিবন্ধন পরমেশ্বরে সমস্তই সঙ্গত। আর তাঁহার শক্তিহেতুই জীবসমূহে ও চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও (তত্তদ্বিষয়গত) ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান; যেহেতু অন্যত্র (তত্তদ্বিষয়ে) ভেদ ও অভেদ—উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্তকারণব্যতীত কার্য্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞাতব্য।

শ্রীমন্মধ্বমতে কনিষ্ঠাধিকারী সাধকের পক্ষে প্রথম মুখে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণের কথা স্বীকৃত হইলেও 'ভগবৎ-পরম-প্রসাদ-সাধনা' পরমা ভক্তিই প্রধান সাধনরূপে স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই অনর্থযুক্তাবস্থায় সাধকের সাধনক্রিয়া কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব সংসারে আগমন করিয়া স্থূল-লিঙ্গদেহে আবদ্ধ থাকে। দেহধর্ম্মাসক্ত ফলভোগাকাঙ্ক্ষিজীবগণ—'কর্ম্মী'; তাহাদিগকে ভগবৎ উন্মুখ করিতে হইলে প্রথমমুখে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ চেষ্টা ব্যতীত আর উপায় নাই। এই জন্যই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-রচয়িতা অভিধেয়াচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু পঞ্চরাত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৯৩ শ্লোক-ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবাক্য)

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥" ইতি ॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮ শ্লোকধৃত পঞ্চরাত্রবাক্য)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা অপরোক্ষ-জ্ঞান-সাধনা ভক্তিকেই সাধন বলিয়াছেন, যথা শ্রীমধ্বভাষ্যে—

"আ-ব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্তমসারঞ্চাপ্যনিত্যকম্। বিজ্ঞায় জাতবৈরাগ্যো বিষ্ণুপাদৈকসংশ্রয়ঃ ॥

স উত্তমোঽধিকারী স্যাৎ সংন্যস্তাখিলকর্ম্মবান্ ॥" (সূত্রভাষ্য ১।১।১)

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ", "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন", "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্," "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্," "যস্য দেবে-পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" ইত্যাদি শ্রুতিভাষ্য। ব্যাস-সংহিতায়াঞ্চ—"অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নামজ্ঞানাধিকারিণঃ। স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুনাং তন্ত্রজ্ঞানেঽধিকারিতা ॥ একদেশে পরোক্তে তু ন তু গ্রন্থপুরঃসরে। ত্রৈবর্ণিকানাং বেদোক্তে সম্যগ্ভক্তিমতাং হরৌ" ॥ * * যতো নারায়ণ-প্রসাদমৃতে ন মোক্ষঃ * * "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়", (সূত্রভাষ্য ১।১।১)

"বারাহে চ—গুরুপ্রসাদো বলবান্ তস্মাদ্বলবত্তরম্। তথাপি শ্রবণাদিশ্চ কর্ত্তব্যো মোক্ষসিদ্ধয়ে।" (৩৩৪৫) এবং ৫০-৫৪ শ্লোকে শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা ভক্তিকেই সাধন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'সন্দর্ভ' ও 'সম্বাদিনী'তে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিত 'শ্রীমহাভারত-তাৎপর্য্য' নামক গ্রন্থ হইতে বহুবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থরাজেও শ্রীমন্মধ্বপাদ উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস শ্লোকে 'ভক্তি'ই একমাত্র সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এবিষয়ে মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।১০৫-১০৯ ও ১১৬-১১৮ এবং "ভক্ত্যৈব তুষ্যতি হরিঃ প্রবণত্বমেব"। ঐ ২।৫৯।

পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ যখন 'ভক্তি-ব্যতীত সাধ্য-মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই'—ইহা পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রবচন উদ্ধারপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন, তখন উপেয় বা সাধ্য-লাভের উপায় বা সাধনরূপে যে 'ভক্তি'ই তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ভক্তির অধীন অর্থাৎ ভগবৎসেবাপর-কর্ম্মকে শুদ্ধ ও ভগবৎ-জ্ঞানানুকূলকর্ম্মকে সামান্যভাবে স্বীকার করিলেও শাস্ত্রনিন্দ্য কর্ম্মের সহিত ভগবৎসেবানুকূল কর্ম্মের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত ৩।৫।৩৩ সূঃ ভাষ্যে বলিয়াছেন, যেরূপ রাজার কর্ম্মসচিবরূপে মন্ত্রী বর্ত্তমান থাকেন, কিন্তু রাজা মন্ত্রী ব্যতীতও স্বয়ং কার্য্য-সম্পাদানে সমর্থ, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম-ব্যতীত মোক্ষ-প্রদানে সমর্থ হইলেও কোনও কোনও স্থানে কর্ম্মসচিবত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কর্ম্মকে মুখ্যরূপে মুক্তির উপায় বা সাধন বলিয়া স্বীকার করেন নাই; পরন্তু ভক্তিকেই সম্রাজ্ঞীর আসন প্রদানপূর্ব্বক কর্ম্মকে মন্ত্রী অর্থাৎ গৌণকর্ম্মনির্ব্বাহকের আসনে স্থাপনানন্তর কর্ম্মের মুখ্য অভিধেয়ত্ব নিরাস করিয়া সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্তের সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই। তবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য নবম অধ্যায়ে "কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে"—এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ। 'কর্ম্ম' শব্দে ফল-কামনা-মূলা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরূপা চেষ্টা; তাদৃশচেষ্টা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর উদ্দেশে যে যাগযজ্ঞাদি বিধান করিয়া থাকেন, তাহা বিশুদ্ধ কর্ম্ম; সুতরাং তাহা কখন গৌণরূপেও ভক্তিসচিব হইতে পারে না। কিন্তু যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশে কৃত হয় এবং যে ধর্ম্ম বিরাগের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় ও যে বিরাগ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবার জন্যই হইয়া থাকে, তাহা গৌণরূপে অভিধেয় হইতে পারে; কেন না, তাদৃশকর্ম্ম জীবকে ফলোৎপাদনরূপ অর্থশৃঙ্খলে জড়িত না করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত ও পরমার্থের উদ্দেশ করিয়া থাকে।

যথা, আম্নায় সূত্রে—"যত্র ধর্ম্মায় কর্ম্ম বিরাগায় ধর্ম্মশ্চন্দ্রসায় বিরাগস্তত্র গৌণরূপেণ কর্ম্মৈবাভিধেয়ম্"॥ এই ভক্তিই উন্নতাধিকারে একটি নূতন আকার ধারণ করে, তাহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি। ভক্তিই যে একমাত্র সাধন, ইহা মধ্বমতপ্রকাশক একটি শ্লোকেও পঠিত হইয়া থাকে, যথা—"অমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং।"

এই স্থানে সন্দেহ হইতে পারে যে, যদি এইরূপই সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা হইলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু উড়ূপী-ক্ষেত্রে তদানীন্তন তত্ত্ববাদী আচার্য্যকে এইরূপ বলিলেন কেন? "মুক্তি, কর্ম্ম—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ। সেই দুই স্থাপহ' তুমি সাধ্য-সাধন,।" (চৈঃ চঃ মঃ—৯।২৭১) তদানীন্তন তত্ত্ববাদী আচার্য্য রঘুবর্য্যতীর্থের বা তদ্অনুগত শিষ্যবর্গের কিংবা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের মতকে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের প্রকৃত মত বা সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে না। পরবর্ত্তী অনুগতব্রুব ব্যক্তিগণ যদি তাঁহাদের পূর্ব্বমূলাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত সিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত হন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বিকৃত মতকেই মূল গুরুর সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা কোন প্রকারেই যুক্তি বা ন্যায়-সঙ্গত নহে। 'আউল', 'বাউল', 'প্রাকৃত সহজিয়া' প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অধস্তন, অনুগত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অধীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের বিকৃতমত বা অপসিদ্ধান্তকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না। কিংবা কোন আচার্য্য যদি জগতে উদিত হইয়া মহাপ্রভুর অনুগতব্রুব আউল, বাউল, সখীভেকী, প্রাকৃত-সহজিয়া, গৌরনাগরী, জাতি-গোস্বামী প্রভৃতির বিকৃত মত খণ্ডন করেন, তাহা হইলে উক্ত আচার্য্য মহাপ্রভুর বা গোস্বামিগণের মত খণ্ডন করিয়াছেন, এরূপ

অযৌক্তিক বিচার সুধী-সমাজে কিছুতেই গৃহীত হইতে পারে না। "তত্ত্ববাদিগণের মত বা রঘুবর্য্যতীর্থের, সিদ্ধান্তিত ব্যক্তিগত মত শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্র-যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বের প্রবর্ত্তিত শ্রৌতমত খণ্ডন করিয়াছেন, অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই"—এইরূপ যুক্তি নিতান্ত বালভাষিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকৃত মত হইতে পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের মত অনেক পার্থক্য লাভ করিয়াছে। তাহা শ্রীমন্মধ্বপাদের লেখনী এবং আধুনিক তত্ত্ববাদিগণের আচার-প্রচার ও লেখনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়।

কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমন্মধ্বমতে শ্রীমহাভারতই একমাত্র 'প্রমাণ' বা 'শাস্ত্র'বলিয়া গৃহীত, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের মতে শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র অমল প্রমাণ। "শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য্য" নামক স্বরচিত গ্রন্থেও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ শ্রীমহাভারতকে একমাত্র শাস্ত্র-রূপে গণনা না করিয়া শ্রুতি, স্মৃতি, সাত্বতপুরাণ ও পঞ্চরাত্রকেও প্রমাণ বা শাস্ত্র মধ্যে গণনা করিয়াছেন, যথা,—

"ঋগাদয়শ্চ চত্বারঃ পঞ্চরাত্রঞ্চ ভারতম্। মূলরামায়ণং ব্রহ্মসূত্রং মানং স্বতঃস্মৃতম্॥"

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১৩০-৩২)

পুনরায় শ্রীগীতাভাষ্যে—"পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা। পুরাণং ভাগবতং চ বিষ্ণু বেদ ইতীরিতঃ। অতঃ শৈবপুরাণানি যোজ্যান্যাবিরোধতঃ।" (গীঃ ভাঃ দ্বিতীয় অধ্যায়)

পুনরায় ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।৩),—"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥ যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥ ইতি স্কান্দে। সাংখ্যং যোগঃ পাশুপতং বেদারণ্যকমেব চ ইত্যারভ্য বেদপঞ্চরাত্রয়োরৈক্যাভিপ্রায়েণ পঞ্চরাত্রস্যৈব প্রামাণ্যমুক্তমিতরেষাং চ ভিন্নমতত্বং প্রদর্শ্য মোক্ষধর্ম্মেষপি"।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, গায়ত্রী ও বেদের অর্থনির্ণায়ক গ্রন্থ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, যথা শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে—ব্রহ্ম-মহাভারত-গায়ত্রী-বেদসম্বন্ধশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

উক্তঞ্চ গারুড়ে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। * * * ইতি।

—এই গ্রন্থ (শ্রীমদ্ভাগবত) বিষ্ণু, মহাভারত, গায়ত্রী ও বেদ-সম্বন্ধীয়। শ্রীগরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের অর্থ-স্বরূপ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক, গায়ত্রীর-ভাষ্য ও বেদার্থ-পরিপুষ্ট। ইনি পুরাণশ্রেষ্ঠ এবং সাক্ষাদ্ ভগবৎকথিত। দ্বাদশস্কন্ধসংযুক্ত, শত শত অধ্যায়-সমন্বিত ও অষ্টাদশসহস্র শ্লোকযুক্ত এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত নামে অভিহিত।

শ্রীব্যাস-শিষ্য মধ্বাচার্য্য ব্যাসবাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদার্থপরিবৃংহিত, মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক প্রমাণ-শিরোমণি গ্রন্থ, তাহা স্বীয় বাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং 'মধ্ব ও গৌড়ীয়-মতে শাস্ত্র-প্রমাণ-সম্বন্ধে পরস্পর ভেদ'—এইরূপ কল্পনা মধ্ব-সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। শ্রীমন্মধ্বপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকে অমল প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন; ইহা 'শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য' আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। শ্রীমন্মধ্ব ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, উপনিষদ্‌ভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষ্যে প্রচুর পরিমাণে শ্রীমদ্ভাগবতের বচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন আচার্য্যকে শ্রীমদ্ভাগবত-বচন-দ্বারা 'বেদান্তসূত্র' বা শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায় নাই।

কেহ বলেন, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বারকাধীশকেই তাঁহার উপাস্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি নন্দ-নন্দনকে ইষ্টপদে বরণ করেন নাই। শ্রীমন্মধ্বশিষ্য, কবিকুলতিলক ত্রিবিক্রম-পণ্ডিতাচার্য্য-পুত্র শ্রীনারায়ণ পণ্ডিতার্য্যের বিরচিত—'সুমধ্ববিজয়'-মহাকাব্যের নবম-সর্গে (৪১-৪৩) শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য

'নন্দ-নন্দন'কেই স্বীয় ইষ্টরূপে বরণ করিয়া স্বীয় আরাধ্য বালকৃষ্ণ-নন্দনন্দন-শ্রীমূর্ত্তি উড়ুপী গ্রামস্থ স্বীয় মঠে স্থাপন করেন,—

গোপিকা-প্রণয়িনঃ শ্রিয়পতেরাকৃতিং দশমতিঃ শিলাময়ীম্।
শিষ্যকৈস্ত্রিচতুরৈর্জলাশয়ে শোধয়ন্নিহ ততো ব্যগাহয়ৎ ।।

* * * *

মন্দহাস-মৃদুসুন্দরাননং নন্দনন্দনমতীন্দ্রিয়াকৃতিম্।
সুন্দরং স ইহ সন্নাধাপয়দ্বন্দ্যমাকৃতি-শুচি প্রতিষ্ঠয়া ।।

বৃহৎ গোপীচন্দন-খণ্ড হইতে যে সুন্দরানন অতীন্দ্রিয়াকৃতি নন্দনন্দন বালকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীমূর্ত্তির একহস্তে একটি দধি-মন্থন-দণ্ড, অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু, সুতরাং এই শ্রীমূর্ত্তি 'নন্দনন্দন' ব্যতীত অপর কেহই নহেন। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি লাভ করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বাদশ স্তোত্রের অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায়ের রচনা সেই দিনেই সমাপ্ত করেন। বালকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবার পর তাঁহার দ্বাদশ-স্তোত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে রচনা আরম্ভ হয়, সেই ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে তিনি তাঁহার ইষ্টদেবের স্তবে বলিতেছেন,—

দেবকীনন্দন! নন্দকুমার! বৃন্দাবনাঞ্জন! গোকুলচন্দ্র!
কন্দ-ফলাশন! সুন্দররূপ! নন্দিত-গোকুল-বন্দিত-পাদ!!

অর্থাৎ হে যশোদানন্দন! (যশোদাঽপি দেবকীত্যুচ্যতে,—দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ ইত্যাদি পুরাণ-বচনাৎ—'দেবকী' শব্দে যশোদাকেও বুঝায়। আদিপুরাণ বচন হইতে জানা যায় যে, নন্দ-পত্নীর 'যশোদা' ও 'দেবকী' এই দুইটি নাম; অতএব 'দেবকী-নন্দন' শব্দে এই স্থানে 'যশোদা-নন্দন') হে নন্দসুত! (অথবা যাঁহার আনন্দ-দ্বারা 'মারঃ অর্থাৎ মন্মথ কুৎসিৎ হইয়াছে অর্থাৎ যিনি মন্মথ-মন্মথ), হে বৃন্দারণ্যে বিচরণশীল! হে কন্দফলভোজিন্! (অর্থাৎ বনবিহারী, ফলফুলকিশলয়ই যাঁহার সম্পত্তি) হে গোকুলচন্দ্রমা! হে সুন্দরমূর্ত্তে! হে নন্দিত-গোকুল-বন্দিতপাদ! (অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা ব্রজবাসিগন নন্দিত অর্থাৎ তুষ্টীকৃত হইয়াছেন এবং ব্রজবাসিগণকর্ত্তৃক যাঁহার পদযুগল সেবিত হইয়াছেন, সেই ব্রজের দুলাল শ্রীকৃষ্ণ)। এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের উপাস্য—'নন্দনন্দন'।

আর যদি 'দ্বারকাপতি'ই শ্রীমধ্বের "ইষ্ট" হ'ন তাহা হইলেও বা আপত্তির কথা কি? কারণ 'নন্দনন্দন' শ্রীকৃষ্ণে ও 'দ্বারকাপতি' শ্রীকৃষ্ণে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসোৎকর্ষ লীলাগত তারতম্যমাত্র বর্ত্তমান। শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বপাদ বিচার করিয়াছেন যে, বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদজ্ঞান মহাপরাধের সেতু। পরমেশ্বর-বিষ্ণু সর্ব্বত্রই একরূপ; ঐশ্বর্য্যহেতু তাঁহার একরূপই সর্ব্বত্র সূর্য্যের ন্যায় বহুধা প্রতিভাত, যথা—"একরূপঃ পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্ বহুধেয়ত ইতি মাৎস্যে। প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহ ইতি চ ভাগবতে।।" (সূত্রভাষ্য ৩।২।১১)

শ্রীমধ্বাচার্য্যের চরিত্র-লেখক মিঃ সি, এম্, পদ্মনাভাচারী এতৎপ্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য—যে সকল সন্ন্যাসী পালাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের সেবাভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনের গোপীবৃন্দ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুতীব্র ও অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ-বশতঃ তাঁহার নিত্য-সহচরী ছিলেন; অধুনা তাঁহারাই তাঁহার সেবা-সুযোগ লাভের জন্য পুনরায় প্রকটিত হইয়াছেন। এই সকল সন্ন্যাসিগণের আচরণে এইরূপ মনে হয়, যেন তাঁহারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থান ও বিচরণ করিতেছেন। * * * সংবৎসরব্যাপী বিভিন্ন উৎসব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলা নিত্যকাল স্মৃতিপথে জাগরূক করিতেছেন।

'দ্বাদশ-স্তোত্র' অথবা ভগবন্মহিম-সূচক অন্য কোন স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তাঁহারা বাদ্যের তালে তালে প্রেমময় ভগবানের পুরোভাগে নৃত্য করিতে থাকেন। স্তোত্র-পাঠ ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রোমাঞ্চ হয়

এবং অশ্রুধারা বহিতে থাকে এবং তাঁহারা ভগবদ্‌ভাবে বিভাবিত হন। ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা অধিক ভক্তিভাবপ্রবণ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রলীলা স্মরণ করিতে করিতে বাহ্যসংজ্ঞারহিত হইয়া পড়েন।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলীতে পাওয়া যায় যে—"অষ্ট মঠাধিপতি একদণ্ডী যতিগণ অনেকেই গোপীবেশে ভজন করিয়া থাকেন। আধুনিক যে সখীভেকী প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; সেইরূপ কল্পিত পথ তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে একদণ্ড বর্ত্তমান এবং তাঁহারা কৌপীন-বহির্ব্বাসযুক্ত"। অতএব এই সকল প্রমাণ দ্বারা শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ সম্প্রদায় ও গুরুপ্রণালী স্বীকৃত হইয়াছে। (শ্রীমৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' পুস্তকে গৌড়ীয় মঠ কর্তৃক প্রকাশিত।)

সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধুসদাশ্রয় সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচনা এবং ক্রমবৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে ততদিন জীবনান্তর তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্ম-প্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকেরই কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক নিজে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত বিধিনিষেধ শুদ্ধভাবে পালন করিয়া সম্প্রদায়স্থ আচরণ ও বিধি পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভালো দ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজারের সংস্কার করাই বিধেয়; কিন্তু ঐসকল কারণের জন্য যিনি বাজার-প্রণালী উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধি কোনপ্রকারেই প্রশংসনীয় নহে। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জগৎ-মঙ্গলবিধানার্থ সম্প্রদায় প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই পবিত্র ভারত-ক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়-বিরুদ্ধমত ছিল না। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে অধিকাংশ গুণ তাহাতে কিছু কিছু দোষ প্রবেশ করিলেও তাহা পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু। সম্প্রদায়-বিরোধীগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটি মত লইয়া আপনাদিগকে একটি 'অসম্প্রদায়ী' মনে করে। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাহারা একটি নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। (সঃ তোঃ ৪)

সম্প্রদায় বিস্তৃতি নামক তৃতীয় প্রকাশ

"সকল সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ পরমার্থতত্ত্বই আত্মার স্বধর্ম্ম বলিয়া বিচার করিয়াছেন। জীবসৃষ্টির সহিত ঐ নিত্যধর্ম্মের একত্রাবিষ্ঠান স্বীকৃত। আদৌ ঐ স্বধর্ম্ম স্বপ্রকাশরূপে ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য চিন্তনরূপ অস্ফুট ছিল। আত্মা ও ব্রহ্মের বিশেষ ভেদ স্থাপনপূর্ব্বক পরম প্রেমরূপ বন্ধন গ্রন্থি বিবেরিত হয় নাই। সেই ধর্ম্মতত্ত্ব অনেক দিবস পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-আত্মার অভিন্নতা বুদ্ধিস্বরূপে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু সূর্য্যরূপ সত্য কদাপি অজ্ঞান বা ভ্রম-মেঘের দ্বারা চিরকাল আচ্ছন্ন থাকিতে চাহে না। ঋষিগণ সময়ে সময়ে যজ্ঞ, তপস্যা, ইজ্যা, শম, দম, তিতিক্ষা, দান ইত্যাদি নানাপ্রকার অভিধেয় কল্পনা করতঃ সেই স্বধর্ম্মকে স্থির করিতে যত্ন করিয়াছেন। যৎকালে কর্ম্মকাণ্ড ক্ষুদ্র ও মন্দ ফল বিবেচিত হইল তখন আর্য্যদিগের মন মোক্ষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহাও শুষ্ক ও কার্য্যগতিকে বিফল। পরে আর্য্য-হৃদয়ে অপূর্ব্ব তত্ত্বের উদয় হইলে প্রেমতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি স্পষ্টীভূত হইল। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ ঐ নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কয়েকটি বিষয় স্থির করিয়াছেন।

১। পরমাত্মা—সচ্চিদানন্দ সূর্য্যস্বরূপ বিভু-চৈতন্য; জীবাত্মা—তদ্রশ্মি পরমাণুস্বরূপ অণুচৈতন্য।

২। ভগবৎ-শক্তির আবির্ভাবরূপ বিশেষ নামে কোন অনির্ব্বাচনীয় চৈতন্যগত নিত্যধর্ম্মের দ্বারা বিভু-চৈতন্য অণুচৈতন্য হইতে ভিন্ন, অণুচৈতন্যসকল পরস্পর ভিন্ন, চৈতন্যগণের অবস্থানোপযোগী পীঠ স্থাপন এবং চৈতন্য বস্তু হইতে জড়াত্মক জগৎ ভিন্ন হইয়াছে।

(৩) জড়াত্মক জগৎটি চিজ্জগতের প্রতিফলিত ধামবিশেষ এবং শুদ্ধানন্দের বিপরীত কোন প্রকার আভাসরূপ সুখদুঃখের পীঠস্বরূপ।

(৪) জড় জগতে জীবাত্মার নিত্যসম্বন্ধ নাই। কেবল বদ্ধ অবস্থায় উহা জীবাবাস মাত্র। অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তি কর্তৃক বদ্ধ জীবগণ জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া কেহ বা জড়সুখে আবদ্ধ আছেন, কেহ বা চিৎসুখ অন্বেষণ করিতেছেন।

(৫) স্বতঃ পরতঃ পরতত্ত্বের প্রতি জীবের অনুরাগরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নাম জীবের স্বধর্ম। বদ্ধাবস্থায় বিষয়রাগরূপ ঐ স্বধর্মের বিকৃত ভাবটি শোচনীয়।

(৬) স্বধর্মের স্বরূপাবস্থিতির নাম মোক্ষ। স্বালোচন কার্য্য অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা তাহা সাধিত হয়।

(৭) অধিকার ভেদে স্বধর্মানুশীলন বিবিধরূপ। তন্মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ; কতকগুলি গৌণ।

(৮) স্বরূপপ্রাপ্তি যে সকল অনুশীলনকার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ও অন্য ফলের সম্ভাবনা নাই; তাহারা সাক্ষাৎ।

(৯) যে সকল অনুশীলনকার্য্যদ্বারা দেহ-সম্বন্ধে কোন অবান্তর ফলপ্রাপ্তি সংঘটন হয়, সে সকল গৌণ।

(১০) সমাধিই প্রধান সাক্ষাদনুশীলন। তৎপোষক জীবননির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্মসকলকে প্রধান গৌণানুশীলন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(১১) সমাধি যোগে ব্রজভাবগত রসাশ্রিত কৃষ্ণানুশীলনই জীবের নিয়ত কর্ত্তব্য, যেহেতু ঐ ভাবটি জীবের প্রাপ্য বিষয়ের অত্যন্ত সন্নিকর্ষ।

(১২) অধিকার ভেদে পরম মাধুর্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় মধুর রসের আলোচনাই জীবের চরম মহিমা।

এই দ্বাদশটী তত্ত্বের মধ্যে প্রথম চারিটী তত্ত্বে কেবল সম্বন্ধজ্ঞান সংকলিত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে দশম তত্ত্ব পর্যন্ত জীবের কর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে। শেষ দুইটি তত্ত্বে কেবল জীবের চরম প্রয়োজনরূপ পরম-ফলের উদ্দেশ আছে।

এই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ব বর্ণনও পুরাণশাস্ত্রে প্রকাশিত থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রেই এই তিনটি তত্ত্বের সম্পূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয় এবং সিদ্ধান্তসকল স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সমুদ্রবিশেষ; ইহার কোন অংশে কি কি রত্ন আছে, তাহা সংগ্রহ করা মধ্যমাধিকারীদিগের পক্ষে নিতান্ত কঠিন।

*খৃষ্টের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে কপিলাবস্তু নগরে শাক্যকুলোদ্ভব গৌতম নামক একজন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া প্রবল জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনার দ্বারা আর্য্যদিগের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মটী আর্য্যদিগের সমস্ত পুরাতন বিষয়ের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ পঞ্জাবদেশ অতিক্রম করিয়া সিথিয়বংশীয় কণিষ্ক, হরিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি রাজগণের আশ্রয়ে হিমালয়ের উত্তরদেশে ত্রিবর্ত্ত, তাতার, চীন প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপ্ত হইল। এদিকে ব্রহ্মদেশ, সিংহলদ্বীপ প্রভৃতি অনেক স্থানে বৌদ্ধমতটি অশোকবর্দ্ধনের যত্নক্রমে দৃঢ়মূল হইয়া গেল! ভারতবর্ষেও ঐ ধর্ম্ম সারীপুত্র, মোদ্গলায়ন কাশ্যপ ও আনন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়া ক্রমশঃ অশোকবর্দ্ধন প্রভৃতি রাজগণের সাহায্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। আর্য্যদিগের তীর্থসকল বৌদ্ধপ্রায় হইয়াছিল। এমন কি, ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের প্রায় সকল চিহ্নই লুপ্ত হইতেছিল; তখন ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বৌদ্ধবিনাশে যত্ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঘটনাক্রমে কৃতবিদ্য ও মহাবুদ্ধিশালী শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কাশীনগরে ব্রাহ্মণদিগের সেনাপতি হইয়া উঠিলেন। ইহাঁর কার্য্য আলোচনা করিলে ইহাঁকে পরশুরামের অবতার বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাকে মহাদেবের পুত্র বলিয়া তাঁহার অনুগত ব্রাহ্মণরা স্বীকার করেন। তাঁহার বিধবা মাতা দ্রাবিড়দেশীয়া মহিলা ছিলেন ও কাশীবাসার্থে বারাণসীতে অবস্থান করিতেন। শঙ্কর, শঠকোপ, যমুনাচার্য্য, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বচার্য্য—এই সকল ও আর আর

অনেক মহা মহা পণ্ডিতগণ ঐ সময় দক্ষিণভারতে উদিত হন। শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণদলবল লইয়া অধিক কৃতার্থ হইতে না পারায় গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসীর পথ সৃজন করিয়া ঐ সকল সন্ন্যাসী-দিগের বাহুবলে ও বিচারবলে কর্ম্মপ্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে আত্মসাৎ করিয়া বৌদ্ধবিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে বৌদ্ধদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে পারিলেন না, সেস্থলে নাগাসন্ন্যাসীদল নিযুক্তপূর্ব্বক খড়্গাদি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। অবশেষে বেদান্তভাষ্য রচনাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধদিগের জ্ঞানকাণ্ড একত্র মিশ্রিত করিয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে একমত করিলেন এবং বৌদ্ধদের যে সকল দেবায়তন ও দেবলিঙ্গ ছিল সে সকল নামান্তর করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের অনুগত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা কতকটা প্রহারের ভয়ে ও কতকটা, স্বধর্ম্মের কিঞ্চিৎ অবস্থান দৃষ্টি করিয়া অগত্যা ব্রাহ্মণাধীন হইয়া পড়িলেন। যে সকল বৌদ্ধেরা এরূপ কার্য্যে ঘৃণা বোধ করিলেন, তাঁহারা বুদ্ধদেবের চিহ্নসমুদয় লইয়া হয় সিংহলদ্বীপে, না হয় ব্রহ্মরাজ্যে পলায়ন করিলেন।

বৌদ্ধমত দূরীভূত করিয়া শঙ্করাচার্য্য ভারতের কিয়ৎপরিমাণে সাংসারিক উপকার করিয়াছেন; যেহেতু পুরাতন আর্য্যসমাজ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছিল, তাহা নিবৃত্ত হইল। বিশেষতঃ আর্য্যগ্রন্থমধ্যে বিচার-পদ্ধতি প্রবেশ করাইয়া আর্য্যদিগের মনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; এমত কি তাঁহার প্রদত্ত বেগদ্বারা আর্য্যদিগের বুদ্ধি নূতন নূতন বিষয় বিচারে সমর্থ হইয়া উঠিল। শঙ্করের তর্কস্রোতে ভক্তিকুসুম ভক্তচিত্ত-স্রোতস্বতীতে ভাসমান হইয়া অস্থির ছিলেন, কিন্তু রামানুজাচার্য্য শঙ্করপ্রদত্ত বিচারবলে ও ভগবৎকৃপায় শারীরক সূত্রের ভাষ্যান্তর বিরচন করতঃ পুনরায় বৈষ্ণব-তত্ত্বের বল সমৃদ্ধি করিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য—ইহাঁরাও বৈষ্ণবমতের কিছু কিছু ভিন্ন আকার স্থাপন করতঃ স্ব-স্ব মতে শারীরক ভাষ্য রচনা করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সকলেই এক একটী গীতাভাষ্য, সহস্র-নাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরূক হইল যে, কোন একটি সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরি-উক্ত চারিটি গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারিজন বৈষ্ণব হইতে শ্রী-বৈষ্ণব প্রভৃতি চারিটি সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বদর্শিত দ্বাদশ তত্ত্বের মধ্যে প্রথম দশটি চারি সম্প্রদায়ে অনুভুক্ত ছিল। শেষ দুইটি তত্ত্ব তৎকালে মাধ্ব, নিম্বাদিত্য ও বিষ্ণুস্বামী—এই তিন সম্প্রদায়ে কিয়ৎপরিমাণে আলোচিত হইত।

খ্রীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৪০৭ শকাব্দায় শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন। প্রথমে সংসার-ধর্ম্মে থাকিয়া পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মের শেষ দুই তত্ত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান বিস্তার করিলেন। দেবদুর্ল্লভ বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বৈষ্ণবদিগের পরমপূজনীয় শ্রীশচীনন্দন পরমার্থতত্ত্বের যে অতুলসম্পদ বিতরণ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সাহায্যে রূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদ্বয়, রামানন্দ, স্বরূপ ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সম্বন্ধতত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অভিধেয়তত্ত্বে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়া ভজন-কার্য্য সংক্ষেপ করিয়াছেন এবং প্রয়োজনতত্ত্বে ব্রজরস আস্বাদন-করিবার অত্যন্ত সরল উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

সমস্ত জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও শ্রীনবদ্বীপে পরমার্থতত্ত্বের চরম উন্নতি দেখা যায়। পরব্রহ্ম জীবসমূহের একান্ত প্রেমের আস্পদ। অনুরাগক্রমে তাঁহাকে ভজন না করিলে তিনি কখনই জীবের পক্ষে সুলভ হইতে পারেন না। সমস্ত জগতে জীবের যে স্নেহ আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে ভাবনা করিলেও তিনি অনায়াস লভ্য নহেন। তিনি রসবিশেষের বশীভূত এবং রস ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সেই রস মুখ্য পঞ্চপ্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তরসটি ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রথমরস অর্থাৎ জীবের সংসার

যন্ত্রনা নিবৃত্ত্যন্তর পরব্রহ্মে অবস্থান মাত্র। ঐ অবস্থায় কিয়ৎপরিমাণ ব্যতিরেক সুখ ব্যতীত আর স্বাধীনতার কিছু নাই, তৎকালে পরব্রহ্মের সহিত সাধকের কোন সম্পর্ক স্থাপন হয় নাই। দাস্যরসই দ্বিতীয়রস। শান্ত-রসের সমস্ত সম্পদ ইহাতে আছে এবং সে সমস্ত ব্যতীত আরও কিছু ইহাতে উপলব্ধ হয়; ইহার নাম মমতা। ভগবান্ আমার প্রভু—আমি তাঁহার নিত্যদাস—এইরূপ একটি সম্বন্ধ ঐ-রসে লক্ষিত হয়। জগতে যতই উৎকৃষ্ট দ্রব্য থাকুক মমতা সম্বন্ধ না থাকিলে, তজ্জন্য কোন প্রকার বিশেষ ব্যস্ততা থাকে না। অতএব দাস্যরস শান্তরস অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। মহাজনগণ এই দাস্যরসকে ভক্তিরস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শান্তরসকে শুদ্ধ ভক্তিরসের মধ্যে গ্রহন করেন নাই। কিন্তু ব্রজের শান্তরসের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের ও তদনুগগণের কথা স্বতন্ত্র। শান্ত হইতে যেমন দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য হইতে সেইরূপ সখ্য শ্রেষ্ঠ। যেহেতু দাস্যরসে সম্ভ্রমরূপ কন্টক আছে। কিন্তু সখ্যরসে বিশ্রম্ভরূপ প্রধান অলঙ্কার দৃষ্ট হয়। দাসগণের মধ্যে যিনি সখা তিনি শ্রেষ্ঠ। সখ্যরসে শান্ত ও দাস্য রসের সকল সম্পদই আছে। দাস্য হইতে যেমন সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে বাৎসল্য তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত সখাগণের মধ্যে পুত্র অধিক প্রিয় ও আনন্দ উৎপাদক। বাৎসল্যরসে শান্তাদি চারিরসের সম্পদ দেখা যায়। বাৎসল্যরস অন্য সকল রস হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও মধুর রসের নিকট অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। পিতাপুত্রে অনেক বিষয় গোপন থাকে কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে তাহা থাকে না। অতএব গাঢ়রূপে বিচার করিয়া দেখিলে মধুর রসে পূর্ব্বগত সমস্তরস পূর্ণরূপে পরিনাম প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যাইবে।

এই পঞ্চরসের ইতিহাস দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শান্তরস সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। যখন প্রাকৃতবস্তুতে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা সন্তুষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন,:সনন্দ, সনৎকুমার, নারদ, মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থবাদীরা প্রাকৃত জগতে নিস্পৃহ হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থিতিপূর্ব্বক শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাহার বহুকাল পর কপিপতি হনুমানে দাস্য রসের উদয় হয়; ক্রমশঃ ঐ দাস্যরস ব্যাপ্ত হইয়া এসিয়া মহাদেশের উত্তর পশ্চিমাংশে মোসেস নামক মহাপুরুষে সুন্দররূপে পরিদৃষ্ট হয়। কপিপতির বহুকাল পর উদ্ধব ও অর্জ্জুন ইঁহারা সখ্যরসের অধিকারী হন এবং ঐ রস জগতে প্রচার করেন। ক্রমশঃ ঐ দাস্য-রস ব্যাপ্ত হইয়া আরবদেশে মহম্মদ নামক ধর্ম্মবেত্তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাৎসল্য রস সময়ে সময়ে ভারতে ভিন্ন ভিন্ন আকারে উদয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যগত বাৎসল্যরস ভারত অতিক্রম করিয়া ইহুদীদিগের ধর্ম্মপ্রচারক যীশু নামক মহাপুরুষে উদিত হয়। মধুররসটি প্রথমে ব্রজধামেই জাজ্জ্বল্যমান হয়; বদ্ধজীবহৃদয়ে ঐ রসের প্রবেশ করা অতীব দুরূহ; কেন না উহা অধিকারপ্রাপ্ত শুদ্ধজীবনিষ্ঠ। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশচীনন্দন স্বদলসহকারে, ঐ নিগূঢ়-রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া মধুররস এ পর্য্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। অল্পদিন হইল নিউম্যান নামক পণ্ডিত ইংলণ্ডদেশে ঐ রসের কিয়ৎ পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তিরা এ পর্য্যন্ত যীশু-প্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্যের মাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত হন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরা ও ভগবৎ-ভাব-উদয়কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত যে সকল উন্নতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আলোচনাপূর্ব্বক তারকব্রহ্মনামের যুগে যুগে ভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। **সত্যযুগের** তারক ব্রহ্ম নাম—

"নারায়ণপরা বেদা নারায়নপরাক্ষরাঃ। নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ ॥

তাৎপর্য্য এই যে—বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরমগতি এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদ নারায়ণ। ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নাম নারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও পার্ষদসকল যে বর্ণিত আছেন, তাহাতে নারায়নরূপ ভগবদ্ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধশান্ত ও কিয়ৎপরিমানে দাস্যের উদয় দেখা যায়।

'রাম নারায়নানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥'

—এইটি **ত্রেতাযুগের** তারকব্রহ্ম নাম। ইহাতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত

নারায়ণের বিবিধ বিক্রমসকল সূচিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ দাস্যরসপর ও কিয়ৎ-পরিমাণে সখ্যের আভাস দান করিতেছে।

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥"

—এই **দ্বাপর যুগের** তারকব্রহ্ম নাম। ইহাতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য হয়। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই চারিটি রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—এইটি সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম-মন্ত্র বলিতে হইবে। ইহাতে প্রার্থনা নাই। মমতাযুক্ত সমস্তরসের উদ্দীপকতা ইহাতে দৃষ্ট হয়। ভগবানের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা যে পরমাত্মা-কর্ত্তৃক কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেমসূত্রে আকৃষ্ট আছেন, ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছে। অতএব মাধুর্য্য-রসপর জনগণের সম্বন্ধে এই নামটি একমাত্র মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার অনুক্ষণ আলোচনাই একমাত্র উপাসনা। সারগ্রাহী জনগণের ইজ্যা, ব্রত, অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলন, এই নামের অনুগত। ইহাতে দেশ-কাল-পাত্রের বিচার নাই। গুরূপদেশ, পুরশ্চরণ ইত্যাদি কিছুরই ইহাতে অপেক্ষা নাই। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটি মূলতত্ত্বের অবলম্বনপূর্ব্বক এই নাম-মন্ত্রের আশ্রয় করা সারগ্রাহী জনগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। জীবের প্রাকৃতদেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা অনুভূত হয় না। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই সেই তত্ত্ব জীবের মঙ্গলের জন্য প্রত্যগ্‌ভাবে এই জগতে উদয় করাইয়াছেন। প্রত্যগ্‌ভাবেই চিত্তত্ত্বের স্বপ্রকাশভাব। নামরূপ কলিকা স্বল্পস্ফুট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদি মনোহর চিন্ময়-রূপ বিকশিত হয়। পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণসৌরভ অনুভূত হয়। নাম-কুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টাকাল চিন্ময় নিত্যলীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতে উদিত হন। ইহা জীবের চরম সাধ্য ও সাধনা।

বিদেশীয় সারগ্রাহী জনেরা, যাঁহাদের ভাষা ও সাংসারিক আশ্রম ভিন্ন, তাঁহারা এই নামের সমান কোন সাঙ্কেতিক উপাসনালিঙ্গ নিজ নিজ ভাষায় গ্রহণপূর্ব্বক অবলম্বন করিতে পারেন। অর্থাৎ উপাসনাকাণ্ডে কোন অসরল বৈজ্ঞানিক বিচার, বৃথা তর্ক বা কোন অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারগত বাদ বা প্রার্থনাদি না থাকে। যদি কোন প্রার্থনা থাকে, তাহা কেবল প্রেমের উন্নতিসূচক হইলে দোষ নাই। অলম্পট-রূপে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক সন্তুষ্ট অন্তঃকরণে কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া সারগ্রাহী জনগণ বিচরণ করেন। যে সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে তাঁহারা তাঁহাদিগকে সমন্বয়যোগী বলিয়া জানেন। যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারসক্ত বলিয়া মনে করেন। কখন কখন ভগবৎবিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশীয় বিদেশীয় সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা, লিঙ্গ ও ব্যবহারসকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এইসকল লোকই পরমহংস এবং পারমহংস্য-সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদি তাঁহাদের শাস্ত্র। তাঁহারা যে কোন দেশে যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিতে পারেন।

যখন ধর্ম্মক্ষেত্রে বেদশাস্ত্রের দোহাই দিয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণার্থে প্রবল হিংসাবৃত্তির চরিতার্থের জন্য জীবহিংসাদি কার্য্য প্রবলভাবে চলিতে লাগিল তখন শাক্যসিংহ এই হিংসাবৃত্তি উৎপাটনার্থে ও বিকৃত বৈদিক-বিধির মূলোৎপাটনার্থে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

দর্শনঃ—ভারত-রচনার অনতিবিলম্বেই দর্শশাস্ত্র রচিত হয়। ভারতবর্ষে ছয় দর্শন প্রবলরূপে প্রচলিত আছে।

(১) ন্যায়, (২) সাংখ্য, (৩) পাতঞ্জল, (৪) কানাদ, (৫) পূর্ব্বমীমাংসা ও (৬) উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। সমস্ত দর্শনশাস্ত্রই বৌদ্ধমত প্রচারের পর উৎপন্ন হইয়াছে। দার্শনিক ঋষিগণ আদৌ সূত্ররূপে নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করেন। বৈদিকসূত্রসকল যেরূপ স্মরণের সাহায্যের জন্য উদ্ভূত হইয়াছিল, দার্শনিক সূত্রসকল সেরূপ নয়। ব্রাহ্মণেরা যখন বৌদ্ধদিগের প্রবল মতের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। তখন বেদ-শাস্ত্রের শিরোভাগ উপনিষদসকল প্রথমে রচনা করিয়া যুক্তি-সাহায্যে স্বমত-স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা ক্রমশঃ সৌগত মাধ্যমিক, যোগাচার প্রভৃতি স্বমতের দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা প্রথমে ন্যায়, পরে সাংখ্য ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে ছয়টি বিচারশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া সূত্ররূপে গ্রন্থরচনা পূর্ব্বক স্বশিষ্যেতর কাহারও হস্তে না পড়ে এইরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সময় হইতে 'আন্বিক্ষিকী বিদ্যারূপ' কোন বৈদিক ন্যায় তাৎকালিক গৌতম ঋষি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু আবশ্যকমতে ঐ সামান্য গ্রন্থের স্থলে ব্রাহ্মণেরা গৌতমের নামে বর্ত্তমান অক্ষপাদ রচনা করেন। সৌগত-মত-নিরসনার্থে গৌতম-সূত্রে যত্ন দেখা যায়। কাদানশাস্ত্র ন্যায়শাস্ত্রের অনুগত; সাংখ্যশাস্ত্রেও বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে অনেক সিদ্ধান্ত দেখা যায়। পাতঞ্জলমতটি সাংখ্যের অনুগত। জৈমিনীকৃত পূর্ব্বমীমাংসা বৌদ্ধনিরস্ত কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষসাধন-মাত্র। বেদান্ত-শাস্ত্র যদিও সকলের কনিষ্ঠ, তথাপি ইহার মূল উপনিষৎ বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় পূর্ব্বোল্লিখিত আন্বিক্ষিকী বিদ্যারই রূপান্তর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব দর্শনশাস্ত্রসমুদয়ই খ্রীষ্টের চারশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই খ্রীষ্টের চারশত বৎসর পর পর্য্যন্ত এই আটশত বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে।

বৌদ্ধদর্শনের নব সিদ্ধান্তঃ—বৌদ্ধমতে হীনায়ন ও মহায়ন দুই প্রকার পন্থা। সেই পন্থা গমনের প্রস্থানস্বরূপ নয়টি সিদ্ধান্ত—(১) বিশ্ব-অনাদি, অতএব ঈশ্বরশূন্য, (২) জগৎ-অসত্য (৩) অহংতত্ত্ব, (৪) জন্মজন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায়, (৬) নির্ব্বাণই পরমতত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধ-দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ মানব-রচিত (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদ্ধজীবন"। (শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা)

"জড়বাদীগণ যে পর্য্যন্ত জড়সুখকে 'আনন্দ' বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের মতে জড়ানন্দই সর্ব্বদা বিমৃগ্য। স্বার্থপর বা নিঃস্বার্থপর হইয়া জড়সুখই সাধন পূর্ব্বক তাহা সম্ভোগ করেন। জড়সুখ বাস্তবিক অকিঞ্চিৎকর, চিৎবস্তুর পক্ষে উপযুক্ত সহচর নহে। এতন্নিবন্ধন জড়বাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিবেকশক্তির দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহারা জড়সুখে কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। 'চিত্তত্ত্ব'ত' স্বাধীন নয় যে, তাহাতে কোন নিত্যসুখের অনুসন্ধান করিবেন। অতএব সহজেই জড়নির্ব্বাণকে 'সুখ' মনে করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া থাকেন। তখন বলেন যে, অস্তিত্বই ক্লেশ, অস্তিত্বের সমাপ্তিই সুখ, শরীর-ক্লেশ-সাধনপূর্ব্বক নির্ব্বাণসুখের অনুসন্ধান কর।

যে সময় ভারতবর্ষে নিরীশ্বরকর্ম্মবাদজনিত জড়ানন্দ মত অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন অপ্রাকৃত-তত্ত্ব পরিপূর্ণ বেদ শাস্ত্রকে কেবল ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া, নিরীশ্বর কর্ম্মবাদকে বৈদিকমত বলিয়া জড়বাদি-বিপ্রগণ সামান্য যজ্ঞাদির দ্বারা ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ ও মরণান্তে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরা ও অমৃত-সম্ভোগ-সুখ অন্বেষণ করিতেছিলেন; তখন জড়ানন্দে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শাক্যসিংহ একদা শারীরদুঃখের অপরিহার্য্যতা পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক নির্ব্বাণসুখসাধক বৌদ্ধবাদকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেও যে কেহ কেহ ঐ প্রকার নির্ব্বাণবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু শাক্যসিংহের সময় হইতে ঐ প্রকার বাদ বহুজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় তাহাকে আদি প্রচারক বলিয়া বৌদ্ধেরা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল শাক্যসিংহ নহে, তৎকালে বা তাহার পূর্ব্ব হইতে বৈশ্যকুলোদ্ভব 'জীন' নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধমতের সদৃশ আর একটি মতের প্রচার করেন। ঐ মতের নাম জৈন মত। জৈনমত ভারতেই আবদ্ধ আছে। বৌদ্ধমত পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চীন, তাতার, শ্যাম, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপিত হইয়া অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত

আছে। বৌদ্ধমতের অনেক শাখা হইয়াছে ; কিন্তু শূন্য বা জড়নির্ব্বাণবাদ বোধ হয় সকল শাখাতেই লক্ষিত হয়। মানবস্বভাব পরমেশ্বর ব্যতীত থাকিতে পারে না। অতএব বৌদ্ধমতের কতকগুলি শাখায় পরমেশ্বরও উপাসিত হইতেছেন। পরবর্ত্তী কালে নরস্বভাবজনিত নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী মতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বিকৃতভাবে আংশিকমতের আদর করিতেছে। এতন্নিবন্ধন কম্‌টী প্রচারিত বিশ্বপ্রীতি, জৈমিনী প্রচারিত নিরীশ্বরকর্ম্মান্তর্গত 'অপূর্ব্বরূপী ঈশ্বর' ও শাক্যসিংহ প্রচারিত 'জড়নির্ব্বাণ'-মতটি তত্তৎমতোপাসকগণ-কর্ত্তৃক স্বাভাবিক ধর্ম্মের আকারে পরিণত হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের সদৃশ একটি নির্ব্বাণবাদধর্ম্ম ইউরোপ-খণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মকে লোকে পেসিমিজম্ (Pessimism) বলে। পেসিমিজম্ ও বৌদ্ধধর্ম্মে আর কিছুই প্রভেদ নাই, কেবল একটি বিষয়ের প্রভেদ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে জীব জন্মজন্মান্তর ক্লেশ স্বীকার করতঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন জন্মে নির্ব্বাণবিধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ ও ক্রমশঃ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে। Pessimism মতে জীবের জন্মজন্মান্তর নাই। অতএব জড়নির্ব্বাণবাদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, (১) একজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদ। (২) বহুজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদ।

বৌদ্ধ ও জৈনমত দ্বিতীয়শ্রেণীগত। উভয় মতেই বহুজন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করতঃ শাক্যসিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব ও অবশেষে 'বুদ্ধ' হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরিনির্ব্বাণ লাভ করে। পরিনির্ব্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্ব্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—"অন্য সমস্ত সদ্‌গুণ দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যস্ত হইলে জীবের ক্রমগতি অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্ত্তীত্ব ও অবশেষে নির্ব্বাণগত ভগবত্ব লাভ হয়।" উভয় মতেই জড়জগৎ নিত্য। কর্ম্ম অনাদি কিন্তু অন্তবিশিষ্ট। অস্তিত্বই ক্লেশ ; পরিনির্ব্বাণই সুখ। জৈমিনি-প্রকাশিত বৈদিক কর্ম্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল। পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্ম্মবাদীর প্রভু বটে, কিন্তু নির্ব্বাণবাদীর লোক।

শপেনহুয়ার (Schopenhauer) এবং হার্টম্যান (Hartmann) প্রথমশ্রেণীর জড়নির্ব্বাণবাদী। শপেনহুয়ারের মতে অস্তিত্ব-বাসনাত্যাগ, উপবাস, স্বেচ্ছাধীন, ত্যাগ ও দৈন্য, শরীরক্লেশ স্বীকার, পবিত্রতা ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিলে নির্ব্বাণলাভ হয়। হার্টম্যানের মতে কোন ক্লেশ স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। মরণান্তে নির্ব্বাণ সহজেই সম্ভব। হারবেন্‌সান্ নামক একব্যক্তি ক্লেশকে নিত্য বলিয়া নির্ব্বাণের অসম্ভবতা দেখাইয়াছেন।

এইস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রচলিত অদ্বৈতবাদীর মধ্যে অনেকেই জড়নির্ব্বাণবাদী। যে সকল অদ্বৈতবাদীরা নির্ব্বাণান্তে ব্রহ্মানন্দের চিৎসুখ আশা করেন, তাঁহাদিগের মত পরে বিচারিত হইবে। যাঁহারা নির্ব্বাণান্তে অস্তিত্বের লোপ মানিয়া আর কোনপ্রকার আনন্দমাত্র স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে জড় নির্ব্বাণবাদী বলিয়া উক্ত হইল। জড়নির্ব্বাণবাদ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ; যেহেতু তাহাতে জীবের সত্তা যে কি, তাহা অনিশ্চিত থাকে। যদি জীব জড়োদ্ভূত হয়, তবে ঐ মত জড়ানন্দবাদীদিগের মতান্তর্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা নাস্তিকতা মাত্র। যদি জীব কোন স্বাধীনতত্ত্ব হয়, তবে তাহার লোপ কিরূপে হইবে? লোপ হওয়ার প্রমাণই বা কোথায়? ফলতঃ এই সকল মত নিতান্ত নিরীশ্বর। এই মত জড়কর্ম্মবাদীদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় প্রচারকদিগের চিত্তোত্তাপ ও অধ্যবসায়ক্রমে এতদূর প্রবলরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ও নিরীশ্বরকর্ম্মবাদ প্রচারক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণসকল অত্যন্ত উপদ্রুত হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা দলবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধমত ও বৈশ্যেরা দলবদ্ধ হইয়া জৈনমত প্রচার করেন। যখন সাংসারিক শত্রুতা দ্বারা কোন দলাদলি উত্তেজিত হয়, তখন তাহা অত্যন্ত প্রবলরূপে কার্য্য করিতে থাকে। ন্যায়ান্যায়-বিচার-রহিত হইয়া দলবদ্ধ লোকসকল তাহাতে যত্নবান্ হয়। এইরূপে ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারিত হয়। যে সকল দেশে ঐ মত নীত হইল, সে সব দেশে অধিকতর বিচারের

প্রাবল্য না থাকায় ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া গৃহীত হইল। আধুনিক ইউরোপীয় জড়নির্ব্বাণবাদীরা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক ঐ মতের প্রচার করিয়াছেন, ইহা ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে।

কোন কোন মতে 'মায়া'-নাম্নী অনাদি শক্তি সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন। সেই মায়া সূক্ষ্মস্বরূপা। তিনি চিত্তত্ত্ব ও অচিত্তত্ত্বস্বরূপ দুই তত্ত্ব প্রসব করেন। পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধবাদ প্রচলিত হইলে যখন ঐ মতের নিরসন প্রবৃত্ত প্রচারকদিগের অধ্যবসায় খর্ব্ব হইতে লাগিল, তখন ঐ মতকে নূতন নূতন আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইল। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ঐ সময় মায়াবাদরূপ একটি বাদের সৃষ্টি হয়। সেই মত বৌদ্ধধর্ম্মে 'বৌদ্ধ' নামেই অবস্থিতি করিল। কিন্তু বৌদ্ধেতর অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতরূপ মায়াবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। বেদার্থ সহকারে দার্শনিক আকারে ঐ মতটি যে সময় প্রচারিত হয়, তখন মায়াবাদি বৈদান্তিকদিগের কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু পার্ব্বতীয় দেশে ঐ মত ভিন্নাকারে তন্ত্রশাস্ত্রানুগত বলিয়া তন্ত্রাচার্যেরা মায়াশক্তিবাদ প্রচার করেন। অনেকে বলেন, যে, তান্ত্রিকমত কপিল দর্শন হইতে নিঃসৃত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। যদিও কপিলের মতে প্রকৃতি কর্ত্রী বটে, কিন্তু পুরুষ "পুষ্করপলাশবন্নির্লে'প"—এই বাক্য দ্বারা চিত্তত্ত্বের অনাদিত্বও স্বীকৃত হইতেছে। বস্তুতঃ শৈবমত কপিল-সাংখ্য নিঃসৃত। কিন্তু ঐ মতে প্রকৃতির বিশেষ সম্মান থাকায় অতত্ত্বজ্ঞ জনগণ কর্ত্তৃক ঐ মতকে তান্ত্রিকমতের সহিত ভুলক্রমে ঐক্য করা হইয়াছে। তন্ত্রমতে যদিও কোন কোন স্থলে চনকগত দুইটি বীজের সহিত পুরুষ-প্রকৃতির উপমা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ফলকালে প্রকৃতিকে চিত্তত্ত্বের প্রসবিত্রী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

জীবের প্রকৃতিনির্ব্বাণরূপ একটি নির্ব্বাণেরও কল্পনা করা হইয়াছে। জড়শক্তিবাদের মধ্যে কোন প্রকার আস্তিকতা লক্ষিত হয় না। চিচ্ছক্তিবাদিগণ যেরূপ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে চিত্তভাব আবেদন করেন, জড়শক্তিবাদীরাও তদ্রূপ চিচ্ছক্তিবাদীদিগকে বিদ্রূপ করিয়া জড়শক্তিকে সময়ে সময়ে আবেদন করিয়া থাকেন। দৃঢ় নাস্তিকবাদপরায়ণ ভনহলবেক জড়শক্তির প্রতি উক্তি করিয়াছেন :—

"হে প্রকৃতি, হে সমস্ত তত্ত্বের অধিশ্বরী, হে তদীয় সন্তান ধর্ম্মবুদ্ধি ও সত্য, তোমরা চিরকাল আমাদের রক্ষাকর্ত্তৃরূপে অবস্থিত হও। মানবসকল তোমাদের গুণগান করুক। হে প্রকৃতি দেবি, আমাদিগকে তোমার অভিপ্রেত সুখের পথ দেখাও। আমাদের মন হইতে ভ্রম দূর কর। অন্তঃকরণ হইতে দুষ্টতা দূর কর। আমাদের কার্য্যের ক্রমপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে আমাদের পদস্খলন রহিত কর। জ্ঞানকে রাজ্য করিতে দাও। আত্মাতে সততা বিস্তার কর এবং আমাদের হৃদয়ে শান্তিকে স্থান দাও"।

এই প্রকৃতিবাদী ভন হলবেকই কহিয়াছেন যে, আত্মা নাই, ঈশ্বর নাই ও পরলোক নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির সুখবর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। স্বভাবের শক্তিই সর্ব্বেশ্বরী।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব আদ্যাশক্তি কালীকে স্তব করিতেছেন,—

সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীঃ তমোরূপমগোচরম্। ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া ॥

"হে দেবী, সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি অগোচর তমোরূপী একা ছিলে। তোমা হইতে পরব্রহ্ম-ইচ্ছাক্রমে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে"। এস্থলে সাংখ্যদর্শন-প্রতিষ্ঠিত নির্লে'প পুরুষ ও ক্রিয়াবতী প্রকৃতিরূপ সাংখ্যমত হইতে এই তন্ত্রের মত নিরূপিত হইয়াছে, এরূপ স্থির করা যায়। পরে কথিত হইল যে,—

পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ। বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যতে ॥

"প্রলয়ান্তে তুমি তমোরূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাচাতীত ও মনের অগম্যভাবে একাই অবস্থিতি কর।"

ত্বমেব জীবলোকঽস্মিংস্ত্বং বিদ্যা পরদেবতা।

এই লোকে তুমিই জীব, তুমিই বিদ্যারূপা পরদেবতা। এস্থলে জীবচৈতন্য ও স্বভাবশক্তির ভেদ দেখা যায় না। ইহা সাংখ্যমত-বিরুদ্ধ।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা। তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥
কুর্ব্বানঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি। তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি ॥
জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা। জায়তে ক্ষীণতপসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্ ॥
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি। ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী। স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা ॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া। বিচার্য্যমানে ত্রিতয়ে আত্মৈবেকোঽবশিষ্যতে ॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ। বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥

যে পর্য্যন্ত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, তাবৎ মানবের মোক্ষ হয় না। অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া কর্ম্ম আচরণ করিলেও জ্ঞানোদয় হয় না, তত্ত্ববিচার ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নির্ম্মল আত্মা পণ্ডিতের মোক্ষ হয়। জপ, হোম ও শত শত উপবাস দ্বারা মুক্তি হয় না। কিন্তু 'আমি ব্রহ্ম' ইহা জানিলেই মোক্ষ হয়। যদি মানস-কল্পিত-মূর্ত্তি পূজা করিয়া মানবের মোক্ষ হইত, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারা মানবগণ রাজা হইত। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনের ভেদ কেবল মায়ার দ্বারা ঘটে। বিচার করিলে আত্মাই অবশেষে থাকেন। সেই ব্যক্তিই আত্মবিৎ—যিনি জ্ঞানকে চিদ্রূপ আত্মা বলিয়া, জ্ঞেয়কে চিন্ময় বলিয়া ও আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলিয়া জানেন।

বস্তুতঃ তন্ত্রসকলের মত নানা প্রকার। কোন একটি বিশেষ দর্শন হইতে যে তান্ত্রিক শক্তিবাদ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। একস্থলে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যত্র তাহা অস্বীকৃত ও নিরাকৃত হইয়াছে। কোনস্থলে পরব্রহ্মই সর্ব্বকর্ত্তা, কোনস্থলে প্রকৃতি, কোনস্থলে জীব। জীবকে কোনস্থলে মিথ্যা, কোনস্থলে সত্য, বলা হইয়াছে। কোনস্থলে নাদবিন্দু, কোনস্থলে প্রকৃতি, পুরুষ ও কোন স্থলে কেবল প্রকৃতিকে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে। ফল কথা এই,—তন্ত্রমত এরূপ গোলযোগ যে, তদ্বিষয়ে কোন নিয়মিত আলোচনা করা যায় না। 'সৃষ্টেরাদৌ' যে শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি একা ছিল, পরব্রহ্মের ইচ্ছায় তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিই বা কে? পরব্রহ্মই বা কে? যে জীবের জ্ঞান হইলে পরব্রহ্ম হয়, সে জীবই বা কে? "ত্বমেবজীবলোকেঽস্মিন্", এই শ্লোকে প্রকৃতিকেই জীব বলা হইল। ইহাতে কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। পরন্তু তন্ত্রসকলে যে সকল লতা-সাধন, পঞ্চ 'ম' কার সাধন, সুরা-সাধন প্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহা যে কোন আস্তিক দর্শন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না। নিরীশ্বর কর্ম্মের অপূর্ব্ব বা মন্ত্রাত্মক দেবতা এবং কম্‌টী প্রভৃতির কাল্পনিক প্রকৃতি পূজা ব্যতীত তান্ত্রিক শক্তিবাদকে আর কিছুই বলা যায় না।

কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি মানসিক ভাব ব্যতীত আর কিছুই মানেন না। তাঁহারা বলেন, বিষয় (objective world বস্তুতঃ নাই, ভাবই আছে। আত্মাকে যে ভাবের আশ্রয় (Subjective reality) বলি, তাহাও কার্য্যকর নয়। বাস্তবিক ভাব বই আর কিছুই নাই। Bishop Berkely প্রভৃতি কয়েকটি লোক এক প্রকার ভাববাদীর। এই ভাব-বাদের নাম Idealism বলিয়া তাহারা উক্তি করিয়াছেন। মিলেও (Mill) কিয়ৎপরিমাণে ভাববাদ স্বীকার করিয়াছেন। 'ভাববাদ' শব্দে 'চিদ্বাদ' মনে করা উচিত নয়। বিষয়-ধ্যানকে ভাব বলা যায়। ঐ বিষয়-ধ্যান বাস্তবিক জড় বিষয়ের মাত্রা-স্পর্শ মাত্র। জড়বিলক্ষণ কোন তত্ত্ব-বিশেষ নহে। মানবের মন যখন বিষয়কে অনুভব করিয়া বিষয়ের ছবি সংগ্রহ করেন, তখনই ভাবসকল উদিত হয়। অতএব ভাব-বাদ কখনই জড়বাদের অতীত নয়। অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর বা জগজ্জন কিছুই নাই। তত্তদ্ভাবই বিদ্যমান। ভাব নিত্য ও বিচিত্রস্বরূপ। ভাবের কখনই অভাব হয় না। ভাবই অদ্বয়-তত্ত্ব। এই মতটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। চিত্তের উন্মাদ অবস্থাই কেবল এইরূপ বিশ্বাস হইয়া উঠে। যাঁহারা ঐ মত গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা কদাপি

তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ভাবকে জড় সূক্ষ্ম বলিয়া উক্তি করিলে কোন দোষ হয় না। অতএব ভাববাদও জড়বাদমধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে।

কোন মতে এরূপ বিচার দেখা যায়,—"যাহাকে 'সৎ' বলিয়া উক্তি করা যায়, তাহা অনিত্য অর্থাৎ যাহার সত্তা আছে, তাহা অনিত্য। পরিণত বা নষ্ট হইলে অবশেষে অসৎ হইবে। অতএব অসৎই নিত্য ও সত্য"। এই মতটি নিতান্ত হাস্যজনক; যেহেতু ইহাতে সারমাত্র নাই। কেবল তর্কপ্রিয়তাবশতঃ কোন কোন মোহান্ধব্যক্তি এরূপ কূটতর্ক উপস্থিত করেন।

"অসৎ—সত্য"—এ কথাটী আদৌ উত্থানপরাহত পক্ষ। সাধারণ বোধগম্য বঙ্গভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ হয়—'নয়ই হয় এবং হয়ই নয়'। এইরূপ কূট তর্ক হইতে সন্দেহবাদরূপ একটি মতের উদয় হইয়াছে। এই মতটিকে Sceptisism বলে। হিউম প্রভৃতি কয়েকটি পণ্ডিত ঐমতের পোষকতা করিয়াছেন। সন্দেহবাদ যদিও স্বয়ং অসিদ্ধ পক্ষ ও অস্বাভাবিক, তথাপি কার্য্যবশতঃ ঐমত এককালে অনেকের আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জড়ানন্দবাদ ও জড়নির্ব্বাণবাদ জগতে এতদূর অনিষ্ট উৎপত্তি করে যে, মানবগণ তাহাদের নাম শুনিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছিলেন। নরস্বভাব পবিত্র ও ভক্তিভূষিত। কখনই জড়বাদে আনন্দপ্রাপ্ত হয় না। জড়বাদ যখন তাহার কঠিন লৌহময় শৃঙ্খলে যুক্তির হস্তপদ বাঁধিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিল, তখন যুক্তি স্বীয়-বলে ঐ শৃঙ্খল ছেদন করিবার যে শেষ চেষ্টা করে, তাহাই সন্দেহবাদ। জড়ই নিত্য সত্য, জড়ই সর্ব্বস্ব—এইরূপ স্থির হইল। অধ্যাপক Huxley যে মত বলিয়াছেন, তদ্রূপ অনেকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। "যে ঘটনাই হোক, সমস্তই জাড়ীয় হেতুপরিণতি না বলিলে বৈজ্ঞানিক হয় না। জড় ও কার্য্যকারণ ব্যতীত আর কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। অবশেষে চিং ও রাগ ইহারা শাস্ত্র হইতে দূরীকৃত হইবে। জড়ের ঢেউ ক্রমশঃ আত্মাকে ডুবাইবে, বিবির অকাট্য করকবল স্বাধীনতাকে বদ্ধ করিবে"। যে সময় বহুতর লোকে এইরূপ অসত্তর্ক করিতেছিল; নরস্বভাব নিজাবস্থার অধঃপাত দেখিতে পাইয়া তখন যুক্তিকে অন্যপথে চালাইতে চেষ্টা করিলেন। নূতন চেষ্টার যে কোন অশুভ ফল হউক না কেন, জড়বাদকে ধ্বংস করিতেই হইবে—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুক্তি তখন সন্দেহবাদকে প্রসব করিল; জড়বাদ-রূপ জঞ্জাল দূর হইল বটে, কিন্তু সন্দেহবাদ আস্তিকতার আরও বাঘাত করিতে লাগিল। লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল যে, আমরা বাস্তবিক সত্য দেখিতে পাই না। কেবল বস্তুর গুণসকল অনুভব করি। তাহাও যে ঠিক অনুভব করি, তাহারই বা প্রমাণ কি? ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা একটি একটি গুণ আমরা অনুভব করি। যথা—চক্ষুদ্বারা রূপ, কর্ণদ্বারা শব্দ, নাসিকাদ্বারা গন্ধ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ ও জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন। আমাদের পাঁচটি জ্ঞানদ্বারক্রমে যে বস্তুগুণসমষ্টি হৃদয়ঙ্গম হয়, তদ্দ্বারা আমাদের বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। যদি পাঁচটি ইন্দ্রিয় ব্যতীত আরও দশটি ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে আমরা ঐ জ্ঞানকে ভিন্নাকারে প্রাপ্ত হইতাম।

এস্থলে আমাদের যে কিছু জ্ঞান আছে, সকলই সন্দেহপূর্ণ। এরূপ সন্দেহবাদ দ্বারা জড়বাদ নষ্ট হইলেও চিদ্বাদের কোন উপকার হইল না। সন্দেহবাদ অসন্দিগ্ধরূপে বস্তুসত্তাকে স্বীকারপূর্ব্বক কেবল এইমাত্র বলে "সে বস্তু তত্ত্বতঃ আমরা অবগত নই, যেহেতু আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই ও তদ্রূপ জ্ঞানোপায়ও নাই।" সন্দেহবাদ আপনাকে আপনিই নাশ করে। যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধতত্ত্বের স্বীকার আছে। অসন্দিগ্ধতত্ত্ব থাকিলে আর সন্দেহবাদের মূল কোথায়? ভালরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধহয়, সন্দেহবাদ নিরর্থক প্রলাপ মাত্র। আমি আছি কিনা, এ সন্দেহ কে করিতেছে? আমিই করিতেছি। অতএব আমি আছি।

জড়বাদ বা জড়শক্তিবাদ, ভাববাদ ও সন্দেহবাদ এই তিনটি মতই পুরাতন, নাস্তিক মত। যতপ্রকার নাস্তিকবাদ হইতে পারে, সকলপ্রকার বাদই ইহার অন্তর্গত। বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নবীন নাস্তিকেরা যে সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতন মতপ্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, সে সকল

ভ্রমমাত্র। নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন। এতদ্দেশে বহুবিধ দার্শনিক মত প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসা—ইহারা প্রকাশ্যরূপে নাস্তিক। পাতঞ্জল ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ—ইহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকবাদী। ঐ সমস্ত মতের আলোচনা দেখিতে অনেকের বাসনা হইতে পারে, তজ্জন্য অতি সংক্ষেপে ঐ সকল মতের কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করা যাইতেছে।

সাংখ্য—কপিল প্রণীত পুরাতন দর্শন শাস্ত্র-বিশেষ। মহর্ষি কপিল ঐ শাস্ত্রে বলিয়াছেন—ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ।।১।।৯২।। অর্থাৎ ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না।

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ।।১।।৯৩।।

ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে মুক্ত বলিবে, নয় বদ্ধ বলিবে। তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই। এই স্থলে প্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু কহিলেন,—

'নন্বেবমীশ্বরপ্রতিপাদক-শ্রুতীনাং কা গতিস্তত্রাহ'-মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাস্যসিদ্ধস্য বা ।।১।।৯৬।।

মুক্তাত্মার প্রশংসা অথবা উপাসিদ্ধের প্রশংসার জন্যই ঐ প্রকার শ্রুতিসকল কথিত হইয়াছে। বাস্তবিক ঈশ্বর নাই। সাংখ্য এই পর্য্যন্ত।

ন্যায়—গৌতম প্রণীত। গৌতম বলেন,—

"প্রমান-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়বতর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতিনিগ্রহ-স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

গৌতমের নিঃশ্রেয়ঃ যে কি অবস্থা, তাহা উপলব্ধি হয় না। বোধ হয় যে, তর্কদ্বারা প্রবল হইতে পারিলেই জীবের শ্রেয়ঃ। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর স্থান পাইলেন না। এই জন্যই বেদ বলিয়াছেন,—

"নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া" ।।

গৌতম অপবর্গকে এই প্রকারে লক্ষিত করিয়াছেন ;—

"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"

সামান্যতঃ অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির নাম 'মুক্তি'ই এই সূত্রে লক্ষিত হইয়াছে। মুক্তিতে গৌতমের মতে কোন আনন্দ নাই, অতএব ঐশ্বরসুখ মাত্রেই নাই। অতএব গৌতমকৃত ন্যায়শাস্ত্র **বেদ-বিরুদ্ধ**।

বৈশেষিক দর্শন :—কণাদ-প্রণীত। এই দর্শনের অধিক বিচারের প্রয়োজন নাই। কণাদকৃত মূলসূত্রগুলি বিচার করিলে নিত্য ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঐ মতের কোন কোন গ্রন্থকারেরা সপ্ত পদার্থের মধ্যে দেহী পদার্থের অন্তর্গত একটী তত্ত্বকে পরমাত্মা বলিয়া নিজমতের নিরীশ্বরত্ব অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যাদি পণ্ডিতগণ নিজ নিজ বেদান্তসূত্রভাষ্যে ঐ কনাদমতকে অবৈদিক ও নিরীশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষেও দেখা যায় যে, ঈশ্বরকে যাঁহারা স্বাধীন কর্ত্তা বলিয়া স্থাপন করেন না, তাঁহাদের মতে 'ঈশ্বর' কথাটী থাকিলেও তাঁহারা নিরীশ্বর। ঈশ্বরের স্বভাব এই যে, তিনি সর্ব্বতত্ত্বের ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। যে মতে ঈশ্বরের তৎসম নিত্যবস্তু স্বীকৃত আছে, সেই মতটি নিরীশ্বর মত।

কর্ম্মমীমাংসার সূত্রকার—জৈমিনি। তিনি পরমেশ্বরের কথা উল্লেখ করেন না। আদৌ ধর্ম্মই তাঁহার বিষয়; তাঁহার মতে,—"চোদনা লক্ষণোঽর্থোঃ ধর্ম্মঃ। কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ"।

যে অর্থ বেদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। তাহার নাম কর্ম্ম। এই স্থলে তাঁহার ভাষ্যকার শবরস্বামী লিখিয়াছেন'—"কথং পুনারিদমবগমাতে? অস্তি তদপূর্ব্বম্" ।।

কিরূপে ইহার অবগতি হয়। অতএব 'অপূর্ব্ব' নামক তত্ত্ব অবশ্যই আছে। কর্ম্ম কৃত হইলে তদ্দ্বারা একটী "অপূর্ব্ব" উদিত হয়, তাহাই ফল প্রদান করে। ফলদাতা ঈশ্বরের কি আবশ্যক? কমটী প্রভৃতি আধুনিক নাস্তিকগণ এতদতিরিক্ত আর কি বলিতে সক্ষম হইয়াছেন?

বেদান্ত-শাস্ত্রটী সর্ব্বতোভাবে ভগবৎভক্তি প্রতিপদাক দর্শনশাস্ত্র। তাহার ভাষ্যে অসৎ-চিন্তকগণ অদ্বৈতবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতকে প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু সাধুলোকেরা বিশেষ যত্নসহকারে বেদান্তের সদ্ভাষ্য রচনা করতঃ জগজ্জনকে সুপথ দেখাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদের নৈরর্থক্য পরে আমরা আলোচনা করিব।

পাতঞ্জল-শাস্ত্রকে যোগশাস্ত্র বলে। উহা পতঞ্জলি ঋষি প্রণীত। ঐ শাস্ত্রের সাধনকাণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে ;—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সার্ব্বজ্ঞবীজম্। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"।

"ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশ্রয়—এই চারিটী উৎপাত দ্বারা অপরামৃষ্ট কোন পুরুষবিশেষের নাম 'ঈশ্বর'। তাঁহাতে অত্যন্ত সার্ব্বজ্ঞবীজ অবস্থিত। তিনি সমস্ত পূর্ব্বগত ব্যক্তিরও গুরু, যেহেতু কালকর্তৃক অনবচ্ছিন্ন।

এই প্রকার ঈশ্বরের বিষয় ঐ দর্শনে দৃষ্টি করিয়া অনেকেই মনে করেন যে, পতঞ্জলি যথার্থই একজন ভক্ত। কিন্তু পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্র যিনি বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তিনি আর ভ্রান্ত হইবেন না। কৈবল্যপাদে লিখিত আছে ;—

পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।

ভোজবৃত্তিতে এই সূত্রের এইরূপ অর্থ দেখা যায় ;—"চিচ্ছক্তের্ব্বৃত্তিসারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রেঽবস্থানং তৎ কৈবল্যমুচ্যতে।" চিচ্ছক্তির স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতির নাম 'কৈবল্য'। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, চিচ্ছক্তির কৈবল্যের অর্থ কি? অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের কোন কার্য্য থাকিবে কি না? জীব কৈবল্য লাভ করিলে সাধনদশায় ঈশ্বরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ থাকিবে? উক্ত শাস্ত্রে দুর্ভাগাবশতঃ এই প্রশ্নের উত্তর নাই। ঐ শাস্ত্রখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, সাধনকাণ্ডোক্ত ঈশ্বর কেবল উপাসনা-সিদ্ধির জন্য কল্পিত বস্তু-বিশেষ। সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে আর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত শাস্ত্র কি সেশ্বর, না নিরীশ্বর? এই সমস্ত নাস্তিকমত দেশে বিদেশে ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে।

যুক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি। শুদ্ধ আত্মার চিদালোচনা-প্রবৃত্তিকে 'শুদ্ধযুক্তি' বলা যায়। তাহা নির্দ্দোষ ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। জড়বদ্ধ আত্মার উক্ত স্বাভাবিকবৃত্তির জড়ভাবমিশ্র বিকারকে মিশ্রযুক্তি বলে। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র। তাহার অন্যতম নাম 'তর্ক'। ইহাই নিন্দনীয়। যেহেতু ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই কয়েকটী দোষ লক্ষিত হয়। ইহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র সদোষ। শুদ্ধযুক্তি যাহা নির্ণয় করে, তাহা সর্ব্বত্রই একই প্রকার। মিশ্রযুক্তি যে সমস্ত মত প্রসব করে, তাহা নানাপ্রকার ও পরস্পর বিবাদমান। এই সমস্ত মতে কার্য্য করিলে বদ্ধজীবের বদ্ধতাই ফলস্বরূপ লব্ধ হয়।

মিশ্রযুক্তি জড় হইতে জাত। আদৌ জড়বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জড়ীয় ছবি প্রাপ্ত হন, তাহা স্নায়বীয় প্রণালীদ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। তথায় স্মৃতিশক্তিদ্বারা সংরক্ষিত হইলে বদ্ধযুক্তি সেইসকল ছবির উপর কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে অনেক কল্পনা ও বিভাবনা উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত ছবিকে সজ্জীভূত করিয়া তাহাতে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, তাহাকে 'বিজ্ঞান' বলিয়া আখ্যা দেন। অনুলোম ও প্রতিলোম-প্রক্রিয়াদ্বারা ঐ সকল ছবি হইতে অন্যান্য সিদ্ধান্তরূপ রং বাহির করেন। তাহাকে যুক্তি বলেন। কমটী কহিলেন,—"যাহা লক্ষিত হইয়াছে তাহাকে সজ্জীভূত করিয়া রাখ ও তাহা হইতে সত্যানুসন্ধান কর"। এখন দেখা যাউক, যে-সকল ছবি কেবল জড়জগৎ হইতে আনীত হইল, তাহার উপর যে যুক্তি করা যায়, সেই যুক্তিকে জড়জাতা যুক্তি বলা যায় কিনা? জড়াতীত বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম কি প্রকারে ঐ প্রণালীতে জ্ঞাত হওয়া যাইবে? যদি জড়াতীত কোন বস্তু থাকে, তবে অবশ্য তদুপলব্ধির জন্য অন্য কোন তদুপযোগী প্রণালী থাকিবেই থাকিবে। যাঁহারা

ঐ উচ্চ প্রণালী অবগত নন বা কুসংস্কারবশতঃ জানিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা জড়াশ্রিত যুক্তিকে অবলম্বন করতঃ কেবলমাত্র প্রলাপবাক্যই বলিবেন সন্দেহ কি? যে স্থলে কেবল জড়ীয় জগতের অনুসন্ধানই কার্য্য হয়, সে স্থলে জড়াশ্রিতা যুক্তি সুষ্ঠুরূপে ফলপ্রদান করে। শিল্প, শারীরকর্ম্ম, যুদ্ধ, সঙ্গীত ইত্যাদি যত প্রকার জড়ীয় ব্যাপার আছে, তাহাতে উক্ত মিশ্রযুক্তি বিশেষরূপ কার্য্যকরী। আদৌ মিশ্রাযুক্তি জ্ঞানমিশ্রা ভাবে ঐ সকল বিষয়ের সঙ্কল্প করে, পরে কর্ম্মমিশ্রা ভাবে ঐ সকল ব্যাপার সম্পাদন করে। রেল-রোড্ ব্যাপারটী যখন কোন জড়ীয় পণ্ডিতের মনে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার যুক্তি জ্ঞানমিশ্রা। যখন উহা কার্য্যে পরিণত হইল, তখন যুক্তি কর্ম্মমিশ্রা হইয়া শিল্পকর্ম্মে প্রযুক্ত হইল। শিল্পাদি কর্ম্মই মিশ্রাযুক্তির প্রকৃত বিষয়, জড়াতীত তত্ত্ব তাহার বিষয় নয়, অতএব তাহাতে উহার যোজনা সম্ভব হয় না। জড়াতীত তত্ত্বে জড়াতীত যুক্তি কার্য্য করিতে সক্ষম। জড়বাদ, জড়শক্তিবাদ, জড়নির্ব্বাণবাদ, ভাববাদ—ইহারা জড়াতীত যে জগৎকারণ, তাহার সন্ধান করিবার জন্য জড়াশ্রিত যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। যেহেতু তাহাদের প্রণালী নিতান্ত হাস্যাস্পদ। তাহারা যত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সে সমুদয়ই প্রলাপমাত্র। আত্মা সর্ব্বত্র একজাতীয় তত্ত্ব হইলেও বিভিন্ন প্রকার মতবাদের প্রকাশ কেন হইতেছে? ইহার উত্তর এই যে, আত্মা বাস্তবিক বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ। স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া বিশুদ্ধ চিদাত্মার বিচার সর্ব্বত্র একই প্রকার হয়। কিন্তু যে জগতে আপাততঃ আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, সেই জগৎ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ আবাস নহে। ইহা প্রাকৃত অর্থাৎ মায়াপ্রকৃতিপ্রসূত। পরমতত্ত্বের যে পরাশক্তি, তাঁহার আভাসরূপা মায়াশক্তিই এই জগতের প্রসবিত্রী। জীবাত্মা এই জগতে অবস্থিত হইয়া মায়ার বিচিত্র ধর্ম্মকে 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করায় নিসর্গবশতঃ তাঁহার স্বভাব সঙ্কোচিত হইয়া মায়াগুণমিশ্রিত একটী ঔপাধিক ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। চিৎস্বরূপ জীব মায়িক ধর্ম্মে মিশ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া চিদ্‌গতবৃত্তি সকলকে ঔপাধিকভাবে পরিচালন করেন। চিদ্‌গতজ্ঞানবৃত্তি জড়সঙ্গ ক্রমে চিদ্‌জড়মিশ্র মনরূপে পরিণত হয়। অতএব মন মায়াবৈচিত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাভিমানী হইয়া যে সকল উত্তর প্রদান করে, তাহা নিসর্গতঃ বিচিত্র অর্থাৎ অনেক প্রকার। আত্মা জগতের যে প্রদেশে বাস করেন, সেই প্রদেশের যে সংসর্গজনিত ব্যবহার, আচার, পরিচ্ছদ, আহারাদি, ভাষা ও চিন্তা-প্রণালী, তদনুযায়ী প্রশ্নোত্তর প্রদত্ত হয়। অতএব দেশ, কাল ও পাত্রভেদে প্রকৃতি-বিচিত্রতা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। আদৌ আত্মার জড়সঙ্গক্রমে একটি মিশ্র ভাবগতচিত্রতা। দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশগত, ভাষাগত ও জাতিগত নানাবিধ চিত্রতা লক্ষিত হয়।

শুদ্ধযুক্তি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও জড়বদ্ধ আত্মা জড়ের ভারকে গুরুভার জানিয়া তাহাতেই অনুধ্যান করতঃ মিশ্রযুক্তিকে অধিক সম্মান করিয়া থাকেন। এ কারণ জগতের অধিক লোকই মিশ্রযুক্তির পক্ষপাতী। এতন্নিবন্ধন জড়াতীত শুদ্ধযুক্তি বিরল। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে অন্তর্ম্মুখবৃত্তিতে ভজন করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই কেবল শুদ্ধযুক্তি অর্থাৎ সহজ সমাধির মাহাত্ম্য অবগত। বহুকাল হইতে বহির্ম্মুখ জগৎ মিশ্রযুক্তিকে সম্মান করিয়া তাহার নিকট হইতে যাথার্থ্য লাভের আশা করিতেছিল। ঐ যুক্তি যতপ্রকার মত প্রচার করিল, তাহা প্রথমে আদর করিয়া গ্রহণ করতঃ অবশেষে তাহাতে সন্তোষ লাভ হয় নাই। যুক্তি শুদ্ধই হউক বা মিশ্রই হউক, আত্মার সহিত নিঃসম্বন্ধ হইতে পারে না। সময়ে সময়ে আত্মার উপকার করিতে যত্ন করে। চিত্রমতসমূহ প্রসব করিয়া নানাবিধ প্রলাপ করতঃ যখন মিশ্রযুক্তি সন্তোষলাভ না করিল, তখন আপনার প্রতি আপনার ঘৃণা জন্মিল। প্রলাপ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিল। বলিল,— হায়! আমি কতদূর বহির্ম্মুখ কার্য্য করিয়া আমার নিত্য-সম্বন্ধী আত্মা হইতে দূরে পড়িয়া স্বভাব ত্যাগ করিতেছি। তখন এই প্রকার রোদন করিতে করিতে ভয়াতুরা হইয়া চরমে পরমেশ্বরকে সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করে। নর-মন ঐ অবস্থায় দেশে-বিদেশে যুক্তিস্থাপিত ঈশ্বরকে প্রচার করিয়া থাকে।

উদয়নাচার্য্য ঐ অবস্থায় কুসুমাঞ্জলি-গ্রন্থ রচনা করেন। বিলাতে শুষ্ক ঈশ্বরবাদ Deism এবং Natural Theology বলিয়া যে সকল মত নিঃসৃত হয়, তাহা মানবগণের উক্ত অবস্থাক্রমে অনুমোদিত হয় বলিয়া জানিতে হইবে। মিশ্রযুক্তির দ্বারা যে ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপিত হয়, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও উক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে অস্বাভাবিক অসম্পূর্ণ, যেহেতু জড়সম্বন্ধী যুক্তি যে ঈশ্বরভাব আনয়ন করে, তাহা কেবল জড়ের কারণরূপ ক্ষুদ্রভাববিশেষ। অস্বাভাবিক, যেহেতু তাহাতে প্রকৃত আত্মোন্নতি নাই, আত্মার সাক্ষাৎ চালনা বা বিষয়ালোচনা নাই।

সেই প্রলাপিনী মিশ্রাযুক্তি পরমেশ্বর স্বীকার করিয়াও জড়ভ্রমবশতঃ পরমেশ্বরের একত্ব সংস্থাপন অক্ষম হয়। কোন সময়ে সে দুইটী তত্ত্বকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। তখন তাহার বিবেচনায় চিৎতত্ত্ব একটী ঈশ্বর ও জড়তত্ত্ব একটী ঈশ্বর হয়। চিত্তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত মঙ্গলজনক। জড়তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত অশুভের আকর। জরদ্বস্থ নামক কোন পণ্ডিত অসৎ ও সদীশ্বর—এইরূপ দুইটী ঈশ্বরের নিত্যত্ব স্বীকার করতঃ জেন্দাভেস্তা নামক গ্রন্থে ঈশ্বরতত্ত্বের দ্বৈত স্বীকার করেন। পরমেশ্বরপরায়ন লোকসকল তাঁহাকে জরমীমাংসক বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন; এমন কি,ঐ উপাধি পরে কর্ম্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয় সমস্ত বহির্ম্মুখলোক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। জরদ্বস্থ অত্যন্ত প্রাচীন পণ্ডিত। ভারতবর্ষে তাঁহার মত আদৃত না হওয়ায় ইরাণদেশে তিনি মতপ্রচারে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার মতটী সংক্রামক হইয়া 'জু' দিগের ধর্ম্মে ও শেষে কোরাণ-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের সমকক্ষ একটী সয়তানের উৎপত্তি করে। যে সময়ে জরদ্বস্থ দুই ঈশ্বরবিষয়ক মত প্রচার করিতেছিল, সেই সময়েই জু দিগের মধ্যে তিনটী ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত লইলে Trinity মত উৎপন্ন হইয়া পড়ে। আদৌ Trinity মতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর কল্পিত হয়, পরে যখনপণ্ডিতগন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন ঈশ্বর, হোলিঘোষ্ট ও খ্রীষ্ট এই তিনটী তত্ত্ব বিচার দ্বারা তাহার যুক্ত মীমাংসা বাহির করিলেন। যে কালে বা যে সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইহাদিগকে পৃথক দেবতা বলিয়া কল্পনা হয়, সে সময় ভারতেও তিনটী ঈশ্বর-বিশ্বাস-রূপ একটী অনর্থ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ ঐ তিন দেবতার তাত্ত্বিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলে ভেদনিষেধক উপদেশ করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেশে বহুদেবতার বিশ্বাস দেখা যায়। বিশেষতঃ অত্যন্ত অসভ্য প্রদেশে একেশ্বরবাদ বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয় না। কোন সময়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগনকে পরস্পর স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার ব্যবহার ছিল। মীমাংসকেরা ঐ মতকে পরে সংশোধিত করিয়া একটী ব্রহ্মকে সংস্থাপন করেন। এ সমস্তইজড়ভ্রান্ত যুক্তির প্রলাপমাত্র। পরমেশ্বর—একতত্ত্ব। অধিক হইলে কদাচ সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইত না। ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বিধি পরস্পর বিবাদমান হইয়া সংসারকে উৎসন্ন করিত সন্দেহ নাই। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যে এক পুরুষের ইচ্ছা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা কোন বিবেকীলোক অস্বীকার করিতে পারেন না।

আত্মার সহজ-জ্ঞানজনিত যে যুক্তি; তাহাই শুদ্ধ ও নির্দ্দোষ। তৎকর্ত্তৃক যে তত্ত্বমীমাংসা, তাহাই যথার্থ। সাহজিক জ্ঞানকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুক্তি থাকিতে পারে না। তবে যে বিষয়জ্ঞান-সংসৃষ্ট যুক্তি আমরা বিষয়কার্য্যে লক্ষ্য করি, তাহা অশুদ্ধ বা মিশ্র। মিশ্রযুক্তি যে সমস্ত তত্ত্বকথা বলিয়া থাকে, সে সমুদয়ই অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বর নিরূপণ করিলেও তাহার মীমাংসা সুন্দর হয় না। পরমতত্ত্বে মিশ্রযুক্তির যোজনা নাই। শুদ্ধযুক্তি সাহজিক জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক পরমতত্ত্ববিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্ত করে, সে সমুদয় যথার্থ। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সাহজিক জ্ঞান কাহাকে বলি ? আত্মা—চিন্ময়, অতএব জ্ঞানময়। তাহাতে স্বাভাবিক যে জ্ঞান আছে, তাহার নাম সহজজ্ঞান। সহজজ্ঞান আত্মার সহিত নিত্য জাত। কোন জড়ীয় উপলব্ধিক্রমে জন্মে না। সেই সহজ-জ্ঞানের কোন প্রক্রিয়ার নাম শুদ্ধযুক্তি। সহজজ্ঞানের পরিচয় এই যে, বিষয়জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে জীবের এই কয়টী উপলব্ধি প্রতীত হয়। (১) আমি আছি, (২) আমি থাকিব, (৩) আমার আনন্দ আছে, (৪) আমার আনন্দের একটী বৃহদাশ্রয় আছে; (৫) সেই আশ্রয় অবলম্বন করা আমার স্বভাব; (৬) আমি সেই

আশ্রয়ের নিত্য অনুগত, (৭) আশ্রয় অত্যন্ত সুন্দর, (৮) সেই আশ্রয় ত্যাগ করিবার আমার শক্তি নাই, (৯) আমার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়, (১০) শোচনীয় অবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় আশ্রয়ানুশীলন করাই আমার উচিত, (১১) এ জগৎ আমার নিত্য স্থান নয় এবং (১২) এ জগতের উন্নতিতে আমার নিত্য উন্নতি নাই। এবম্বিধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বন না করিলে যুক্তি জড়মিশ্রা হইয়া কেবলমাত্র প্রলাপ করিতে থাকে। যুক্তি বিষয়সংশ্রবে যে সকল বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে, সেই সকল বিজ্ঞানেও প্রথমে কয়েকটী সহজ-জ্ঞান মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। অঙ্কবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রথমে কতকগুলি কথা মানিয়া না লইলে কোন বিদ্যারই উন্নতি করিতে পারে না। পরমার্থতত্ত্বে সেইরূপ কতকগুলি সহজ সন্দেশ স্বীকারপূর্ব্বক যে ধর্ম্মের সংস্থাপন করা যায়, তাহাই সত্যমূলক হয়।

একদল লোক আছে, যাহারা শুদ্ধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক নিজমত স্থির করিতে পারে না, অথচ যুক্তিকে সর্ব্বত্র বিশ্বাস করে না। তাহারা কতকটা সাহজিক জ্ঞানকে স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে এক তত্ত্ব বলিয়া মানে। জ্ঞানাবিষ্ট হইয়া সমাধি অবলম্বন করে। সে সমাধি সহজ সমাধি নয়, যেহেতু তাহাতে কূট চিন্তা লক্ষিত হয়। কূট চিন্তাদ্বারা তাহারা স্থূল জগৎকে ভেদ করিয়াও চিজ্জগৎ দৃষ্টি করিতে পারে না; কেন না, সহজ সমাধি ব্যতীত সহজতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। তাহারা লিঙ্গজগৎকে লক্ষ্য করিয়া 'জীবের চরম আবাস দেখিয়াছি' এইরূপ বোধ করে। বাস্তবিক তাহারা জড় জগতের লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। লিঙ্গজগৎ ও জড়জগতে ভেদ এই যে, জড়জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লিঙ্গজগৎ মানসগ্রাহ্য। লিঙ্গজগৎটী জড়জগতের সূক্ষ্ম প্রাগ্‌ভাবমাত্র। জড়জগৎ দুই প্রকার অর্থাৎ অত্যন্ত স্থূল জড়ময় জগৎ ও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়। Theosophist দল যে Astral দেহের কথা বলে তাহা জ্যোতির্ম্ময় জড়দেহ। তদপেক্ষা লিঙ্গদেহ আরও সূক্ষ্ম অর্থাৎ মনোময়। পাতঞ্জল শাস্ত্রের ও বৌদ্ধ-যোগীদিগের মতে যে সূক্ষ্ম বিভূতিময় জগৎ, তাহাই লিঙ্গজগৎ। চিত্তত্ত্ব এ সমুদয় হইতে বিলক্ষণ। পাতঞ্জলশাস্ত্রে **কৈবল্য** অবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা **স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাবমাত্র**। কিন্তু কোন চিত্তত্ত্বের আলোচনা তাহাতে লক্ষিত হয় না। সাধনপাদে যে ঈশ্বরের সহিত জীবের সাক্ষাৎকার হয়, কৈবল্যপাদে সে ঈশ্বর কোথায় বা কি অবস্থায় রহিলেন ও কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যদি কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবসমুদয় সেই ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য লাভ করে, তবে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈতবাদ হইল। যোগশাস্ত্র, থিয়সফিই হউক বা পাতঞ্জলাদি যতই হউক, জীবের নিত্য কল্যাণকর নহে। নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে সকল অবান্তর অবস্থা আছে, যোগশাস্ত্র তন্মধ্যে একটি অবান্তর পদ। অতএব তাহাতে চিৎসুখ অন্বেষণকারী জীবের কোন প্রকার আনন্দ হয় না।

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই বিশ্ব পরমেশ্বর আমাদের ভোগের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নিষ্পাপ-রূপে এই জগৎ ভোগ করিতে করিতে আমরা ধর্ম্ম অর্জ্জন করিলে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করি। ইহাতে বিতর্ক এই যে জীবের সুখপ্রাপ্তির জন্য যদি এই বিশ্ব নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর এই বিশ্বকে এতদূর অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করিতেন না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সিদ্ধসঙ্কল্প। যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহা অবিলম্বে হয়। এই বিশ্ব জীবের ভোগের জন্য সৃষ্ট হওয়া মনে করিলে ঈশ্বরে দোষারোপ করিতে হয়। যদি ধর্ম্মশিক্ষার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলেও বিশ্ব কিছু বিভিন্নাকারে হইত সন্দেহ নাই। কেন না, এ অবস্থায় বিশ্বে সকলেরই ধর্ম্মলাভ হয় না।

এই নৈতিক একেশ্বরবাদের দোষাদোষ চিন্তা করিয়া কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবের পক্ষে এই বিশ্ব বিশুদ্ধ সুখলাভের স্থান নহে; বরং এখানে দুঃখই অধিক। বিশ্বকে জীবের দণ্ডাগার বলিয়া অনুমান হয়। অপরাধ হইলেই দণ্ড, নতুবা দণ্ডের প্রয়োজন কি? জীব কি অপরাধ করিয়াছে? এই প্রশ্নের সদুত্তরে অশক্ত হইয়া সঙ্কীর্ণবুদ্ধিপ্রসূত ধর্ম্মসকলে একটী অদ্ভুত মত গৃহীত হইয়াছে; তাহা এই,—

ঈশ্বর কোন আদি জীবকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে কোন সুখময় বনে সস্ত্রীক হইয়া থাকিতে দিলেন। জ্ঞানবৃক্ষে ফল ভক্ষণে নিষেধ করিলেন। কোন দুর্গত জীবের কুপরামর্শে ঐ আদি-দম্পতি জ্ঞানবৃক্ষফল সেবন করি ঈশ্বরাজ্ঞা অবহেলাপরাধে সেই স্থানচ্যুত হইয়া ক্লেশময় বিশ্বে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের অপরা এই সমস্ত জীব অপরাধী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, জীবকর্ত্তৃক সেই অপরাধ ক্ষয়িত হইতে পারিল না দেখি ঈশ্বরের একাঙ্গ স্বরূপ একটী তত্ত্ব জীবসদৃশ হইয়া মানবমধ্যে জন্মগ্রহণ করতঃ সকল অনুগত জীবের পাপ নিজস্ক লইয়া তিনি মৃত্যু স্বীকার করিলেন। যে সকল জীব তাঁহার অনুগত হইল, তাহারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করি যাহারা অনুগত হইল না, তাহারা চিরনরকে নিপতিত হইল। জীবভূত বিভুর দণ্ডের দ্বারা অন্য জীবের নিষ্কৃ এই মতটী সহজবুদ্ধিতে আয়ত্ত করা যায় না। এই মতবাদমিশ্র ধর্ম্মে আস্থা করিতে গেলে কয়েকটী অদ্ভু কথা বিশ্বাস করিতে হয়। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্তই জীবতত্ত্ব। জন্মের পূর্ব্বে জীব ছিল না এবং মরণান্তে আর জীবের কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিতি নাই। আবার জীব বলিলে মানব বই আর কেহ লক্ষিত হয় না। এ বিশ্বাসটী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ প্রজ্ঞার পরিচয়। জীব একটী চিন্ময়তত্ত্ব হয় না। জড়েই ঘটনাক্রমে বা ঈশ্বরে ইচ্ছাক্রমে তাহার সৃষ্টি কল্পনা করিতে হয়। কেনই বা অসমান অবস্থায় জীবের উদয় হয়, তাহাও বলা যায় না কোন ব্যক্তি দুঃখীর ঘরে, কেহ সুখীর ঘরে, কোন ব্যক্তি ভক্তের ঘরে কেহ বা অসুরপ্রায় অভক্তের ঘ জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসুবিধাক্রমে সৎ ও জন্মঅসুবিধাক্রমে অসৎ হইতে বাধ্য হন, বলা যায় না। ইহাতে ঈশ্বর অবিবেচক বলিতে হয়। আবার পশুগণ জীবমধ্যে কেনই যে পরিগণিত না হয়, তাহাও বলা যায় না পশুপক্ষী যে মানবের খাদ্য বস্তু হইবে, ইহাই বা কেন? একজন্মে মানব যাহা করিলেন, তদ্দ্বারাই যে তাঁহা চিরস্বর্গ বা চিরনরক হইবে, এ বিশ্বাসও দয়াময় ঈশ্বরানুগত লোকের পক্ষে নিতান্ত অগ্রাহ্য। যে সম্প্র এই মতে স্থিত হন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ ভজন করিতে পারেন না। তাঁহাদের সাধারণ মত এ হয় যে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক বিশ্বোন্নতি চেষ্টা দ্বারা কর্ত্তব্যবোধে ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিতে হ চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও ইষ্টপূর্ত্ত-ক্রিয়া দ্বারা জগতের মঙ্গলবিধান করিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। কর্ম্মচর্চ্চা জ্ঞানচর্চ্চাই তাহাদের মধ্যে প্রবল, কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞানচেষ্টারহিত শুদ্ধভক্তি তাঁহারা কখনই জানিতে পারেন ন কর্ত্তব্যজ্ঞানে ঈশ্বরভজন কখনই নিঃস্বার্থ বা স্বাভাবিক হয় না। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন; অতএ আমরা তাঁহার ভজন করিব, এই বুদ্ধি নিকৃষ্ট; কেন না ইহার প্রকারান্তর এই হয় যে, ঈশ্বর যদি দয়া না করিতে আমি তাঁহাকে ভজিতাম না। ভাবী দয়া করিবেন, এইরূপ দুষ্ট আশাও থাকে। দয়া এস্থলে যদি ভক্তি দান হয়, তাহা হইলে দোষ হয় না। এধর্ম্মে সে কথা দেখা যায় না। দয়া এখানে জীবনযাত্রার যে সুবি ও সুখদান, তাহাই লক্ষ্য করে। এই মতে এবং এই মতের অনুগত অন্যান্য নবীন মতে ঈশ্বর নিরাকার সর্ব্বব্যাপী। জ্ঞানানুশীলনই এই মতের একটি প্রধান কর্ম্ম। ঈশ্বরকে সাকার বলিলে তাঁহার খর্ব্বতা হয়—এ জ্ঞানগত বুদ্ধি তাহাদের চিত্তকে সর্ব্বদা ব্যস্ত করে। ঈশ্বরকে আমরা জ্ঞানমার্গে যেরূপ নিরাকার ও সর্ব্বব্যা করিয়া প্রস্তুত করিতেছি, তিনি তাহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। বস্তুতঃ এই মার্গের সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরভাব অত্যন্ত জড়কুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। জড়ে যে আকাশ আছে, তাহা সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার। ইঁহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড়ভজন। চব্বিশ তত্ত্বের অতীত যে জীবাত্ম তাহা হইতে অনন্তগুণে গুণিত যে অপ্রাকৃত সবিশেষ-স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত অথচ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষাদি বিরুদ্ধগুণে অধিপতি পরম কারুণিক জীববন্ধুস্বরূপ যে ভগবান্ পরমেশ্বর, তাঁহাকে এই মতবাদীরা কখনই সুন্দররূপে উপল করিতে সক্ষম হয় না। এই মতবাদিগণের ঈশ্বর-আরাধনাও নিতান্ত সদোষ ও অসম্পূর্ণ। প্রার্থনা ও বন্দনা মাত্র উপাসনা। প্রার্থনা ও বন্দনাতে যে সকল কথা ব্যবহৃত হয়, তাহাও নিতান্ত প্রাকৃত। জ্ঞানচর্চ্চার ক্রীতদাস হই ইহারা অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহোপাসনায় অত্যন্ত ভীত হন। এমন কি, ব্যতিব্যস্ত হইয়া অন্যান্য লোককে এ

পরামর্শ দেন যে, কখনও চিন্ময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিও না। মূর্ত্তি ভাবিলেই ভূতপূজক হইয়া পড়িবে। এই দুরাগ্রহক্রমে তাঁহারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বিশেষ অনুভব করিতে অক্ষম হন। ইঁহারা প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান। গুরুপাদাশ্রয় করিলে পাছে কুশিক্ষা হয়, এই ভয়ে সদ্‌গুরুলাভের যত্ন ও তদ্রূপ, গুরু পাইলেও তাঁহাকে ভক্তি করেন না। অসদ্‌গুরুগণ কুপথগামী করেন বলিয়া সদ্‌গুরু পর্য্যন্ত ইহাঁদের পরিত্যাজ্য হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সত্যতত্ত্ব যখন আত্মায় নিহিত আছে, তখন নিজ চেষ্টার দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, অতএব গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, প্রধানাচার্য্য বরণ করিলেই যথেষ্ট। প্রধানাচার্য্যই ঈশ্বর, গুরু ও ত্রাণকর্ত্তা। তিনি আমাদের স্বরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের পাপাশয় ধ্বংস করেন, অন্য মনুষ্যগুরুর প্রয়োজনাভাব। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন একখানি গ্রন্থসংগ্রহকে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানেন। কেহ বা ধর্ম্মগ্রন্থ মানিতে গেলে অনেক ভ্রম মানিতে হয়, এই ভয়ে গ্রন্থমাত্রকেই মানেন না। এই মতে একটী ঈশ্বর হইলেও এইমত অনেকস্থলে অসমঞ্জস, ঈশ্বরের বৈষম্যদোষপূর্ণ এবং ঈশোন্মুখ জীবের পক্ষে তুচ্ছ। ঈশ্বর একজন বটে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র আর একটী পাপময় প্রকাণ্ড স্বত্বকে স্বীকার করা হয়। আবার যাঁহারা ঐ প্রকাণ্ড স্বত্বকে ছাড়িয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের মায়াশক্তিকে অনুভব করিতে না পারিয়া জীবের দৌর্ব্বল্যমধ্যে পাপসৃষ্টি লক্ষ্য করেন। পাপসকল জীবের দৌর্ব্বল্য হইতেই হয় বটে, কিন্তু অনাদি কর্ম্মমার্গের পাপপুণ্য বিচার ত্যাগ করিলে জীবের দৌর্ব্বল্যবিধান জন্য ঈশ্বরকেই দোষী হইতে হয়। ইহারা মুখে ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ বলেন; কিন্তু কার্য্যে সমস্ত দোষ ঈশ্বরের উপর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। জীবের শুদ্ধ চিত্তত্ত্ব, জড়গতলিঙ্গ ও স্থূলতত্ত্বকে যথাযথ পৃথক করিয়া ইহাঁরা বুঝিতে পারেন না। ইহাঁদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ই দূষিত ও কুণ্ঠিত। এইজন্য জীবের স্বরূপ ও তদঙ্গ ইহারা কোনক্রমেই বুঝিতে পারেন না। জড়বিজ্ঞানের গর্ব্বে ইহাদের চিদ্‌বিজ্ঞান নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া থাকে, যে ফল ইহারা সাধন করেন, তাহাও তুচ্ছ। লিঙ্গতত্ত্বগত স্বর্গলাভই ইহাদের চরম। লিঙ্গকেই ইহারা চিত্তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। এজন্যই ইহারা মন ও আত্মাকে পৃথক করিয়া বুঝিতে পারেন না।

বহুদিন হইতে 'অদ্বৈতবাদ' নামক একটী বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটী উদিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত কয়েকটী পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিকরূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ এই যে,—ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, আর বস্তন্তর নাই বা হয় নাই। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এইরূপ পৃথক্ ভাবসকল ব্যবহারিক বুদ্ধির ফল, বস্তুতঃ ব্রহ্মই সমস্ত পরিদৃশ্য তত্ত্বের অবিকৃত মূল। সেই ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। তাহাতে কিছুমাত্র উপাধি নাই। কোনপ্রকার শক্তি নাই এবং কোন প্রকার কার্য্য নাই। ব্রহ্মের অবস্থান্তর বা পরিণাম নাই। এই সমস্ত বাক্য বেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদিগণ এই সকল কথা অনায়াসে বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু সবিশেষ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তদ্রূপ ব্রহ্ম কিরূপে জগতের কারণ হইতে পারেন? জগৎও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কোথা হইতে জগৎ আসিল। ইহার মীমাংসা না করিতে পারিলে আমাদের উপাদেয় মত বজায় থাকিতে পারে না। তখন চিন্তা করিতে করিতে কতই বিচার উঠিতে লাগিল। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কি করিয়া কার্য্যশক্তি স্বীকার করা যায়? আবার আর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া অদ্বৈত-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়। বিচার করিতে করিতে প্রথমে স্থির করিলেন যে, ব্রহ্মে একটুকু পরিণামশক্তি থাকিলে বোধ হয় অদ্বৈতহানি হইবে না। ব্রহ্মই বস্তুপরিণাম। তাহার প্রতীতি হইতে পারে।

একমতে পরিণাম মানাই স্থির হইল। তখন আর একটী অদ্বৈতবাদী বলিলেন—ব্রহ্মের দোষ স্বীকার

করা উচিৎ নয়। ব্রহ্মকে পরিণামী বলিলে তাহার ব্রহ্মতা বজায় থাকিবে না। পরিণামবাদ দূর করিয়া বিবর্ত্তবাদ গ্রহণ কর। ব্রহ্মের অবস্থান্তর নাই। অতএব পরিণাম অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের স্থিতিমান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভাবস্থলে অন্যথাবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত-প্রতীতি মানিলে আমাদের মতটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইতে ভয়াদি বিচিত্রতা হয়। শুক্তিতে রজতজ্ঞানে আশাদি বিচিত্রতা দেখিতে পাই। অতএব বিবর্ত্ত মানিলে আর ব্রহ্মেও দোষ হয় না, এবং জগৎ যে মিথ্যা, কেবল অজ্ঞান প্রতীতিমাত্র সিদ্ধ হয়। জগৎ নাই, জীব নাই। ব্রহ্ম আছেন এবং জগৎপ্রতীতির একটী ভাণ মাত্র আছে। ঐ ভাণকে বিশেষরূপে বুঝিতে গিয়া তাহার নাম 'অবিদ্যা', 'মায়া' ইত্যাদি অভিধানে পাওয়া গেল। ভাণ কখনই তত্ত্বান্তর নয়, অতএব বস্তু একই রহিল, অধিক হইল না। বস্তু পারমার্থিক ও ভাণ ব্যবহারিক, ইহাই স্থির হইল। ব্যবহারিক বুদ্ধি পারমার্থিক জ্ঞানকর্ত্তৃক পরাজিত হই.ল এক বস্তুসিদ্ধির সহিত ব্যবহারিক ভাণ বিনিষ্ট হইয়া যায় এবং মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

তখন আর একদল পণ্ডিত উঠিয়া ভাণপ্রবল মতকে তত তাত্ত্বিক মনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন,—জগৎটা স্বতঃসিদ্ধ, ভাণ নয়। জীবরূপ অন্য একপ্রকার ভাণকে অবলম্বন করিয়া জগদ্রূপ ভাণের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব তবে কি পৃথক্ তত্ত্ব? তাহাও নয়। তাহা বলিলে অদ্বৈতহানি হইবে। জীবই ভাণ। ঐ পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী মত স্থির করিলেন। একদল বলিলেন, মহাকাশ ব্রহ্ম ও জীব অবিদ্যা-পরিচ্ছেদ দ্বারা ঘটাকাশরূপে পৃথক প্রতীত হন। অন্যদল তাহাতে এই প্রতিবাদ করেন যে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিব্রত করা হইবে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অংশ পরিচ্ছিন্ন করিয়া মায়ার বশীভূত করিতে হইবে। তাহা না করিয়া জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার কর। রৌদ্রের প্রতিফলন বা জলচন্দ্রের ন্যায় জীবকে কল্পনা কর। জীব অবিদ্যাময় মিথ্যাতত্ত্ব হইয়াও অবিদ্যার ধর্ম্মক্রমে প্রাধানিক জগৎকে কল্পনা করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। জীব পৃথক্ নয়, জগৎও পৃথক তত্ত্ব নয়। এই সমস্ত মতের ভিতরে একটা মহাপ্রমাদ আছে. তাহা মতবাদান্ধকারাচ্ছন্ন পণ্ডিতগণ দেখিতে পান না ও দেখিতে চান না। প্রমাদটী এই যে—ব্রহ্ম অদ্বিতীয় তত্ত্ব এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নাই। যে পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি স্বীকার না করা যায়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মীমাংসাই অকিঞ্চিৎকর হয়। একজন মায়া, একজন অবিদ্যা, একজন ভাণ, আর একজন ভাণের ভাণ মানিয়া কিরূপে নিঃশক্তি ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন? এই সমস্ত মতে অবশ্যই অদ্বৈতহানি-দোষ লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি মানিলে আর ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া বজায় রাখিয়া তত্ত্বান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। বস্তুশক্তি বস্তু হইতে কখনই পৃথক্ নয়। সবিকার ও নির্ব্বিকার, নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম হইলেও অচিন্ত্যশক্তির নিকট সর্ব্বদা যুগপৎ অবস্থিত হইয়াও পরস্পর অবিরোধী। মানবযুক্তি—সীমাবিশিষ্ট, অতএব অবিচিন্ত্য শক্তিকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্যই কি অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকৃত হইবে? অচিন্ত্যশক্তিমৎ ব্রহ্মের মহিমা কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমহিমা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা পরব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করি। পরশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই—পরব্রহ্ম। নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—প.ব্রহ্মের একদেশ মাত্র। এরূপ স্থলে পরব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া একদেশ প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের চিন্তা হীনতর চিত্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। কেবল অদ্বৈতবাদ সদ্যুক্তিকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না। বেদের সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে না, এবং জীবের চরম মঙ্গল বিধান করিতে অক্ষম। এই সমস্ত বাদ—জাল অর্থাৎ মতবাদীদিগের কুসংস্কার মাত্র। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে সত্য নিহিতরূপে অবস্থিতি করেন। অসত্যসমূহকে নির্দ্ধারিত করিয়া দূর করতঃ সত্যকে সাক্ষাৎ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সংগ্রহ করার নাম 'সত্যনির্ণয়'। ভিক্টর কুঁজা নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই উপায়টী বুঝিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতকার্য্য না হইবার কারণ এই যে, তিনি পাশ্চাত্য-বুদ্ধিনিঃসৃত তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সার গ্রহণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যবুদ্ধি অত্যন্ত জড়নিষ্ঠ। আত্ম ও অনাত্মার সূক্ষ্ম

পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়জনিত মনকেই অর্থাৎ লিঙ্গপদার্থকেই 'আত্মা' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তুস কুটিয়া চাউল বাহির করার চেষ্টা যেরূপ নিস্ফল' কুঁজার সার-সংগ্রহও চরমে সেইরূপ হইল।

ঈশাবাস্য-উপনিষদে বলিয়াছেন—

"হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বম্প্ষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥"

হে চিৎসূর্য্যস্বরূপ ভগবান্, তোমার পরম-তত্ত্বরূপ সত্যের মুখ তোমার অঙ্গজ্যোতিরূপ নির্ব্বিশেষ ও জড়বিশেষাত্মক পত্রের দ্বারা **চিৎকণরূপ** জীবের নিকট আচ্ছাদিত আছে। তুমি কৃপা করিয়া সেই আচ্ছাদন দূর কর। ইহারই নাম বেদবিহিত ধর্ম্মানুসন্ধান।

পুনশ্চ ভাগবতে ঃ

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

ভ্রমর যেমন ফুলের অসার পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পের মধুমাত্র সংগ্রহ করে, পণ্ডিত ব্যক্তি তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবম্ভুত বেদ ও ভাগবতানুমোদিত সারগ্রাহী প্রবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ জড়তত্ত্বনির্ণায়ক ক্ষুদ্র শাস্ত্রসকল হইতে এবং আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বৃহৎ শাস্ত্রসকল হইতে একমাত্র পরমতত্ত্ব ও নিকৃষ্ট সত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার নাম অদ্বয়জ্ঞান। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সদংশই সেই অদ্বয়জ্ঞান। 'সৎ' শব্দেই তাহার প্রতিষ্ঠা। সৎ প্রকাশিত হইলেই অসৎ কাজে কাজেই দূর হয়। 'সৎ শব্দে' অখণ্ড চিজ্জগৎ বুঝিতে হয়। এই মায়িক জগৎ চিজ্জগতের অসৎ প্রতিফলন মাত্র। (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

দার্শনিক মতবাদ নামক চতুর্থ প্রকাশ

'দৃশ্'—ধাতু লুট্ প্রত্যয় করিয়া 'দর্শন'-শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'দৃশ্'—ধাতুর অর্থ—অবলোকন করা, দেখা, প্রত্যক্ষ করা, উপলব্ধি করা ইত্যাদি। লুট্ প্রত্যয়টি ভাববাচ্যে হইলে কেবল অবলোকন, সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষীকরণ অনুভব বা উপলব্ধি বুঝায়. আর করণবাচ্যে হইলে যে করণের বা সাধনের দ্বারা দেখা যায়, সাক্ষাৎকার করা যায়, অনুভব করা যায়, সেই সাধনকে বুঝায়। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই হইল যথার্থ দর্শন ; যে সাধনের দ্বারা বা যে শাস্ত্রাবতারের কৃপায় ভগবানের দর্শন লাভ হয়, তাহাও দর্শন-পদবাচ্য। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" :—হে প্রিয় মৈত্রেয়ী, আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে। এই শ্রুতিবাক্যে যে পরমাত্মার দর্শন বা সাক্ষাৎকারের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম—দর্শন। **মায়ার দ্বারা বিমোহিত-চিত্ত ব্যক্তিগণ ন্যায়াদি নানা দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াও ভগবানকে দেখিতে পান না।**

'দর্শন'-শব্দের সহিত দ্রষ্টা (দর্শনকারী), দৃশ্য (যাহাকে দর্শন করা যায়) ও দর্শন-ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। জীব—দ্রষ্টা নহে, পরমাত্মাই—যথার্থ-দ্রষ্টা, জীব দৃশ্য। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—পরমাত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, কৃপা করেন, সেই জীবাত্মাই পরমাত্মা-সাক্ষাৎকারের যোগ্য হ'ন।

দার্শনিক চিন্তা মানবহৃদয়ের একটী স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম—কোন না কোন আকারে, তাহা মানবের হৃদয়াকাশে ভাসমান রহিয়াছে। পরিদৃশ্যমান প্রকৃতি বা জগৎ, উহার সহিত নিজের অস্তিত্বানুভব ও সম্বন্ধ, দৈহিক ও মানসিক দুঃখানুভূতি এবং তাহা দূর করিবার ইচ্ছা হইতে আরোহ-দার্শনিক চিন্তাধারার প্রেরণা লাভ হয়। **কিন্তু অবরোহ-ভাগবতীয় দর্শনের মূলে আছে—অপ্রকৃত ব্যক্তি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরতত্ত্বেরস্বরূপশক্ত্যানন্দে কৃপাস্ফূর্ত স্বসুখপর্য্যবসান বা তদনুসন্ধান।**

অনাদিসিদ্ধ বেদ ও উপনিষদে বিভিন্ন দার্শনিক প্রশ্নের অবতারণা দৃষ্ট হয়। ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শন উপনিষদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন দেশেও পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখতা ও বিমুখতার তারতম্যানুসারে নির্ব্ব্যক্তিক, স্বাধীন ও আনুকরণিক দার্শনিক চিন্তাসমূহ মানবহৃদয়-তন্ত্রীতে সমস্বরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয়বিধ দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যেই বিমুখতা ও উন্মুখতার তারতম্য-বৈচিত্রী ফুটিয়া রহিয়াছে। ভারত রচনার অনতিবিলম্বেই দর্শন শাস্ত্র রচিত হইয়াছে।

আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন ঃ—সাধারণতঃ নয়টি দার্শনিক মত ভারতে প্রাধান্য ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রচলিত দার্শনিক পরিভাষায় ছয়টি আস্তিক ও তিনটি নাস্তিক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় (২।১১) উক্ত আছে—"নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ" অর্থাৎ হেতুশাস্ত্র বা কুতর্কের আশ্রয়ে বেদ-নিন্দকই হইল—নাস্তিক। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে দেখা যায়—যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা—আস্তিক, আর যাঁহারা পরলোক নাই বিচার করেন, তাঁহারাই নাস্তিক। (পাণিনি ৪।৪।৬০)

ষড়্ দর্শন ঃ—জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র-সূরির "ষড়্দর্শন সমুচ্চয়"-গ্রন্থে (তৃতীয় কারিকায়)—(১) বৌদ্ধ, (২) ন্যায়, (৩) সাংখ্য, (৪) জৈন, (৫) বৈশেষিক ও (৬) জৈমিনীয় মীমাংসা—এই ছয়টি দর্শনকে ষড়্দর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এবং ইহাদিগকেই আস্তিকদর্শন বলা হইয়াছে।

হরিভদ্র-সূরির অনেক পরে মাধবাচার্য্য পনরটি * বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সার সঙ্কলন করিয়া 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ'-গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ পনরটি দর্শনের মধ্যে চার্ব্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে নাস্তিক দর্শনের অন্তর্গত করা হইয়াছে। হরিভদ্র-সূরি তাঁহার ষড়্দর্শন-সংক্ষেপের শেষে লোকায়ত বা চার্ব্বাক-দর্শনের মত প্রদর্শন করিয়া উহাকে আস্তিকদর্শনের বহির্ভূত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ বৈশেষিক ও ন্যায়কে পৃথগ্দর্শন মনে করেন না, তাঁহাদের মতে পাঁচটিই আস্তিক দর্শন ; চার্ব্বাকদর্শনকে লইয়া তাঁহারা ষড়্দর্শন গণনা করেন।

একটি প্রচলিত শ্লোকে ষড়্দর্শনের এইরূপ গণনা দৃষ্ট হয়,—

"গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ। ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েবহি॥" এই শ্লোকে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত)—ষড়্দর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা বেদ মানেন না, তাঁহাদিগকে মনুসংহিতার প্রমাণানুসারে নাস্তিক এবং যাঁহারা বেদ মানেন, তাঁহাদিগকে আস্তিক বলা হয়। যাঁহারা বেদ মানিয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা সাধারণতঃ নিরীশ্বর নামে উক্ত হইয়াও নাস্তিক-পদবাচ্য হন না। প্রচলিত মতে উক্ত ষড়্দর্শন আস্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়াছে। আর নাস্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত মূলতঃ তিনটি—(১) চার্ব্বাক, (২) বৌদ্ধ, ও (৩) জৈন। অগ্নিবংশজ সাংখ্যাচার্য্য কপিল ও পূর্ব্বমীমাংসা-প্রবর্ত্তক জৈমিনি বেদ মানেন, কিন্তু ঈশ্বর মানেন না ; সুতরাং ইঁহারা নিরীশ্বর হইলেও আস্তিক বলিয়া স্বীকৃত। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণ বেদ ও ঈশ্বর উভয়ই মানেন না। এজন্য তাঁহারা নাস্তিক ও নিরীশ্বর। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসকগণ মৌখিকভাবে বেদ স্বীকার করেন অর্থাৎ বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু বেদের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। এজন্যই ইঁহাদের বেদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনকে মৌখিক বলা যাইতে পারে। **সাংখ্য দর্শনে**—ঈশ্বর প্রমানের দ্বারা অসিদ্ধ (ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ [সাংখ্যসূত্র ১।৯২।৯৫]) বলিয়া প্রকারান্তরে ঈশ্বর অস্বীকৃতই হইয়াছেন। **পাতঞ্জল-দর্শনে**—

---

* পনরটি যথা ঃ ১। চার্ব্বাক, ২। বৌদ্ধ, ৩। জৈন, ৪। রামানুজ, ৫। মাধ্ব, ৬। পাশুপাত, ৭। শৈব, ৮। প্রত্যভিজ্ঞা, ৯। রসেশ্বর, ১০। বৈশেষিক, ১১। ন্যায়, ১২। পূর্ব্বমীমাংসা, ১৩। পাণিনীয়, ১৪। সাংখ্য, ১৫। যোগ (শঙ্করদর্শন অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, এই উল্লেখ আছে)।

পাতঞ্জল সূত্র ১।২৩, ২৪) 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্' বা (অন্যান্য উপায়ের মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা হইতেও সমাধি ফললাভ হয়)—এইরূপ গৌণভাবে বা বিকল্পে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। সেই ঈশ্বর ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক (কর্ম্মের ফল) ও বাসনার দ্বারা অনভিভূত পুরুষ বিশেষ। 'ঈশ্বরও প্রধান পুরুষ নির্ম্মিত ; তাঁহার ঈশ্বরিক উপাধি প্রাকৃত' (কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল-যোগদর্শন)। **বৈশেষিক দর্শনে**—তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্ (বৈশেষিক সূত্র ১।১।৩ ও ১০।২।৯) —তাঁহার বচন বলিয়া বেদের প্রামাণিকতা। উদয়নাচার্য্য উক্ত সূত্রে তদ্-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তেন ঈশ্বরেণ প্রণয়নাৎ"—তাঁহার দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা বেদের প্রণয়ন হেতু। কিন্তু সেই ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব সর্ব্বতন্ত্রস্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কোন কথাই বৈশেষিক দর্শনে স্পষ্টভাবে নাই। অতএব এইরূপ অত্যন্ত গৌণভাবে যে ঈশ্বর-স্বীকৃতি, তাহা অস্বীকারেরই তুল্য। ন্যায়-কন্দলী টীকায় শ্রীধর ভট্ট 'তদ্'-শব্দের দ্বারা কণাদ বেদদ্রষ্টা ঋষিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এরূপ মনে করেন। তিনি ঋষিই হউন বা ঈশ্বর-নামধারীই হউন, যে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ নাই, যাঁহার আরাধনার কথা নাই, এমন কি ঈশ্বর-বাচক বিশেষ্য শব্দটি পর্য্যন্ত নাই—কেবল সর্ব্বনাম 'তৎ' এর প্রয়োগ মাত্র, এরূপ ঈশ্বর-স্বীকৃতির মূল্য কি ? আর একস্থানে বৈশেষিক—মনুষ্য অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত বৈশেষিকের ঈশ্বর-সত্ত্বার আলোচনা দৃষ্ট হয়। **ন্যায় দর্শনে**—ঈশ্বরের কথা উত্থাপিত করা হইয়াছে—জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃরূপে (ন্যায়সূত্র ৪।১।১৯-২১)। ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির উপকরণ হইল—পরমাণুসমূহ। গৌতম-কথিত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। **কণাদের** মতে পরমাত্মা ঈশ্বর—দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত, সুতরাং সগুণ (প্রাকৃত গুণের অন্তর্গত) ; **গৌতমের** মতও তাহাই। **মীমাংসা দর্শনে**—ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই—বটবীজের ন্যায় জগৎ অনাদি বলিয়া উহার সৃষ্টি ও প্রলয় নাই ; সুতরাং স্রষ্টার কোনও অপেক্ষা নাই। আত্মা—বেদ বিহিত কর্ম্মের কর্ত্তা ও তাহার ফলভোক্তা, অহঙ্কারই—আত্মা, তাহা স্থূল শরীর হইতে ভিন্ন, সুখ-দুঃখভোক্তা এবং জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ ও নরকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কর্ম্মই—প্রভু, তাহার ফল স্বর্গই—পরম পুরুষার্থ। যজ্ঞাদি কর্ম্ম যে 'অপূর্ব্ব'-নামক শক্তি সৃষ্টি করে, তাহাই কর্ম্মের ফল প্রদান করে। অতএব কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। বেদ—ঈশ্বরের উক্তি বলিয়া যে প্রমাণ, তাহা নহে ; কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় অনাদি বলিয়া এবং মানুষের রচিত শাস্ত্রের ন্যায় ভ্রমপ্রমাদাদিযুক্ত নহে বলিয়া অবাধিত শাব্দ-বোধ জন্মাইয়া থাকে। এইজন্যই বেদ প্রমাণ। অতএব সৃষ্টিকর্ত্তৃরূপে কিম্বা কর্ম্মফলদাতৃরূপে অথবা বেদবক্তৃরূপে কোন ভাবেই মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 'শঙ্করবিজয়'-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তুষানলে আরূঢ় কর্ম্মমীমাংসক কুমারিলভট্ট শঙ্করচার্য্যকে বলিতেছেন,—"নিরাস্থমীশং শ্রুতিলোকসিদ্ধং শ্রুতেঃ স্বতোমাত্বমুদাহরিষ্যন্" অর্থাৎ বেদের স্বতঃপ্রমাণত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্তই আমি ঈশ্বর—শ্রুতিসিদ্ধ এবং লোকসিদ্ধ হইলেও তাঁহাকে দূর রাখিয়াছি (মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্করবিজয় ৭।৮৯)। বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্রেই পরব্রহ্মের জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মকে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদিকর্ত্তা, তৃতীয় সূত্রে বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণিকতা ও চতুর্থ সূত্রে ব্রহ্মই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে স্থাপিত হইয়াছেন। সুতরাং বেদান্ত দর্শনই হইল প্রকৃত প্রস্তাবে আস্তিক ও সেশ্বর দর্শন এবং সমগ্র দর্শন রাজ্যের সার্ব্বভৌমাধিপতি ও সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত-সংস্থাপক।

বিভিন্ন দার্শনিকের বেদ-স্বীকৃতির তারতম্য—আস্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে বেদের স্বীকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। যথা—

(১) সাংখ্য দর্শনের মতে বেদ—অনিত্য। যেহেতু বেদের মধ্যেই বেদের উৎপত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং বেদ নিত্য নহে (সাংখ্য প্রবচনসূত্র ৫।৪৬)। বেদ পুরুষের সৃষ্ট নহে। কারণ বেদ কাহার রচিত, ইহার স্থির সংবাদ কেহই প্রদান করিতে পারে না। (সাংখ্য-প্রবচনসূত্র ৫।৪৫)। বীতস্পৃহাহেতু মুক্তপুরুষ

ও অসর্ব্বজ্ঞতা-হেতু অমুক্ত পুরুষ উভয়েই বেদ-প্রনয়নে অযোগ্য। ঐ (৫।৪৭) যেরূপ অঙ্কুরাদি অনিত্য হইলেও অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষকৃত নহে, সেইরূপ অনিত্য বেদও অপৌরুষেয় (পুরুষকৃত নহে)। বেদের স্বাভাবিকী জ্ঞানোৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়া বেদ স্বতঃপ্রমাণ। ঐ (৫।৪৮,৫১) নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং ঈশ্বর বেদের কর্ত্তা হইতে পারেন না। আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভই বেদের দ্রষ্টা, বক্তা ও প্রকাশক (ঐ ৫।৫০)

(২) পতঞ্জলি আগমকে প্রমানের মধ্যে গ্রহন করিয়াছেন। (যোগসূত্র ১।৭)। তাঁহার মতে বেদবোধিত যজ্ঞাদি—বৈধকর্ম্ম ও বেদনিসিদ্ধ ব্রহ্মহত্যাদি—অবৈধ কর্ম্ম। অতএব বেদ প্রমাণ। এইমতে বেদ প্রকৃত আলোচ্য বিষয় নহে বলিয়া বেদ সম্বন্ধে কোন মত বা যুক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

(৩, ৪) নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,— বাক্য মাত্রই পুরুষের রচিত, বেদবাণী ও বাক্য। সুতরাং তাহাও গৌতমের মতে পৌরুষেয়। আপ্ত-পুরুষে প্রামাণ্য-প্রযুক্তই তাঁহার বাক্যের (বেদের) প্রামাণ্য (ন্যায়সূত্র ২।১।৬৭)। বৈশেষিকের বৈশেষিক সূত্র ৬।১।১ মতে লৌকিক বাক্য রচনার ন্যায় বেদবাক্যের রচনাও বুদ্ধিপূর্ব্বকই হইয়াছে। অতএব বেদ পুরুষ-কৃত।

(৫) মীমাংসকগনের মতে অক্ষর নিত্য। অতএব অক্ষরময় বেদও নিত্য। বেদের কোন কর্ত্তা নাই কুমারিল ভট্ট বেদকে অকৃত (অর্থাৎ ঈশ্বর বা তৎ-সদৃশ অন্য লোকোত্তর সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের রচিত নহে) অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়াছেন। কঠ-কলাপাদি ঋষিগণ বেদের তত্তদংশের কেবল দ্রষ্টা ও অধ্যেতা। বেদের কোন মন্ত্রে কোন অক্ষরেরই পরিবর্ত্তন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এইরূপ স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া মীমাংসকগণের মতে বেদ অপৌরুষেয়।

(৬) শঙ্করাচার্য্যের মতে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই বেদের রচয়িতা। সেই বেদ রচনায় ঈশ্বরের কোন প্রয়াস নাই; এইজন্য ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ মহাপুরুষেরই নিঃশ্বাস এই বলিয়া শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। (বৃহদারণ্য ২।৪।১০)। পরমপুরুষ হইতে একই রূপে বেদপ্রবাহ একই ছন্দে বিশ্বের বিভিন্ন সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলার মধ্যেও নির্ব্বাধ গতিতে চলিয়াছে ও চলিতে থাকিবে। পুরুষোত্তমই যদি বেদের রচয়িতা বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত থাকে, তবে বেদকে অপৌরুষেয় বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে শঙ্করসম্প্রদায়ের আচার্য্যগন বলেন, পুরুষোত্তম বেদের রচয়িতা হইয়াও তিনি তাঁহার রচনার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধনে স্বেচ্ছাধীন নহেন। এজন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। পুরুষের স্বাধীন কর্ত্তৃত্বের অভাবই অপৌরুষেয়-শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে এই অর্থে মীমাংসকগনও বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াছেন। (ভামতী ১।১।৩)। শঙ্কর সম্প্রদায়ের সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদ ভাষ্যের উপক্রমনিকায় বলিয়াছেন যে, স্বয়ং বাদরায়ণ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'—(ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩) সূত্রে ব্রহ্মকেই বেদের কারণ (যোনি) বলিয়াছেন, সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে সায়ন বলেন,—পুরুষোত্তমে নির্ম্মিত হইলেও বেদকে পৌরুষেয় বলা যাইবে না, মনুষ্য-রচিত হইলেই তাহাকে পৌরুষেয় (পুরুষ-কৃত) বলা যাইবে—'নৈতাবতা পৌরুষেয়ত্বং ভবতি। মনুষ্যনির্ম্মিতত্বাভাবৎ। (ঋগ্বেদে সংহিতা) এই স্থানে শঙ্কর সম্প্রদায়ের সহিত কর্ম্ম মীমাংসকগনের বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিচারে মতানৈক্য হইয়াছে।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—যে, বেদ অনাদিসিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগৎ সৃষ্টাদি ব্যাপারে পরমেশ্বর হইতেই আবির্ভূত, সর্ব্বকারন ভগবানের অনাদিসিদ্ধ অপৌরুষেয় বাক্য, তাহা অবশ্যই ভ্রমপ্রমাদাদি রহিত। এই বাক্য সর্ব্বজনক পরমেশ্বরের উপদেশ সর্ব্বদা প্রচারের জন্য আবশ্যক, ইহা জানিতে হইবে এই বাক্যই অকাট্য প্রমানও। পরমেশ্বরের কৃপা হইলেই এই প্রমানকে কেহ কেহ একমাত্র প্রমান বলিয়া স্বীকার করেন। যদি বল—বুদ্ধদেবও ঈশ্বরাবতার, তাঁহার বাক্য প্রমানরূপে গৃহীত হউক;—তাহা হইতে পারে না কারণ, যে শাস্ত্রে বুদ্ধকে ঈশ্বরাবতার বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, তিনি যে-সকল উপদেশ

করিয়াছেন, তাহা দৈত্যগণের মোহনের জন্য। সুতরাং ঈশ্বরাবতার বুদ্ধের বাক্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—যুগান্তে বেদ সমূহ বিলুপ্ত হইলে, ব্রহ্মাকর্তৃক আনুজ্ঞাত হইয়া ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা ইতিহাস-সমূহের সহিত সেই বেদ সকলকে পুনরুদ্ধার লাভ করেন। অতএব, ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা নহেন। বেদ—নিত্য, সিদ্ধ; ঋষিগণের হৃদয়ে বেদ প্রবিষ্ট হন, সেইজন্য তাঁহারা বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ও প্রকাশক কর্ত্তা, কিন্তু স্রষ্টা নহেন। বেদে যে প্রতি কল্পে ঋষিগণের নামাদি দৃষ্ট হয় তাহাও অনাদিসিদ্ধ বেদেরই ন্যায়। বেদময়ী বাণীর আদি অন্ত নাই; ইহা—নিত্য। এই বেদময়ী বাণী হইতে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছে। উহা হইতেই ঋষিগণের নাম ও বেদোক্ত সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। মহেশ্বর—বেদের শব্দসমূহ হইতেই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। (মহাভারত শান্তি পঃ ২৩১৷৫৬,৫৭)। শব্দ হইতেই যে সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (১৷৩৷২৮) আচার্য্য শ্রীশঙ্কর 'ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ', 'তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি শ্রুতির মন্ত্র উদ্ধার করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। ঐ সকল শ্রুতি মন্ত্রের অর্থ এই—সৃষ্টিকালে ঈশ্বর শ্রীব্রহ্মার হৃদয়ে বেদমন্ত্রসমূহ উদ্‌বুদ্ধ করেন, ব্রহ্মা সেই সকল মন্ত্র স্মরণ করিয়া তদনুরূপ বেদ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বকল্পের সৃষ্টি অনুরূপ বর্ত্তমান কালের সৃষ্টি হয়। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যও তাঁহার শ্রীভাষ্যে (১৷৩৷২৭) 'তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের (তৈত্তিরীয়ব্রা, ২৷৬৷২৷৩) মন্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রজাপতি বেদের শব্দ স্মরণ করিয়া স্থূল-সূক্ষ্ম জগৎ-সমূহকে নাম ও রূপ দিয়া সৃষ্টি করেন,— "শব্দ ইতি চেৎ-ন, অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (ব্রঃ সূঃ ১৷৩৷২৮) এই সূত্রে বেদ-শব্দ স্মরণ করিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আরও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আকৃতির সহিতই বৈদিক শব্দের সম্বন্ধ; ব্যক্তিবিশেষের উৎপত্তি ও বিনাশে শব্দের নিত্যত্ব নষ্ট হয় না।

কেহ কেহ বলেন যে, বেদে এরূপ দেখা যায়—'পাথর ভাসে,' 'মাটি কথা বলে'। সুতরাং এইরূপ বেদ বাক্য কখনও আপ্তবাক্য (বিশ্বস্ত বা অভ্রান্ত বাক্য) বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। বৈদিক যজ্ঞাদির অঙ্গীভূত প্রস্তর সমূহের শক্তি প্রদর্শনার্থই ঐ সকল স্তুতি; শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনেও ঐরূপ দৃষ্ট হয়। 'মৃত্তিকা কথা বলেন,' 'জল কথা বলেন', এইসকল স্থলে তত্তদভিমানী দেবতাগণকেই বুঝায়। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্যরূপ বেদ অসর্ব্বজ্ঞ জীবের বুদ্ধির অগম্য। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অনুগ্রহ-প্রভাবে যাঁহারা প্রত্যক্ষবিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র বেদবাক্য অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু তার্কিকগণ তাহা পারেন না। শ্রীজীবপাদ এই ভাবেই বেদের অদ্বিতীয় প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরতত্ত্ব যেরূপ অনাদি, বেদ ও শ্রুতি এবং পরতত্ত্বের স্বরূপশক্তি ও পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিভিন্ন চিন্তাধারাও সেইরূপ অনাদি এবং তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তিও সেইরূপ অনাদি এবং মায়ার বিবিধ বৈচিত্র্যজাত মতবাদসমূহও সেইরূপ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক মূলীভূততত্ত্ব; যেমন—তড়িৎ-শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম প্রভৃতি যদি অনাদিতত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত জড়শক্তির মূলভূতা পরমেশ্বরী শক্তি এবং সেই শক্তির বিভিন্ন বিক্রম বা বৈচিত্র্যগুলিকে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে কিরূপেই বা আবদ্ধ করা যায়? যাঁহারা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন জড়বাদী।

বেদ ও শ্রুতির নিত্যতা একটি চিদ্-বৈজ্ঞানিক পরমসত্য। শ্রুতিতে দার্শনিক তত্ত্বের যে অঙ্কুর দেখা যায়, তাঁহার বীজ পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; ইহা আধুনিক গবেষকগণও স্বীকার করিয়াছেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বেদ, শ্রুতি এবং তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া দার্শনিক চিন্তার বীজসমূহ চিরকালই আকাশে ভাসমান শব্দতরঙ্গের ন্যায় বিশ্বমানবের হৃদয়াকাশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। রেডিওষ্টেশন হইতে যেরূপ বাণী প্রবাহকে অবরুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত করিয়া সর্ব্বত্র বিতরণ বা প্রচার করা হয়, তদ্রূপ মহাশক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ, মনীষিগণ চিরন্তন মৌলিক দার্শনিক তত্ত্বসমূহকে স্ব-স্ব হৃদয়ে অবরুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত করিয়া জগতে প্রচার

করেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনের তত্ত্বসমূহ প্রতি কল্পের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই উদিত, প্রলয়কালে সুপ্ত ও পুনরায় অন্য কল্পের সৃষ্টিকালে পুনর্ব্ব্যক্ত হইতেছে। এইজন্যই সাংখ্যাদি দর্শনের আদি-বক্তা হইলেন ভগবদবতারগণ অর্থাৎ জীব নহেন। কখন কখন কোন শক্তিসম্পন্ন ঋষি বা মনীষী স্বকপোল-কল্পিত মতের ছাঁচে ঢালিয়া অন্যরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। তাই সাংখ্যশাস্ত্রের আদিবক্তা ভগবদবতার শ্রীদেবহূতিনন্দন শ্রীকপিলদেবের সিদ্ধান্ত অগ্নিবংশজ ঋষি শ্রীকপিলের মতবাদের মধ্যে কিছু অন্যাকার ধারণ করিয়াছিল অর্থাৎ মূলবস্তু যে পরমেশ্বর, তাহা বর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। যোগাদি-শাস্ত্র-সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবলি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া কহিতেছেন,—

নমোঽনন্তায় বৃহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে। সাঙ্খ্যযোগবিতানায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ।। (ভাঃ ১০।৩৯।৮৫।)।

সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি আস্তিক দর্শনের কথা দূরে থাকুক, চার্ব্বাক-জৈন-বৌদ্ধাদি-নাস্তিক দার্শনিক চিন্তাধারাও প্রতি কল্পের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার ন্যায় এই জগতে অনাদিকাল হইতেই রহিয়াছে ও থাকিবে। এজন্য ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকাদি-উপনিষদে চার্ব্বাকের দেহাত্মবাদের অনুরূপ মতবাদ শ্রুত হয়। মায়া যদি অনাদি হয়, তবে মায়ার বিচিত্ররূপ ঐ সকল দার্শনিক চিন্তা কেন অনাদি হইবে না ? প্রতি কল্পের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কোন না কোন চার্ব্বাকের কোন না কোন বুদ্ধের, কোন না কোন তীর্থঙ্কর-জীনের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। শাক্যসিংহ বুদ্ধ নিজেকে 'তথাগত' (পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধের ন্যায় আগমন করিয়াছেন বলিয়া তথাগত) বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিনজন বুদ্ধের নাম করিয়াছেন। তিনি চতুর্থ বুদ্ধ, পরে মৈত্রেয়দেব পঞ্চম বুদ্ধ হইবেন। (অনুগত ব শ)। চৈনিক-ধর্ম্মগুরু কনফুচিও (Confucius) ঐরূপই কথা বলিয়াছেন। জৈনগণও বলেন,—প্রতি সৃষ্টিতেই জৈনধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। জীনের নামও 'তথাগত' (অমরকোষ)। এই সকল কথার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, নিরীশ্বর নাস্তিক মত সমূহ বৈদিক-ধর্ম্মের ন্যায়ই নিত্য, সত, সনাতন। ইহার অর্থ এই,—পরব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বা বহির্ম্মুখতা একটি অনাদি প্রবাহ। ইহার আরম্ভের কোনও ইতিহাস নাই। "কোন্ দর্শনটি আগে, কোন্ দর্শনটি পরে—দার্শনিক চিন্তার অনাদিত্ব প্রমাণিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশ্নটিও থামিয়া যায়। তাই গবেষকগণ পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তার ন্যায় ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ক্রমনিরূপণ-বিষয়ে প্রকৃত মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব-মীমাংসার পরে উত্তর-মীমাংসা—এইরূপ একটি বিচার সহজেই হৃদয়ে আসে; কিন্তু দেখা যায়, ব্রহ্মসূত্রকার যেরূপ তাঁহার সূত্রমধ্যে জৈমিনীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মসূত্রকারও সেইরূপ তাঁহার সূত্রে বাদরায়ণের নাম ও সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের পরে বেদান্তের বা ব্রহ্মসূত্রের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহের উদ্ভব হইয়াছে—এরূপ কিছু সীমারেখা প্রদান করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বমীমাংসার অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা কুমারিলভট্টও স্বীকার করিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবাদ (বৌদ্ধ যোগাচার-মত), ক্ষণিকবাদ (সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মত), নৈরাত্মবাদ (বৌদ্ধ সর্ব্বশূন্যবাদ) প্রভৃতি মতগুলির বীজ উপনিষদে বিদ্যমান আছে। বেদপ্রমাণ্যবাদী ভট্ট উপনিষদে ঐ সকল মতকে অর্থবাদ ও বিষয়বৈরাগ্য উৎপাদনের অনুকূলরূপে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। সুতরাং জৈমিনির কর্ম্মকাণ্ড প্রচারিত হইবার পর বৌদ্ধমতের আবির্ভাব হইয়াছিল, এরূপও বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেকটি মতবাদই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অনাদি মায়ার বৈচিত্র্যরূপে বিদ্যমান আছে। তদ্রূপ যোগমায়ার প্রকাশিত সর্ব্বতত্ত্বসিদ্ধান্তও জগতে সারগ্রাহিগণের নিকট প্রকাশিত আছেন।

যে মহাবৃক্ষের বীজ উপনিষদে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, বেদান্তসূত্রে তাহারই পূর্ণ পরিণতি লাভ হয়, অর্থাৎ 'বেদান্তসূত্রই উপনিষদের প্রকৃত ও একমাত্র ব্যাখ্যা'—ইহা আধুনিক গবেষকগণও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বেদান্ত সূত্রের কোন্‌টি প্রকৃত ও একমাত্র ব্যাখ্যা অর্থাৎ কোন্‌টি শ্রীব্যাস-সম্মত ব্যাখ্যা তাহাই নির্ণীত হওয়া আবশ্যক।

দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তির মূল—প্রাণিমাত্রেরই দুঃখানুভূতি আছে, অথচ কেহই দুঃখ চাহে না। এই

দুঃখ দূর করিবার মূলেই জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং জ্ঞানের পিপাসা আরম্ভ হয়। যদি কেহ সুখ লাভ করিতে পারিবে, এইরূপ বুঝিতে পারে, তবেই সে কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হয়। যদি বুঝে, ইহাতে সুখ পাওয়া যাইবে না, তবে সে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এই সুখটিকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক। হে ভগবান্! আমি সুখকে জানিতে ইচ্ছা করি। ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন,—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।" (ছান্দোগ্য ৭।২৩।১) অর্থাৎ যাহা ভূমা (সর্ব্বাধিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মহান্, অসমোর্দ্ধ বা পরাৎপর), তাহাই সুখ। অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। ভূমাকে কিন্তু জানিবার জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হইতে হইবে।

সাংখ্য দর্শন—দুঃখ পরিহার ও সুখলাভ উপায় সাধ্য। তজ্জন্য মহর্ষিগণ নিজ নিজ দর্শনশাস্ত্রে স্ব-স্ব মতানুসারে তাহার উপায় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা মুনির নামই পঞ্চশিখ। মহর্ষি কপিল যে দর্শন প্রণয়ন করেন তাহার নাম সাংখ্যদর্শন। সাংখ্য শব্দটী যোগরূঢ়। সংখ্যা অর্থাৎ সম্যক্ বিবেকের সহিত আত্মকথন যাহাতে আছে, তাহারই নাম সাংখ্য। মহাভারতে সাংখ্য শব্দের ঐরূপ অর্থই পরিদৃষ্ট হয়। মহর্ষি কপিল দুইজন। একজন সত্যযুগে মহর্ষি কর্দ্দম ঋষির ও মনুর কন্যা দেবহূতির আত্মজ স্বীকার করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিই ভগবদবতার ও ষড়বিংশ তত্ত্বাত্মক সাংখ্যদর্শনের আদি-কর্ত্তা। ইনি সাংখ্য দর্শন নামে কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ইঁহারই উপদিষ্ট সাংখ্য মত সম্বন্ধে উল্লখিত আছে। অপর জন ত্রেতাযুগে সগরবংশ ধ্বংসকারী অগ্নিবংশজ মহর্ষি কপিল আসুরিক, ও আসুরি পঞ্চশিখকে সাংখ্য শাস্ত্র উপদেশ করেন। এই পঞ্চশিখ হইতে সাংখ্যশাস্ত্র প্রচারিত হয়। উপরোক্ত সাংখ্যমত গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়া সাংখ্যদর্শন নামে প্রচার করেন। ইহা প্রথমোক্ত সাংখ্যদর্শনের সার সঙ্কলন হইলেও স্থানে স্থানে শ্রুতি-বিরুদ্ধ অংশ সকল থাকায় এবং ঈশ্বর-প্রতিষেধাংশরূপ অপরিহার্য্য দোষ বশতঃ সাধুসমাজে এই দর্শনখানির আদর নাই।

এই সাংখ্যদর্শনের মতে তত্ত্ব প্রধানতঃ দুইটি, যথা—পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি আবার দুই প্রকার, যথা—মূল বা অব্যক্ত প্রকৃতি ও ব্যক্ত প্রকৃতি। ব্যক্ত প্রকৃতি (নিজে পৃথক কোন তত্ত্ব নহে) ত্রয়োবিংশ তত্ত্বের সমষ্টি, যথা—মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, উভয়েন্দ্রিয় মন ও পঞ্চ মহাভূত। সর্ব্বশুদ্ধ তত্ত্ব হইল পঞ্চবিংশতি। * এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে কোন কোনটি কেবল প্রকৃতি বা কারণ, কোন কোনটি কেবল বিকৃতি বা কার্য্য, কোন কোনটি বা কার্য্য ও কারণ উভয়াত্মক এবং কোনটি বা অনুভয় অর্থাৎ কার্য্য বা কারণাত্মক নহে।

পুরুষতত্ত্বটি নিত্য ও অপরিণামী। ইনি কাহারও কার্য্য বা কারণ নহেন বলিয়া অনুভয়। পুরুষ এক হইলেও জন্মমরণাদি অবস্থার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অধিষ্ঠান-হেতু প্রকৃতিস্থ পুরুষ অসংখ্য। যেমন ঘটাদি-যোগে আকাশের নানাত্ব ঘটে, সেইরূপ পুরুষ স্বরূপতঃ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে অধিষ্ঠান করায় বিভিন্ন হ'ন। পুরুষ—নিত্য, নির্গুণ ও বিভু-স্বভাব। ঘটাকাশ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ উপাধিভেদ হয়, ঘটরূপ উপাধিবিশিষ্ট যে আকাশ, তাহার প্রকৃত প্রস্তাবে ভেদ হয় না; তদ্রূপ নিত্য, নির্গুণ, বিভু-স্বভাব আত্মারও স্বরূপতঃ ভেদ হয় না, দেহরূপ উপাধি-সংযোগ আত্মা নানারূপে প্রতিভাত হ'ন মাত্র। লৌহ যেমন অগ্নির সন্নিকটস্থ হইলে অগ্নির দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতি আত্মার সন্নিধানে থাকিয়া আত্মার চৈতন্য-গুণ প্রাপ্ত হয়। পুরুষ নিত্য সত্ত্বরজঃ তমঃগুণ শূণ্য, চেতন, সাক্ষী মাত্র, উদাসীন, (নিষ্ক্রিয়) প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এবং বহু (প্রতিজীবই এক একটি পুরুষ)। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সুখ-দুঃখ ভোগ হয়। জ্ঞানোদয় হইলে সে সুখ দুঃখ ভোগের অতীত হইয়া মুক্ত হয়। প্রকৃতি অচেতন হইয়াও কর্ত্রী এবং পুরুষের সন্নিধান বশতঃ উহার কর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি জ্ঞানই বিবেক।

* ইন্দ্রিয়—১১ তন্মাত্র—৫ মহাভূত—৫ প্রকৃতি—১ মহৎ—১ অহঙ্কার—১ পুরুষ—১

উক্ত বিবেকের উদয়ে পুরুষ-কর্তৃক দৃষ্ট-দোষা প্রকৃতি পুরুষকে পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই পুরুষের মুক্তি হয়।

মূল প্রকৃতি তত্ত্বটি ব্যক্ত প্রকৃতির কারণ এবং উহার অন্য কোন কারণ নাই বলিয়া উহা কেবল প্রকৃতি। মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ) এই সপ্ত তত্ত্ব একের কারণ ও অপরের কার্য্য বলিয়া উভয়াত্মক। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ), উভয়েন্দ্রিয় মন এবং পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) এই ষোড়শতত্ত্ব তত্ত্বান্তরের কারন নহে, কেবল কার্য্য বলিয়া বিকৃতি।

পুরুষ ব্যতীত যে ২৪টী তত্ত্ব, তাহাই জগৎ। ইহাদের মধ্যে সকলের মূল—প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুনত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই মূল বা অব্যক্ত প্রকৃতি বলে। ইহার আর এক নাম সমা (গুনত্রয়ের সাম্যাবস্থা বলিয়া)। গুনত্রয় জড় ও পরিণামী। নিখিল জগৎ এই গুনত্রয়েরই পরিনাম। সত্ত্বগুণের বৃত্তি শান্তা। উহা সুখস্বরূপ, লঘু ও প্রকাশক। রজোগুণের বৃত্তি ভয়ঙ্করী, উহা দুঃখস্বরূপ ও প্রবর্ত্তক। আর তমোগুণের বৃত্তি মূঢ়া; উহা মোহস্বরূপ; গুরু ও আবরক। এই গুনত্রয়ের বৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতুর ন্যায় কার্য্যকালে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। জগৎ এই ত্রিগুণেরই পরিণাম বলিয়া সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক। সুখ, দুঃখ ও মোহ বুদ্ধির (মহত্তত্ত্বের) ধর্ম্ম—প্রকৃতির ধর্ম্ম, পুরুষের নহে। রক্তজবার নিকট স্বচ্ছ স্ফটিক যেমত রক্তবর্ণ বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ বুদ্ধির সংসর্গে বুদ্ধি বা প্রকৃতিরধর্ম্ম সুখ, দুঃখ ও মোহ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। এই প্রতিবিম্বই পুরুষের সংসার। বুদ্ধির তিনটি অংশ যথা—(১) পুরুষে প্রকৃতির উপরাগে উৎপন্ন অহং বুদ্ধি, (২) প্রকৃতিতে পুরুষের উপরাগে উৎপন্ন ইদং বুদ্ধি এবং (৩) এতদুভয়ের উপরাগে উৎপন্ন কর্ত্তব্য বুদ্ধি। এই বুদ্ধিত্রয়ই ভ্রমাত্মক। বিবেক দ্বারা ঐ ভ্রম অপগত হইতে পারে।

যখন এই প্রকৃতির বিক্ষোভ হয়, তখনই মহৎ-অহঙ্কারাদি-ক্রমে জগৎ-সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রকৃতি—অচেতন ও জড় এবং সাম্যাবস্থায় নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি পুরুষের সংস্পর্শে সক্রিয় হয়। পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য এবং প্রকৃতি পুরুষের কৈবল্য-সাধনের জন্য (প্রকৃতির স্বরূপে পুরুষের প্রকৃত অর্থ সাধক যে কিছুই নাই, এই জ্ঞানোৎপাদনের জন্য) পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পঙ্গুর অন্ধকে চালনা করার ন্যায় প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। (সাংখ্যকারিকা ২১ শ্লোক)। প্রকৃতি যেন দৃষ্টিশক্তিহীন এবং পুরুষ—ক্রিয়াশক্তিহীন। পুরুষ যখন বুঝিতে পারে যে প্রকৃতি তাহাকে বশ করিতে চাহে অর্থাৎ পুরুষের যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন প্রকৃতি লজ্জিত হইয়া সরিয়া পড়ে। পুরুষ তখন মুক্ত হয়। রঙ্গালয়ের নর্ত্তকী লোকদিগকে নৃত্য প্রদর্শন করিবার পর যেরূপ স্বভাবতঃই নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষকে আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করিবার পর নিবৃত্ত হয়। (সাংখ্যকারিকা ৫৯)

ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বরের অর্থ—জগৎ-সৃষ্টি-কর্ত্তা। সেই ঈশ্বর যদি মুক্তপুরুষ হ'ন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টির জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না, আর যদি বদ্ধ হ'ন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঈশ্বরই বলা যায় না। অতএব ঈশ্বর নাই। বেদাদি শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায় তাহা মুক্ত-আত্মার প্রশংসা মাত্র অথবা সিদ্ধগণের কথা। প্রকৃতিই এই জগৎ সৃষ্টির কারণ। সাংখ্যের মতে শ্রুতি শাস্ত্র জগৎকে প্রধানেরই কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (সাংখ্য সূত্র ১।৯২, ৯৩, ৯৫ ও ৫।২—১২)। নিরীশ্বর-কপিল ঈশ্বর মানেন না, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিন প্রকার প্রমাণ।

সাংখ্য দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে দুঃখ-নিবৃত্তি হয়। তাহাই মুক্তি। "আত্যন্তিক-দুঃখ নিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ"

অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুক্তি কহে। এই দুঃখ ত্রিবিধ, যথা—১। আধ্যাত্মিক, ২। আধিদৈবিক, ও ৩। আধিভৌতিক। ১। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার, যথা —শারীর ও মানস। (১) বাত, পিত্ত ও কফ এই ধাতুত্রয়ের বৈষম্য হইতে উৎপন্ন রোগাদি দুঃখকে শারীর দুঃখ কহে। (২) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, বিবাদ, ভয়, বিরহ এবং শোকাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে মানস দুঃখ বলে। ২। গ্রহাদির আবেশ ও যক্ষ রাক্ষসাদি হইতে এবং দৈব উৎপাৎ (অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবনাদি দ্বারা) হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে। ৩। আর মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন যে দুঃখ তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। এই ত্রিবিধ দুঃখই প্রকৃতি মূলক। বিবেক দ্বারা প্রকৃতির নিবৃত্তি হইলে, অর্থাৎ দুঃখ সমূহ প্রকৃতির ধর্ম্ম, আমার (পুরুষের) ধর্ম্ম নহে, আমি (পুরুষ) গুণময়ী জড় প্রকৃতি হইতে ভিন্ন চেতন এবং উদাসীন এবম্প্রকার জ্ঞানোদয়ে প্রকৃতির প্রতি দোষদৃষ্ট ও বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে, প্রকৃতির অধিকারের নিবৃত্তি হয় এবং দুঃখত্রয়ের বিনাশ হয়।

যদিও ঔষধ ও বনিতাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক, যন্ত্রাদির দ্বারা আধিদৈবিক ও দুর্গাদি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখের নাশ হইতে পারে, কিন্তু তৎসমূহ দ্বারা দুঃখত্রয়ের মূল বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। দদ্রু প্রভৃতি রোগের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং দুঃখত্রয়কে সমূলে নাশ করিতে হইলে বিবেকের প্রয়োজন। বিবেকোদয়ে প্রকৃতির নিবৃত্তি হইলে, দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাকেই প্রকৃত মুক্তি কহে। ভারাপগমে দুঃখের নাশ ভিন্ন অন্য কোন পৃথক সুখের উৎপত্তি না হইলেও ভারবাহক যেমন আপনাকে সুখী মনে করে, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষ দুঃখত্রয়ের নাশেই সুখী হইয়া থাকে। এই সুখকেই মোক্ষানন্দ কহে। সাঙ্খ্যদর্শন প্রণেতা নিরীশ্বর কপিলের ইহাই মত। (শ্রী কে, পিথাগোরায় সাংখ্যকার কপিলের শিষ্য)

সাংখ্যমত খণ্ডন—অচেতন প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া স্বীকার করাই সাঙ্খ্যদর্শনের প্রধান দোষ। বেদে কুত্রাপি প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হয় নাই। পুরুষেরই কর্ত্তৃত্বের বিষয় বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। 'আমি করিতেছি' বলিলে, আমার (কর্ত্তার) চৈতন্য প্রতীত হইতেছে, সুতরাং অচেতন প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে, জড় বুদ্ধির (প্রকৃতির) কর্ত্তৃত্ব চেতন পুরুষে ভ্রান্তি বশতঃ আরোপিত হইতেছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, চেতন পুরুষের কর্ত্তৃত্ব জড় বুদ্ধিতে (প্রকৃতিতে) আরোপিত হইতেছে, এরূপ না বলিয়া, জড় বুদ্ধির (প্রকৃতির) কর্ত্তৃত্ব চেতন পুরুষে আরোপিত হইতেছে, এরূপ একতর পক্ষপাতিনী যুক্তির অবস্থান কোথায়? ইহা ছাড়া পুরুষের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিলে একটি মহাদোষ উপস্থিত হয়—চেতন পুরুষ হইতে পৃথক যে অচেতন বুদ্ধি (প্রকৃতি), তাহার নিত্য কর্ত্তৃত্ব এবং পুরুষের মোক্ষভাব ও অনিত্য কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে, পুরুষের সংসার কখনই হইতে পারে না।

পুনশ্চ অচেতন প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধিকে (মহত্তত্ত্বকে), প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া অচেতন বলা সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ অচেতন হইয়া জন্যকর্ত্তা (নিমিত্তকারণ) হওয়া নিতান্ত অযৌক্তিক। নিমিত্ত কারণের অভাবে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। অতএব কর্ত্তার চেতনত্বের ন্যায় নিত্যত্ব ও স্বীকার্য্য হইতেছে। যাহা নিত্য তাহা অবিনশ্বর। সুতরাং চেতন ব্যতিরেকে জড়ের কার্য্যকারিতা সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া, যদি পুরুষের আবশ্যকতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাঙ্খ্যমত বেদান্ত দর্শনের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। পুরুষ নিজ শক্তিস্বরূপ মায়াকর্ত্তৃক, এই বিচিত্র জগৎ রচনা করেন, বেদান্তের ইহাই সিদ্ধান্ত।

বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদের ১—১০ সূত্রে নিরীশ্বর সাংখ্যমত নিরাশ করিয়াছেন। জড় প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত, ইহা অনুমিত হয় না। কারণ চেতনাশ্রয় ব্যতীত জড়ের দ্বারা বিচিত্র জগৎ রচনা সিদ্ধ হয় না। চেতনের অনাশ্রয়ি ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহনির্ম্মান অসম্ভব। প্রধানের সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম ও সম্ভব নহে। কারণ বাহ্য ঘটাদি বস্তু সুখ দুঃখাদির দ্বারা অন্বিত হয় না। সুখাদি অন্তর্ধর্ম্ম, তাহা বাহ্য

বস্তুতে থাকে না। জড় চেতনকে আশ্রয় করিলে তখন তাহার প্রবৃত্তি দেখা যায়। সারথি ব্যতীত রথে চলন প্রবৃত্তি কোথায়? দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয় এবং মেঘমুক্ত জল একরস হইয়াও আম্রপনসাদি ফল-বিশেষে বিভিন্ন রসে পরিণত হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম-বৈচিত্র্য-হেতু প্রধানেরই দেহ ভুবনাদিরূপে পরিণতি চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত সম্ভব হয় না। তৃণপল্লবাদি গবাদি কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া দুগ্ধাকারে পরিণতি হওয়ার ন্যায় প্রধানের কার্য্য বলা যায় না। কারণ বৃষাদি-ভক্ষিত তৃণের দুগ্ধাকারে পরিণতির অসদ্ভাব হেতু তৃণাদির দুগ্ধাকারে স্বতঃ-পরিণাম বাদ অসঙ্গত। তাহা হইলে প্রাঙ্গণস্থিত তৃণেরও দুগ্ধাকারে পরিণতি হইত। প্রধানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে কোন ফল দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বরের সঙ্কল্পেই উহা সম্ভব।

কপিল সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুনের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বশে অঙ্গাঙ্গিভাব-হেতু বিশ্বসৃষ্টি স্বীকার করেন, তাহা অসঙ্গত কারন গুনত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রধান। তাহাতে কোন একটি গুনের অঙ্গিত্ব উপযুক্ত হয় না। "ঈশ্বর অসিদ্ধ—" এই সূত্রে ঈশ্বরের প্রয়োজন অস্বীকার করিয়াছেন। কালও কর্ত্তা হইতে পারে না। পুরুষকেও কালাদির কর্ত্তা বলা যায় না। কারণ পুরুষ চিরকালই সে বিষয়ে উদাসীন। এই মতে গুন-বৈষম্যের হেতু সৃষ্টি হইতে পারে না। কার্য্যানুরোধে গুনসকলের বৈচিত্র্যও অসম্ভব। ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্ব ও উত্তরাংশে বিরোধ হেতু কপিল মত যুক্তি বিরুদ্ধ। পুরুষ শয্যাদিবৎ প্রকৃতির ভোক্তা। সুতরাং পুরুষের ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়া তাহাকে নির্ব্বিকার, নির্ধর্মক বলা অসঙ্গত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও সাংখ্যমত নিরাশ করিয়াছেন। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতের উপাদানাংশে 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধা এবং জগতের নিমিত্তাংশে 'মায়া' নামে খ্যাত। জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, যেহেতু কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে কৃষ্ণ প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যশক্তি প্রদান করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। উদাহরণ-স্বরূপ—তপ্তলৌহের উপমা; যেরূপ লৌহের দহন বা তাপ-প্রদান প্রভৃতি শক্তি নাই, কিন্তু অগ্নির স্পর্শে তপ্তলৌহ অন্য বস্তুকে দহন ও তাপ দিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ লৌহরূপা জড়া-প্রকৃতির দ্রব্য বা উপাদান-হইবার স্বতন্ত্রতা নাই। অগ্নিসদৃশ কারণোদকশায়ীর ঈক্ষণ-শক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহসদৃশ প্রকৃতি উপাদান প্রতিমা দহিকা বা তাপ প্রদায়িনী শক্তিবিশিষ্টা হন। উপাদান-পরিচয়ে খ্যাত প্রকৃতিকে উপাদান কারণ মনে করা ভ্রান্তিমাত্র। শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন। (সত্যযুগের দেবহুতি নন্দন, নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিল নহে ' । (শ্রীঃভাঃ ৩।২৮।৪০) শ্লোকে—

যথোল্মুকাদ্বিস্ফ—লিঙ্গাৎ ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ। অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥" যদিও ধূম জ্বলন্তকাষ্ঠ ও বিস্ফুলিঙ্গে অগ্নির উপাদান বর্ত্তমান থাকায় অগ্নির সহিত একবস্তু বলিয়া উক্ত হয়, তাহা হইলেও উল্মুক হইতে অগ্নি পৃথক বস্তু; ধূমস্থানীয় 'ভূতসমূহ', বিস্ফুলিঙ্গস্থানীয় 'জীব' ও উল্মুকস্থানীয় 'প্রধান', সকলেই অগ্নিস্থানীয় সর্ব্বোপাদান ভগবান্ হইতে শক্তিসমূহ লাভ করিয়াই নিজ নিজ পৃথক্ পরিচয় দেয়, তাহা হইলেও সকলের উপাদানই সেই ভগবান্। জগতের উপাদান বলিয়া যে 'প্রধানকে' স্থির করা হয়, প্রধানে ভগবানের নিহিত উপাদান হইতেই তাদৃশ পরিচয়। 'প্রধান' ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র উপাদানত্বে পৃথক্ বিষয় হইতে পারে না। উপাদানমূলাশ্রয় কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া সাংখ্যের উপাদানত্ব প্রকৃতিতে আরোপ করা—অজার গলদেশস্থিত স্তনাকৃতি-মাংসপিণ্ডের দুগ্ধ প্রদানে অসমর্থতার ন্যায় নিরর্থক নিষ্ফলমাত্র।

মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ। আদ্য-অবতার করে মায়ার দরশন ॥
মায়াশক্তি রহে কারনাব্ধির বাহিরে। কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥
সেই ত' মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি। জগতে উপাদান 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ॥
জগতের কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চরিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ। প্রকৃতি—কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৫।৫৬।৬১।

পতঞ্জলির যোগদর্শন—চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে (যোগসূত্র ১।২)। চিত্ত—প্রখ্যা (জ্ঞান), প্রবৃত্তি (ক্রিয়া) ও স্থিতি (আলস্য) এবং সত্ত্ব, রজ ও তমঃ—এই ত্রিবিধ স্বভাব ও গুণ-সম্পন্ন। চিত্তের জ্ঞানাত্মক সত্ত্বাংশে যখন অল্পমাত্রও রজোগুণ থাকে না, তখন চিত্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সত্ত্ব হইতে পুরুষ ভিন্ন—এইমাত্র জ্ঞান অবস্থিত থাকে। চিত্ত তখন 'ধর্মমেঘ'-নামক ধ্যান-পরায়ণতা লাভ করে। যোগিগণ তাহাকেই শ্রেষ্ঠ 'প্রসংখ্যান' (সম্যক্ বিবেক-জ্ঞান) বলেন। পতঞ্জলির মতে, কেবল জ্ঞানের দ্বারা চিত্ত ধ্বংস হয় না; যোগ-প্রণালী অবলম্বন করিলে চিত্ত যখন বিশীর্ণ হইয়া যায়, উহার বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়, তখনই চিত্ত বিনষ্ট হয়। এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের আট প্রকার প্রণালীর মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বন করিলেই চিত্ত নিরোধ হইতে পারে,—(১) অভ্যাস ও বৈরাগ্য (যোগসূত্র ১।১২) (২) ঈশ্বরের উপাসনা, (ঐ ১।২৩) (৩) প্রাণায়াম (ঐ ১।৩৪), (৪) নাসাগ্র, জিহ্বামূল প্রভৃতিতে ধারণা, (ঐ ১।৩৫), (৫) হৃদ্পদ্মে ধারণা (ঐ ১।৩৬), (৬) নিষ্কাম মহাপুরুষের ধ্যান (ঐ ১।৩৭), (৭) স্বপ্নে মূর্তিবিশেষের কিম্বা সাত্ত্বিক বৃত্তির আশ্রয় (ঐ ১।৩৬), (৮) নিজের রুচি-অনুযায়ী যে কোন বিষয়ের ধ্যান। ঐ ১।৩৯)।

যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, ও সমাধি—"এই আটটিকে যোগাঙ্গ বলা যায় (ঐ ২।২৯)। তন্মধ্যে পাঁচটি বহিরঙ্গ সাধন এবং শেষোক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন (ঐ ৩।৭)। (১) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এইগুলির নাম যম। (২) শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রাণিধান এই কয়টির নাম নিয়ম। (৩) স্বস্তিক ও পদ্ম প্রভৃতি শরীর সংস্থানের নাম আসন। (৪) শ্বাস প্রশ্বাসাত্মক প্রাণের ক্রিয়া বিশেষের নাম প্রাণায়াম। (৫) বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের বিয়োজনের নাম প্রত্যাহার। (৬) নাভিচক্র ও নাসাগ্র প্রভৃতি স্থান বিশেষে নির্ব্বিষয় চিত্তের স্থিরীকরণের নাম ধারণা। (৭) বিষয় বিশেষে চিত্তের একাগ্রতার নাম ধ্যান। (৮) প্রমাণ, বিপর্য্যয়, সঙ্কল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির নিরোধে যে অবস্থা লাভ হয়, তাহার নাম সমাধি।

ধ্যান পরিপক্ক হইয়া ধ্যেয় বস্তুর সহিত যখন ভেদবুদ্ধিশূন্য হয় অর্থাৎ চিত্ত কেবল ধ্যেয় বিষয়াকারেই ভাসমান হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলে (ঐ ৩।৩)। এই সমাধি দুই প্রকার—সবীজ ও নির্বীজ। সবীজ-সমাধিতে চিত্তের অবলম্বন থাকে অর্থাৎ তখন চিত্তের অতিসূক্ষ্ম সাত্ত্বিক-বৃত্তি থাকিয়া যায়। এই সবীজ-সমাধির আর একটি নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি (ঐ ১।১৭)। নির্ব্বীজ-সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তির বিলুপ্তি ঘটে কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে; এজন্য উহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে (ঐ ১।১৮)। সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ-সমাধি আবার সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার ভেদে চতুর্ব্বিধ (ঐ ১।৪২-৪৬)। ইহাদেরও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নির্বীজ সমাধি হয় (ঐ ১।৫১)।

পাতঞ্জলদর্শন চারি পাদে বিভক্ত। এই চারিপাদের নাম যথাক্রমে—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। প্রথমপাদে যোগের উদ্দেশ্য, লক্ষণ, উপায় ও প্রকারভেদ; দ্বিতীয়পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্ম্মফল, কর্ম্মফলের দুঃখত্ব, হেয় (অনাগত দুঃখ), হেয়হেতু (হেয় সংসার বন্ধনের নিদান), হান (অবিদ্যার অভাবে সংযোগাভাব) ও হানোপায় (প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান); তৃতীয়পাদে যোগের অঙ্গ, পরিণাম, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি এবং চতুর্থপাদে কৈবল্য বা মুক্তির কথা দৃষ্ট হয়।

ঈশ্বর—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অনভিভূত ও অস্পৃষ্ট পুরুষ বিশেষ (ঐ ১।২৪)। ক্লেশ—পাঁচ প্রকার; যথা—অবিদ্যা (মিথ্যা জ্ঞান), অস্মিতা (পুরুষ ও বুদ্ধির অভেদ-প্রতীতি), রাগ (সুখ ভোগবিষয়ে আসক্তি), দ্বেষ (দুঃখ ভোগ হইতে জাতবিরক্তি), অভিনিবেশ (মৃত্যুভয়), কর্ম্ম (পাপ ও পূণ্য), বিপাক (কর্ম্মফল, ইহা ত্রিবিধ—জন্ম, আয়ুভোগ), আশয় (বিপাকের অনুরূপ সংস্কার)।

পতঞ্জলির যোগদর্শনে কপিলের সমস্ত তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া তদুপরি ষড়বিংশতি তত্ত্বরূপে পুরুষ বিশেষ

ঈশ্বরের কথা আছে। **কিন্তু এই ঈশ্বর জীব-জগতের কারণ নহেন। সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই।** সাংখ্যে প্রকৃতিই—মূল কর্ত্রী, সাংখ্যেয় মুক্তিই পতঞ্জলির অভিপ্রেত। অনেকে নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্যমতকে 'নিরীশ্বর সাংখ্য যোগ' আর পতঞ্জলির যোগকে 'সেশ্বরসাংখ্যযোগ' বলেন। কারণ, দার্শনিক প্রধান বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই। সাংখ্য—প্রমাণমূলে ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিয়া প্রকারান্তরে ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াছেন; আর পতঞ্জলি বিকল্পে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন—এইমাত্র উভয়ের মধ্যে ভেদ। পতঞ্জলির এই ঈশ্বর স্বীকৃতি সহজভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত নহে। চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ সমাধি কি ভাবে হয়, এই প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য উপায়ের মধ্যে 'ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা' (যোগসূত্র ১।২৩) অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধান (উপাসনা) হইতেও চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে, ইহা বলা হইয়াছে।

যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর সাধন কালে কতকগুলি অলৌকিক শক্তি লাভ হয়, তাহা বিভূতি বা সিদ্ধি নামে প্রসিদ্ধ। সমাধি-রহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা বিভূতি বলিয়া গণ্য হইলেও সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে তাহা উপসর্গ। (ঐ ৩।৩৭)

পতঞ্জলি ঋষির প্রপঞ্চিত যোগ—'রাজ যোগ' নামে খ্যাত। হঠ দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে হঠ যোগের (হঠাৎ বা বলাৎকারের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় বলিয়া ঐ নাম) কথা পাওয়া যায়। হঠযোগের ক্রিয়া অধিকাংশই দেহনিষ্ঠ। ধৌতি, বস্তি, নেতি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের দ্বারা শরীরের শোধন, আসনের দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রা-দ্বারা শরীরের স্থৈর্য্য, প্রত্যাহারের দ্বারা দেহের ধৈর্য্য, প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের লঘুতা, ধ্যানের দ্বারা ধ্যেয়ের সাক্ষাৎকার ও সমাধির দ্বারা নির্লিপ্ততা লাভ হয়—এই-সপ্ত-সাধন সম্পন্ন হঠযোগী পরিণামে মুক্তি লাভ করেন।

রাজযোগের চরম লক্ষ্য হইল কৈবল্য কেবলাবস্থা লাভ। যখন গুনসমূহ পুরুষার্থশূণ্য হওয়ায় উহাদিগের গুনরূপে অবস্থিতি বিনষ্ট হয়, তখন সেই অবস্থাকে অথবা চিতিশক্তি বা চৈতন্যের স্বরূপে অবস্থানকে 'কৈবল্য' বলে। বুদ্ধিসত্তার সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া কেবল চিতিশক্তিরূপে (চৈতন্য মাত্র রূপে। পুরুষের অবস্থানকে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা ও সেই অবস্থায় নিত্য অবস্থানকে কৈবল্য বলা হয়। সাংখ্যের ন্যায় যোগ-মতেও কৈবল্য জীবের অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হয়। কিন্তু দুঃখ-নিবৃত্তির পর পরমানন্দ কন্দ পুরুষোত্তম ও তাঁহার নিত্য উপাসক ও উপাসনার অস্তিত্ব না থাকায় বাস্তব সুখ প্রাপ্তির কোন প্রসঙ্গ নাই।

এইমতের নিরসনও সাংখ্যমত নিরসনের ন্যায় জানিতে হইবে। সাংখ্য মতোক্ত প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান দ্বারা যেরূপ মুক্তি হইতে পারে না, সেইরূপ পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারাও স্বরূপোপলব্ধি হইতে পারে না। পতঞ্জল ঋষি ঈশ্বর স্বীকার করায় অনেকেই মনে করেন যে ইনি যথার্থই একজন ভক্ত। কিন্তু যাঁহারা এই শাস্ত্র ভালভাবে বিচার করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আর ভ্রান্ত হইবেন না। ইহাতে লিখিত আছে "চিচ্ছক্তির স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতির নাম 'কৈবল্য'। এ স্থলে বিবেচ্য এই যে, চিচ্ছক্তির কৈবল্যের অর্থ কি! অর্থাৎ কৈবল্য-প্রাপ্ত জীবের কোন কার্য্য থাকিবে কি না? জীব কৈবল্য লাভ করিলে সাধন দশায় ঈশ্বরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ থাকিবে? উক্ত শাস্ত্রে দুর্ভাগ্যবশত এই প্রশ্নের উত্তর নাই। ঐ শাস্ত্র ভালভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাধন কাণ্ডোক্ত ঈশ্বর কেবল উপাসনা-সিদ্ধির জন্য কল্পিত বস্তু বিশেষ। সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে আর পাওয়া যায় না। এই সকল শাস্ত্র কি সেশ্বর, না নিরীশ্বর? এই সমস্ত নাস্তিক মত দেশে বিদেশে ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে। পাতঞ্জল শাস্ত্রে যে কৈবল্যাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাব মাত্র। কিন্তু কোন চিত্তত্ত্বের আলোচনা তাহাতে লক্ষিত হয় না। নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ব পর্য্যন্ত যে-সকল অবান্তর অবস্থা আছে, যোগশাস্ত্র তন্মধ্যে একটী অবান্তর পদ (প্রুশীয় দেশীয় অধ্যাপক গার্ব্বে নির্ণয় করিয়াছেন যে, গ্রীসের জিনো যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলির শিষ্য।)

যদি এরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, ঈশ্বর একটি অবস্থা বিশেষ, সেই অবস্থায় জীবসমূহ লয় হয়। তাহা হইলে ত

ঈশ্বর-সাযুজ্যবাদ আসিয়া পড়িল। অদ্বৈত বাদের সহিত যদি কোন পার্থক্য না থাকে তবে একমত দুইনামে প্রচারের আবশ্যকতা কি? আর যে সকল জীব কৈবল্য লাভ করে, তাহারা অনেক হইলে কৈবল্য কিরূপে হইবে? সুতরাং যোগ শাস্ত্র ভক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরের জ্ঞান ও ধ্যানাদি ভক্তির অঙ্গ সকলই, মোক্ষ সাধক—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। ভক্তি ভিন্ন মুক্তি হয় না, এ বিষয়ে শাস্ত্রে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে—"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥" "বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধ মৈত্রী তীর্থাভিষেক ব্রতদানজপ্যৈঃ। নাত্যন্ত শুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥" "বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগ য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ। ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং বনিজ ইবাজ সন্ত্যক্তকর্ণধারা জলধৌ॥" "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥ (ভা ১১।১৪।২০) ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপশিক্ষায় যোগপথকে জীবের পক্ষে অনিষ্টদায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'পশ্চিমে' খুদিবে; তাহা 'যক্ষ' এক হয়। সে বিঘ্ন করিবে ধনে হাত না পড়য়॥ 'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ-'অজগরে'। ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥ পশ্চিমে, উত্তরে অজগর ও যক্ষ উহাই জ্ঞান-যোগ মার্গ। কৃষ্ণ-অজগররূপ ও যক্ষরূপ জ্ঞানযোগ-মার্গস্থ দ্বজীবসত্তাকে গ্রাস করে ও যক্ষ ধন রক্ষা কর্ত্তা, প্রদাতা নহে, বিনাশকারী। অতএব জ্ঞান যোগ মার্গ উভয়েই জীবসত্তার সংহারকর্ত্তা। শ্রীরূপপ্রভু "ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।" ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহাকে পিশাচী বলিয়াছেন। কপিল ও পতঞ্জল উভয়েরই মুক্তিস্পৃহা। শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতীপাদও "কৈবল্যং নরকায়তে" ইত্যাদি কৈবল্যকে নরকের তুল্য বিচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিবর বলিয়াছেন:—মন যোগী হ'তে তোমার বাসনা। যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন, নিয়ম, যম, সাধন, প্রাণায়াম, আসন রচনা॥ প্রত্যাহার ধ্যান-ধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী, ফল কিবা হইবে বল না। দেহ মন শুষ্ক করি, রহিবে কুম্ভক করি, ব্রহ্মাত্মতা করিবে ভাবনা॥ অষ্টাদশসিদ্ধি পাবে, পরমার্থ ভুলে যাবে, ঐশ্বর্য্যাদি করিবে কামনা। স্থূল জড় পরিহরি, সূক্ষ্মেতে প্রবেশ করি, পুনরায় ভুগিবে যাতনা॥ ইত্যাদি (কঃ কল্পতরু)।

অক্ষ পাদ গৌতমের ন্যায় দর্শন:—অক্ষপাদ গৌতম বা গৌতম ঋষির ন্যায় দর্শনে একুশ প্রকার দুঃখের কথা আছে। শরীর, ছয় ইন্দ্রিয়, ছয়টি বিষয়, ছয় প্রকার বুদ্ধি—এই উনিশ প্রকার দুঃখ-স্থান, 'দুঃখ' নামে কথিত। (২০)—সুখও দুঃখেরই পরিণাম বলিয়া দুঃখেরই সমান, তাহা দ্বারা (২১)—দুঃখ ত নিজ স্বরূপে বর্ত্তমান আছেই।

ন্যায়সূত্রে ষোলটি পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে,—(১) প্রমাণ (যথার্থ জ্ঞানের উপায়), (২) প্রমেয় (যথার্থ জ্ঞানের বিষয়), (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব (অনুমানের অঙ্গীভূত বাক্য), (৮) তর্ক (অজ্ঞাত বিষয় জানিবার জন্য হেতু প্রভৃতির অনুসন্ধান), (৯) নির্ণয় (মীমাংসা), (১০) বাদ (বিচার), (১১) জল্প (প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা), (১২) বিতণ্ডা (উদ্দেশ্যহীন তর্ক), (১৩) হেত্বাভাস (যাহা হেতু নয় অথচ দেখিতে আপাততঃ হেতুর মত (Fallacy), (১৪) ছল (অন্যের ব্যবহৃত বাক্যের কদর্থ করা বা নানাভাবে প্রতারণার চেষ্টা (quibble), (১৫) জাতি (পরমত-খণ্ডন) ও (১৬) নিগ্রহস্থান (যে যে বিষয়ে প্রতিপক্ষ পরাজিত হইল, তাহার নির্দ্দেশ)। এই ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তিদোষ ও মিথ্যা-জ্ঞানের মধ্যে শেষোক্তটির (মিথ্যা-জ্ঞানের) বিনাশ হইলে তৎপূর্ব্ব-পূর্ব্বগুলির ক্রমে নাশ হয়। সর্ব্বশেষ দুঃখের আত্যন্তিক নাশে অপবর্গ লাভ হয়। (ন্যায়সূত্র)

ন্যায়মতে আত্মা—সর্ব্বব্যাপী। ইহার কোন গুণ নাই। মনের সহিত এবং মনের দ্বারা বিষয়ের সংস্পর্শে জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ গুণ আত্মায় উৎপন্ন হয়। ষোড়শ পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইলে মিথ্যা-জ্ঞান দূর হয়। মিথ্যা জ্ঞান ধ্বংস হইলে রাগ-দ্বেষাদি থাকেনা এবং কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে

আত্মার দেহ ও মনের সহিত সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং সে অবস্থায় আত্মার কোন জ্ঞান বা কোন সুখ-দুঃখ থাকে না। ন্যায়-দর্শনের মতে, ক্লেশের অভাবই হইল অপবর্গ। ইহাতে বাস্তব সুখের কোন কথা নাই।

ন্যায়দর্শনে (৪।১।১৯-২১) জগতের কর্তৃরূপে ঈশ্বরের কথা উত্থাপিত হইয়াছে। জগৎ—কার্য্য; কার্য্যের একজন কর্ত্তা থাকা আবশ্যক। ঈশ্বর ব্যতীত উপযুক্ত কর্ত্তা আর কেহ হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর আছেন। কর্ত্তা—উপকরন ছাড়া কার্য্য করিতে পারেন না। ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টির উপকরণ—পরমাণুসমূহ। বৈশেষিক দর্শনেরও এই মত। ন্যায়দর্শনের মতে জগৎকারণ ঈশ্বরকে না দেখিলেও তাঁহার অস্তিত্ব মানিতে হয়। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, অথচ এই অঙ্কুরটি যে নির্ম্মাণ করিল, সেই কর্ত্তাকে দেখিতে না পাইয়াও যেরূপ অঙ্কুরটির কোন কর্ত্তা আছে (কার্য্য থাকিলেই কারণ আছে)—মানিয়া লইতে হয়, সেইরূপ ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কারণ থাকিলেই যে সেই কারণটি কোনও শরীরী হইবে, এরূপ নহে। সুতরাং ঈশ্বর :—জগতের কর্ত্তা হইলেও যে ঈশ্বরের দেহ থাকিবে, তাহা নহে। ঈশ্বর—কর্ম্মফলের বিধাতা। তিনি পরমাণুদিগকে চালিত করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বেদও সৃষ্টি করিয়াছেন।

ন্যায় শাস্ত্রের আর একটি নাম—'আন্বীক্ষিকী বিদ্যা' অর্থাৎ যে শাস্ত্র অন্বীক্ষা বা পর্য্যালোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করে। ন্যায়দর্শন—অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের ন্যায়ই অনাদিসিদ্ধ। মহর্ষি গৌতম সূত্র-রচনার দ্বারা ঐ দর্শনকে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন, এইমাত্র। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকীকে 'সর্ব্বশাস্ত্রের প্রদীপ, বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন।

ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়—যুক্তিতর্কেরনিরূপণ। নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিটি প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। অনুমান-সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। অনুমানের ও উহার পঞ্চ অবয়বের বিচার ন্যায়শাস্ত্রের একটি বিশেষ কৃতিত্ব। মল্লযুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে শারীরিক বল অপেক্ষা যেরূপ কৌশলের অধিক কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়, সেরূপ প্রতিপক্ষকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রের পরিভাষা ও যুক্তিতর্কের কৌশল বিশেষ কার্যকরী। বৌদ্ধ তার্কিকগণের সহিত তর্কযুদ্ধ করিবার সময় ইহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডনার্থ শ্রীমাধ্বাচার্য্য ও তাঁহার অনুগত সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রাচ্যদর্শনের ইতিহাসে মাধ্বন্যায়ের কূটতর্ক ও সূক্ষ্মযুক্তি অদ্বিতীয়। শ্রীমধ্বাচার্য্যের কথালক্ষণ ও ন্যায় বিবরন, শ্রীজয়তীর্থের ন্যায়সুধা, শ্রীব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত, তর্কতাণ্ডব প্রভৃতি গ্রন্থ, শ্রীবাদিরাজের সুধাটিপ্পনী, যুক্তিমল্লিকা, শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থের সুধাপরিমল প্রভৃতি মাধ্বন্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। "ষড়্দর্শনের মধ্যে সাংখ্য বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ ও মীমাংসা দর্শনে জীব ও পরমাত্মার অত্যন্ত ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের কেবল ভেদবাদই প্রকৃতসিদ্ধান্ত। (তত্ত্বমুক্তাবলী)।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে মূল পদার্থতত্ত্বের আলোচনায়ই প্রধানভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিখণ্ডাত্মক তত্ত্ব চিন্তামনি নামক এক বিস্তৃত প্রমাণ-গ্রন্থ প্রচার করেন। পূর্ব্বতন নৈয়ায়িকগণ ষোলটি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু গঙ্গেশ কেবল প্রমাণ স্বীকার করিলেন। উক্ত চারিটি প্রমানরূপ ভিত্তির উপরই নব্যন্যায়-শাস্ত্রের সৌধ-নির্ম্মিত হইয়াছে। নব্যন্যায়ে কোন কোন স্থানে মূল পদার্থতত্ত্বের অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হইলেও উহা উল্লেখযোগ্য নহে। গঙ্গেশ মহর্ষি গৌতমের মতও স্থান বিশেষে খণ্ডন করিয়াছেন। নব্য-নৈয়ায়িকগণ বাক্য লইয়া বিচার, লক্ষণসমূহের ও বিশেষ পদের খণ্ডন ও ধীশক্তির ব্যায়ামের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িকগণের প্রধান চেষ্টাই হইয়াছিল এইরূপ শব্দ বা ভাষা আবিষ্কার করা, যাহাদ্বারা চুলচেরাভাবে, নিখুঁতভাবে যাহা বক্তব্য, তাহা প্রকাশ করা যায়। গঙ্গেশ নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক হইলেও উহার সংস্থাপক নহেন। তাঁহার পুত্র বর্দ্ধমান, তৎপরে পক্ষধর মিশ্র

রুচিদত্ত, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমনি, জয়রাম তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য্য, দিনকর মিশ্র প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ নব্যন্যায়ের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

মিথিলা-নিবাসী উদয়নাচার্য্য প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্যায়ের সন্ধিস্থলে আবির্ভূত হন। ন্যায়শাস্ত্রে যে অভিনব সম্প্রদায় গঙ্গেশ উপাধ্যায়কে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়াছিল, উহার বীজ উদয়নাচার্য্যের কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে নিহিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ উদয়নাচার্য্যকেই নব্যন্যায়ের আদিপুরুষ বলেন। উদয়নের অভ্যুদয়-কালের উর্দ্ধতম সীমা ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বঙ্গদেশে নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্ত্তকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ছাত্র ছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সময়ে এবং পূর্ব্বে নব্যন্যায়ের বহু গৌড়ীয় গ্রন্থের অস্তিত্ব মিথিলার গ্রন্থকারগণই প্রমাণিত করিয়াছেন। সুতরাং রঘুনাথ নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিবার জন্য মিথিলায় যান নাই। 'শ্রীনিমাই পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন,' এই প্রচলিত গল্পটী অমূলক। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার পিতৃদেব বিশারদের নিকটই নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনিও অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নাই।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের এবং ষড়্‌দর্শনের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়ের পূর্ব্বে নবদ্বীপে অবস্থান কালে গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কৃত তত্ত্বচিন্তামণির উপর টীকা এবং বেদান্তের উপর 'অদ্বৈতমকরন্দ টীকা' রচনা করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পৌত্র (জলেশ্বর বাহিনীপতির পুত্র) স্বপ্নেশ্বর শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্য, সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীর প্রভা-নাম্নী টীকা, ন্যায়শাস্ত্রে 'ন্যায়তত্ত্ব-নিকষ,' ও 'বেদান্ততত্ত্ব-নিকষ' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতিও মহানৈয়ায়িক ও মীমাংসা শাস্ত্রের গ্রন্থকার ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ তাঁহার পদ্যাবলী-গ্রন্থে বাহিনীপতির রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলাপর একটি শার্দূল বিক্রীড়িত-ছন্দাত্মক শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন (পদ্যাবলী ৩১৭ তম শ্লোক)। এই বাহিনীপতি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পুত্র হইতে পারেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আত্মজ শ্রীবলরামের বংশে রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি (সপ্তম-অধস্তন) নব্যন্যায়-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিশ্বনাথের ন্যায়সূত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নবীনভাবে ন্যায়সূত্রবিবরন-গ্রন্থ এবং কুসুমাঞ্জলি-কারিকার 'হরিদাসী টীকা'র উপর 'ব্যাখ্যাপ্রকাশ'-নামক উপটীকা রচনা করেন। তিনি নব্যন্যায়ের পত্রিকা রচনা করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করেন।

ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক-দর্শনে পরমাণুকারণবাদ জগতের উৎপত্তির কারণ-রূপে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। কিন্তু জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সৃষ্টিশক্তি বা তাহাতে আনন্দ ময়তা নাই, এজন্য ঐ সকল মত বেদান্তে খণ্ডিত হইয়াছে।

ঔলুক্য কণাদের বৈশেষিক দর্শন—উলূকের পুত্র ঔলুক কণাদ বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। তিনি তণ্ডুলকণা ভক্ষন করিয়া জীবনধারণ করিতেন, এজন্য তাঁহার নাম কণাদ হইয়াছে। কণাদ—অভ্যুদয় (সমুন্নতি) ও নিঃশ্রেয়স (আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি) যাহা হইতে লাভ হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়াছেন। যে সকল দ্রব্যের তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়, তাহাদের নাম পদার্থ। পদার্থ ছয়টি—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে একটা আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে। সকল গাভীতেই গোত্ব সমান আছে, সুতরাং গাভীতে সেই গোত্ব সামান্য; কিন্তু অন্য প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করিলে গাভীর উহা বিশেষ। কারণ, গোত্বের দ্বারাই অ-গো হইতে গাভীকে বিশিষ্ট বা পৃথক করা হয়। দ্রব্যের মধ্যে গুন ও কর্ম্ম আছে, কিন্তু উহাদের দ্রব্যের বাহিরে স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার শক্তি নাই। গুন ও কর্ম্মের সহিত দ্রব্যের যে আধার ও আধেয় সম্বন্ধ, তাহাই সমবায়। ইহাছাড়া কণাদ অভাবের চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। যথা—(১) প্রাক্-অভাব, যেমন—ঘট নির্ম্মিত হওয়ার পূর্ব্বে উহার অভাব; (২) ধ্বংস-অভাব—ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলে উহার যে অভাব হয়; (৩) অন্যোহন্য-অভাব—মনুষ্যত্বে প্রস্তরত্বের এবং প্রস্তরত্বে মনুষ্যত্বের যে পরস্পর অভাব; (৪) অত্যন্ত-অভাব—যে জিনিষের অস্তিত্ব মোটেই নাই, কোন দিনই ছিল না বা থাকিতে পারে না বলিয়া বিবেচনা করা যায়। যেমন—ঘোড়ার ডিম, আকাশ কুসুম ইত্যাদি। (বৈশেষিক দর্শন ৯ম অধ্যায় ১ম আহ্নিক)।

বৈশেষিক মতে প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। বৈশেষিক দর্শনে আত্মার ব্যক্তিত্ব ও বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মা তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য যাহা অর্জ্জন করে, তাহার নাম অদৃষ্ট। সুতরাং অদৃষ্ট—কৃতকর্ম্মের সঞ্চিত শক্তি। আত্মার দেহত্যাগ ও নূতন দেহে প্রবেশ প্রভৃতি কার্য্য উক্ত অদৃষ্টের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অদৃষ্টের বিনাশ হইলেই আত্মার গতি ঊর্দ্ধ হয় এবং আত্মা মুক্ত হইতে পারে। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের আলোচনা বৈশেষিক দর্শনে নাই। সৃষ্ট বা দৃশ্যমান জগতের পদার্থ-সমূহের প্রাথমিক জ্ঞান-প্রদান করাই বৈশেষিক দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। "তদ্বচনাং আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" বৈশেষিক দর্শন ১।১।৩ এই সূত্রে 'তৎ' এই সর্ব্বনামের দ্বারা ঈশ্বরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া কোন কোন টীকাকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। টীকাকার এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—জাগতিক সকল বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বের দ্বারা গঠিত। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অবয়বকে পরমাণু বলে। পরমাণুসমূহও বিভিন্ন জাতীয়। ইহারা প্রত্যেকে এক একটি বিশেষ—ইহাদের মধ্যে এমন কিছু ধর্ম্ম আছে, যাহার দ্বারা এক পরমাণু হইতে অপর পরমাণুর পার্থক্য স্থাপিত হয়। এই দর্শনে এই বিশেষ পদার্থ উপদিষ্ট হওয়ায় ইহাকে 'বৈশেষিক দর্শন' বলে। বৈশেষিক সূত্রের অন্যত্র মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ জীব বেদ কথিত অদৃশ্য দেবতা এবং বেদবক্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা ইঙ্গিতে পাওয়া যায়। যথা—"সংজ্ঞাকর্ম্ম তস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্॥" ২। ঐ ২।১।১৮ অর্থাৎ মনুষ্যগণ হইতে শ্রেষ্ঠ জীব অদৃশ্য দেবতাগণ যে আছেন, তাহা বেদে কথিত, তাঁহাদিগের নাম ও কর্ম্ম হইতে জানা যায়। "প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তত্বাৎসংজ্ঞা কর্ম্মণঃ—" ৩। ঐ ২।১।১৯ বেদোক্ত দেবতাগণের নাম ও কর্ম্ম অবশ্য বেদবক্তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—এইটুকু মাত্র বৈশেষিকের ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আলেচনা। বৈশেষিক ক্রমশঃ ন্যায়ের সঙ্গে বা উভয়ে উভয়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

পরমাণু-কারণ বাদ—কণাদের বৈশেষিক ও গৌতমের ন্যায়মতকে আরম্ভবাদ বা পরমাণু-কারণবাদ বলা হয়। পরমাণু (পরম+অণু=ক্ষুদ্রতম নিরংশ) হইতে দ্ব্যণুকাদি-ক্রমে ক্রমশঃ স্থূলতর হইয়া এই বিরাট বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। পরমাণু এত সূক্ষ্ম পদার্থ যে তাহা মানুষের চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না; সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ দৃশ্য কোনও পদার্থই ছিল না। অসৎ হইতে সতের সৃষ্টি হইয়াছে। এজন্যই ইহার নাম অসৎকার্য্য-বাদ; ইহাই আরম্ভবাদের মূল। সৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিপ্রকার পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক্, মন, ঈশ্বর ও অসংখ্য জীবাত্মা এই কয়প্রকার চক্ষুর অগোচরীভূত নিত্য বস্তু বর্ত্তমান ছিল। সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে অতিসূক্ষ্ম পরমাণু-সকল পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রমশঃ স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম পৃথিবী উৎপাদন করিতে থাকে। ন্যায়সূত্রে বলা হইয়াছে,—ব্যক্ত (যাহা অব্যক্ত বা প্রকৃতি নহে—কারণ হইতেই ব্যক্ত-কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। এই সূত্রের বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে ও জয়ন্তভট্ট-কৃত ন্যায়মঞ্জরীতে পরমাণুকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য (শঙ্করাচার্যকৃত বৃহদারণ্যক ভাষ্য ৪।৩।২২) স্বয়ং ও তাহার শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য তৎকৃত 'মানসোল্লাস'—গ্রন্থে (২য় অধ্যায়ে) আরম্ভবাদের বর্ণনায় "আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতম, উভয়েই পরমাণুকেই জগৎকারণ বলিয়াছেন" ইহা জানাইয়াছেন। এজন্য আরম্ভবাদের অপর নাম পরমাণুকারণ বাদ। শ্রীচৈতনাচরিতামৃতে,—"ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়" (চৈঃ চ মধ্য ২৫।৫০) এইরূপ উক্তি হয়। তথায় বৈশেষিক দর্শনের সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে কোন কথা বলা হয় নাই' ইহার কারণ, বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক উভয়েই পরমাণু-কারণবাদী অর্থাৎ উভয়েই পরমাণু হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে" "এই আরম্ভবাদ বা পরমাণুকারণবাদ-স্বীকার করিয়াছেন।

জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসা—মীমাংসা-শব্দের অর্থ—বিচার বা সিদ্ধান্ত। বেদের পূর্ব্বভাগস্থ যাগ-যজ্ঞাদি সম্পাদন-বিষয়ে যে সকল বিচার ও আলোচনা ধর্ম্ম সূত্রাদিতে দেখা যায়, তাহাকে 'পূর্ব্ব মীমাংসা' এবং বেদের উত্তরভাগস্থ উপনিষদ্‌ বা বেদান্ত সম্বন্ধে যে বিচার ও সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রাদিতে দৃষ্ট হয়, তাহাকে 'উত্তর মীমাংসা' বলে। এক সময় উক্ত উভয় মীমাংসাকে মিলিতভাবে একশাস্ত্র মনে করা হইত। কোন কোন প্রাচীন ভাষ্যকার পূর্ব্ব

মীমাংসার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বশেষ সূত্র 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' এই পর্য্যন্ত একটি গ্রন্থ ধরিয়া তাহার উপর ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসার মতে 'বেদ' বলিতে 'মন্ত্র' ও 'ব্রাহ্মণ' বুঝায়, উপনিষদ্—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়ার যে সকল বিধি-নিষেধ আছে তাহাদের তাৎপর্য্য সুব্যক্ত এবং বিরোধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য জৈমিনির মীমাংসা-সূত্র গ্রথিত হইয়াছে। মীমাংসা-সূত্রে বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ অনাদি ও নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই। জৈমিনি বলেন,—জগৎ অনাদি, সুতরাং তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার অপেক্ষা রাখে না। কর্ম্ম—আপনার ফল আপনিই প্রদান করে। কাজেই, কর্ম্মফলদাতৃরূপেও ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই। মীমাংসাদর্শনে পাপ-পুণ্যের ফল স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম যেরূপ স্বয়ংই তাহার কার্য্য করিয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্মও নিজের ফল নিজেই প্রদান করে। আত্মা—বহু এবং তাহা অসৃষ্ট ও অমর। তাহারা কর্ম্মানুসারে দেহ লাভ করে ও সৎকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করিয়া থাকে। সকল সময়েই কর্ম্মের ফল সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায় না। যজ্ঞাদি-ক্রিয়া যে শক্তি সৃষ্টি করে, মীমাংসার পরিভাষায় তাহার নাম 'অপূর্ব্ব'। এই 'অপূর্ব্ব' যাজ্ঞিকের আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে অথবা অন্য কোথাও অবস্থান করে এবং সময় মত ফল দান করে। যজ্ঞাদি-কর্ম্মই পুরুষার্থলাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় এবং তাহার ফল স্বর্গলাভই—পরমপুরুষার্থ। জগৎ—দ্রব্যময় ও দেবময়। ইহাতে বহু আত্মা বহুভাবে বিচরণ করিতেছে এবং বহুবিধ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। মীমাংসকেরা ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তথায় যজ্ঞরূপ কর্ম্মই প্রধান লক্ষ্যবস্তু—ইন্দ্রাদি দেবতা নহে; কারণ তাঁহারা প্রয়োজক নহেন। জৈমিনিসূত্রে (৯।১।৬) পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে—অতিথি যেমন আতিথ্যকর্ম্মে প্রধান বলিয়া ঐ কর্ম্মের প্রয়োজক, দেবতাও সেইরূপ প্রধান বলিয়া যাগকর্ম্মের প্রয়োজক হউক। কারণ, দেবতার পূজাই যাগ-পদবাচ্য—দেবতার ভোজনের জন্যই দ্রব্য ত্যাগ করা হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা করিতে গিয়া জৈমিনি যে সূত্র করিয়াছেন, শবর-স্বামী তাহার ভাষ্যে বলিলেন—না, দেবতাই যজ্ঞাদি-কর্ম্মের প্রয়োজক নহে। "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে জানা যায় যে, সাধ্যস্বরূপ যাগই—ফলজনক বলিয়া বিধেয়; আর দ্রব্য-দেবতাদি সিদ্ধস্বরূপ বলিয়া তাহার গুণভূত (৯।১।৯)। জৈমিনির মতে দেবতা মন্ত্রাত্মক; দেবতার যে মন্ত্র বেদে লিখিত আছে, সেই মন্ত্রই দেবতা, তদ্ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নাই। আর ঐ মন্ত্র—যজ্ঞ বা কর্ম্মের অঙ্গবিশেষ। কারণ, মন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণ ব্যতীত যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা ফল লাভ হয় না। সোমাদি দ্রব্য যেমন যজ্ঞফলোৎপত্তির গৌণ কারণ, মন্ত্রাত্মক দেবতাও সেইরূপ কর্ম্মের অঙ্গমাত্র।

পূর্ব্বমীমাংসকগণের নিরীশ্বরতার অপবাদ মোচন করিবার জন্য আধুনিক কেহ কেহ বলিয়াছেন,—মীমাংসকগণ অনেকটা দায়ে ঠেকিয়াই নিরীশ্বর সাজিয়াছেন; পাছে ঈশ্বরকে স্রষ্টৃরূপে স্বীকার করিলে তাঁহাকে বেদকর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, এই আশঙ্কায় মীমাংসকগণ (ভাট্টপ্রভাকরগণ) তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, মীমাংসকগণ ঈশ্বরের বিগ্রহ মানিতে রাজি কি না? মানবের প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানে এ পর্য্যন্ত কোন নিত্য শরীরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই কারণেই কুমারিল বলিয়াছেন,—ঈশ্বরের নিত্যবিগ্রহের অস্তিত্ব কেবল অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধ করা অসম্ভব। কোন মীমাংসক বলেন, দেবশরীর—মন্ত্রময়, ইন্দ্র ও ইন্দ্র-স্তুতিপর মন্ত্র অভিন্ন। অন্য মতে—ইন্দ্র-শব্দটি ব্যতীত ইন্দ্রের কোন সত্তাই নাই। তাঁহারা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় নামী অপেক্ষা নামের মহাত্ম্য-খ্যাপনে বিশেষ উন্মুখ।

ঐ সকল যুক্তির গোড়ায়ই গলদ রহিয়া গিয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদের অনুসরণে মায়াবচ্ছিন্ন, ঔপাধিক ও অনিত্য ঈশ্বরকেই আদর্শ করিয়া যে নিরীশ্বর ও সেশ্বর মতের নির্ব্বাচন, তাহা শ্রুতিশাস্ত্র-বিচার-সঙ্গত নহে। কুমারিল-ভট্ট পরমাণুকারণবাদ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে যে ঈশ্বরের বিগ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নহে বলিয়া যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই যুক্তি হইতেই অধ্যাপক কীথ্ সাহেব বলিয়াছেন যে, জড়সৃষ্টির পূর্ব্বে স্রষ্টার অস্তিত্ব কুমারিল হাস্যাস্পদ বলিয়াই

মনে করেন। অথচ শরীর না থাকিলে স্রষ্টার সৃষ্টির জন্য ইচ্ছাই বা কিরূপে হইতে পারে? যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে স্রষ্টার শরীর ছিল বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আর একটি কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সৃষ্টি-ক্রিয়া আরম্ভের পূর্ব্বেও জড় পদার্থের সত্তা ছিল। যদি তাহাই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রজাপতির সৃষ্টি-কার্য্যই ব্যাহত হইয়া যায়, অর্থাৎ মীমাংসক কুমারিলের মতে স্রষ্টা হইলেন প্রজাপতি এবং তাঁহার শরীর সৃষ্ট বস্তুরই অন্যতম। বস্তুতঃ বেদান্তের সিদ্ধান্ত ইহা নহে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-সূত্রে ও শ্রুতিতে পরব্রহ্মের ইচ্ছা ও ঈক্ষণ-প্রভাবে যে সৃষ্টির কথা আছে এবং শ্রুতি-সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্মের যে মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা সৃষ্ট-পদার্থ বা জড়ের অন্যতম নহে। পরব্রহ্মের ইন্দ্রিয়সমূহ সমস্তই অপ্রাকৃত। পরব্রহ্ম—সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহাতে সকলই সম্ভব। প্রজাপতি বা প্রকৃতি, কেহই জগতের স্বয়ংসিদ্ধ মূলস্রষ্টা নহেন। পরব্রহ্মের শক্তিতেই তাঁহাদের সৃষ্টি-সামর্থ্য। যাঁহারা পরব্রহ্মের এই সর্ব্বকারণ-কারণত্ব, সর্ব্বতন্ত্রস্বাতন্ত্র্য, অচিন্ত্যশক্তিমত্তা ও সচ্চিদানন্দময়-শ্রীবিগ্রহত্ব স্বীকারে যতটা কুণ্ঠিত, তাঁহারা ততটা নিরীশ্বর। মীমাংসকগণ-কর্ত্তৃক দেবতা অপেক্ষা দেবতার নামের নিত্যত্ব-স্বীকৃতি অর্থাৎ শব্দ-প্রামাণ্য স্বীকার, বৈষ্ণবদিগের নামী অপেক্ষা নামের মাহাত্ম্য-স্বীকারের ন্যায়, এই যুক্তিটিও অত্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল ও হাস্যাস্পদ। বৈষ্ণবগণ নামীকে যেরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মনে করেন, নামকেও সেইরূপই চিন্তামণি-স্বরূপ বলিয়া অনুভব করেন। বৈষ্ণবগণের নাম ও নামী, ভিন্ন নহেন, উভয়েই—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত ও চৈতন্যরসবিগ্রহ। নাম ও নামী, উভয়েই সমভাবে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র—স্বরাট। এতৎপ্রসঙ্গে "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥" প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্রের বাক্যই প্রমাণ। তাঁহারা মীমাংসকগণের যে 'মন্ত্রব্যতীত দেবতার শব্দব্যতীত কোন সত্তা নাই' একথা বলেন না। নামী ও নামের উভয়েরই সত্তা ও স্বরূপ নিত্য বিরাজিত। মীমাংসকগণের দেবতাগণ স্বাধীন নহেন, কর্ম্মের অধীন।

শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ পূর্ব্বমীমাংসাকে পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তরমীমাংসাকে নির্ণেয় উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত বলিয়া বিচার করিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন পূর্ব্বপক্ষ হওয়ায় তাহা নিরপেক্ষ বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নহে, উত্তরমীমাংসার অপেক্ষাযুক্ত। সুতরাং উত্তরমীমাংসাই নিরপেক্ষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বমীমাংসার সার্থকতা ও উপযোগিতা এইমাত্র যে, উহার যে-সকল অংশ বেদান্তের অবিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল অংশই বেদান্তের পোষক এবং কোন কোন বিষয় চিত্ত-শুদ্ধির সহায়ক। ভুক্ত-বৈরাগীর যেরূপ সহজেই ভোগের দুঃখজনকতা ও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি হয়, সেইরূপ কর্ম্মকাণ্ডের সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ হইলে বেদেরই ব্রহ্মকাণ্ডগত বাক্যের দ্বারা যখন কর্ম্মপ্রাপ্য স্বর্গাদি-সুখের নশ্বরতা, স্বর্গ প্রভৃতি-জাত সুখের স্বরূপ বিচারের ফলে উহার পরিণামে দুঃখদায়কত্ব ও ব্যভিচারিত্বের জ্ঞান স্বভাবতই উদিত হয়, তখনই ব্রহ্মবস্তুই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অব্যভিচারী আনন্দস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ—সাধু ও শাস্ত্রের কৃপায় এই জ্ঞানলাভ হইতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার জন্য উত্তরমীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করিবার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। (পরমাত্মসন্দর্ভ ১০৫ অনু)

জৈমিনির পুরুষার্থের বিচার—স্বর্গপর্য্যন্ত। তাঁহার মন্ত্রাত্মক দেবতাও কর্ম্মের অঙ্গ; আর সেই কর্ম্ম দ্রব্যময়। সুতরাং দ্রব্যসম্পদ যাঁহার আছে, তিনিই যজ্ঞে অধিকারী। এইরূপ বিপুল কষ্টসাধ্য যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গরূপ ফল লাভ হয়, তাহাও চিরস্থায়ী নয়। বিশেষতঃ মূলবস্তু যে পরব্রহ্ম, তাঁহার সম্বন্ধরহিত হইয়া কেবল কর্ম্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা কখনও নিঃশ্রেয়স লাভ হইতে পারে না। ইহাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।

এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥ (মুণ্ডক ১।২।৭)

ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও পত্নী—এই অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া যে (বিষ্ণুতোষণপর না হওয়ায়) নিকৃষ্ট কর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, যজ্ঞনির্ব্বাহক সেই অষ্টাদশ জনই বিনাশী। তাঁহারা অনিত্য। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি এই কর্ম্মকে মঙ্গললাভের উপায় বলিয়া আদর করে, তাহারা কিছুকাল স্বর্গভোগের পর পুনরায় জরা-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)। নিত্যবস্তু কর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন হয় না, এইরূপে কর্ম্মলভ্য ফলসমূহকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ কর্ম্ম হইতে বিরত হইবেন এবং ব্রহ্মকে জানিবার জন্য যজ্ঞ-কাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর অভিগমন করিবেন।

বেদান্তদর্শন বা উত্তরমীমাংসা—উপনিষদের এই বিচার হইতেই কর্ম্মের অনিত্যতা আলোচনা ও অনুভব করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট অভিগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবার জন্য বেদান্তসূত্রের সূচনা হইয়াছে। এই বেদান্তসূত্রের রচয়িতা—বাদরায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ইনিই বেদের বিভাগকর্ত্তা এবং মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের প্রণেতা। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমাধিস্থ চিত্তে প্রথমে সূক্ষ্মাকারে ও পরিশেষে বিস্তৃতরূপে যে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব হয়, তাহাই ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ-ভাষ্য। ইহা শ্রীব্যাসদেবের প্রকটিত বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও শ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রমুখ আচার্য্যগণ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় মায়াবাদ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী মহোদয়ও বলিয়াছিলেন,—**যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে। শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হইতে।** 'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।' 'সাংখ্য' কহে—'জগতের প্রকৃতি কারণ'॥ 'ন্যায়' কহে—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়'। 'মায়াবাদী' নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে 'হেতু' কয়॥' 'পাতঞ্জল' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান'। 'বেদমতে' কহে তাঁরে 'স্বয়ং ভগবান্'॥ ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন। সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন॥ 'বেদান্ত'-মতে,—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ। 'নির্গুণ' ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ'। পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে। **স্ব স্ব**-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥ তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি। 'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫। ৪৮-৫৭)। তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ (মঃ ভাঃ বঃ পঃ অঃ ১১১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার। তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্বসার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৫৭)। ন্যায়াদি পঞ্চ দর্শনই লোকোত্তর ঋষিগণের মহামনীষার সাক্ষ্যস্বরূপ; তাহাতে ঈশ্বর-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও তদ্দ্বারা বাস্তব সত্য নির্ণীত হয় না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশাবতার ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস সুসম্বদ্ধভাবে যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন প্রকট করিয়াছেন, তাহাতে বেদ ও উপনিষদের তাৎপর্য্য গ্রথিত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্ত-দর্শন বেদের ন্যায় অভ্রান্ত সত্য। সেই ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীব্যাসদেবই ভক্তি-সমাধিযোগে স্বতঃসিদ্ধ-সূত্রভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত জগতে প্রকট করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমদ্ভাগবতরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, তদানীন্তন প্রসিদ্ধ অদ্বৈত-বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং কাশীর মায়াবাদ-গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বেদান্তের সার্ব্বদেশিক তাৎপর্য্য ও রহস্য কৃপাপূর্ব্বক বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে জানাইয়াছেন। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—অদ্বিতীয় মহাজন।** তিনি আংশিক বা আপেক্ষিক শক্তিসম্পন্ন ঋষি, মহর্ষি, মনীষী বা মহামানব নহেন; তিনি ভ্রম-প্রমাদাদির অতীত সর্ব্ববেদারাধ্য সর্ব্বদেবারাধ্য শ্রীভগবৎপাদপদ্ম। আর ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপ্রণীত। অতএব নানা মুনির নানা মত বা নানা মুনির ব্যাখ্যাত নানা প্রকার দর্শনের নানাপ্রকার মতবাদ এবং নানা মতবাদী আচার্য্যগণের নানাপ্রকার মতবাদপূর্ণ ভাষ্যের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ না করিয়া সেই সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি অদ্বিতীয় মহাজনের (স্বয়ং ভগবানের) পদানুসরণ করিলেই সনাতনধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যাইবে। তর্কবহুল, বিবাদমান মতবাদসমূহকেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উহাদের উপযুক্ত স্থান প্রদান করিয়া শ্রীভাগবতসিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বিত করিয়াছেন। কোন মতবাদী যখন তাঁহার মতবাদ স্থাপন করিতে উদ্যত হন, তখন তিনি শাস্ত্রের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া স্বীয় মনীষার প্রখরতা ও প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা লোকের বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া দেন। বিভিন্ন দর্শনকারগণের বিভিন্ন মতবাদ-স্থাপন-চেষ্টার মধ্যে ইহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস উক্ত ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদ (শ্রুতি)—এই ছয় সিদ্ধান্ত সম্যগ্‌ভাবে আলোচনা করিয়া বেদান্তসূত্র রচনা করেন। সেই বেদান্তসূত্রে চিদ্বিলাস, সবিশেষও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ব্রহ্মের বর্ণনা আছে। তাঁহার প্রাকৃত রূপ নাই বলিয়া তাঁহাকে 'নিরাকার', প্রাকৃত বিশেষ নাই বলিয়া 'নির্ব্বিশেষ' ও প্রাকৃত গুণ নাই বলিয়া 'নির্গুণ' প্রভৃতি ব্যতিরেক বিশেষণ তাঁহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ-বিগ্রহবান্ সচ্চিদানন্দাকার। তাঁহার শক্তির বৈচিত্রী আছে, তিনি লীলাময় অপ্রাকৃত-গুণসমুদ্র। বেদান্তদর্শনে পরমেশ্বরকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া প্রথমসূত্রেই স্থাপন করিয়াছেন। নিরীশ্বর কপিলের 'প্রকৃতি জগৎকারণ বিচার', মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণ ব্যতীত প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইতে পারে না—এই বাক্যে খণ্ডিত হইয়াছে।

ষড়্‌দর্শনের পরমপণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদ শ্রীগৌরহরির কৃপায় ভাগবত-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন,—"আমি কণাদের বৈশেষিক মত জানিয়াছি, অক্ষীক্ষিকি অর্থাৎ ন্যায় দর্শনের সহিত পরিচিত আছি, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, সাংখ্য-দর্শনের পথও আমার বিজ্ঞাত, পতঞ্জলির যোগদর্শনেও আমার বুদ্ধি বিস্তৃত আছে। বেদান্তশাস্ত্রও আমি বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছি, কিন্তু শ্রীনন্দনন্দের কোন মুরলীমাধুর্য্যপ্রবাহ স্ফুরিত হইয়া সবেগে আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। (পদ্যাবলী ৯৯ সংখ্যা।

শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীনৃসিংহপুরাণোক্তে বৈষ্ণবরাজ শ্রীযমের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—"ফণি (যোগদর্শনকার শেষাবতার পতঞ্জলি), কণাদ (বৈশেষিক দর্শনকার), শঙ্কর-মত (পাশুপত বা রুদ্রোক্ত প্রচীন মায়াবাদ-শাস্ত্র সমূহ), দশবল বৌদ্ধমত (দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য ধ্যান, প্রজ্ঞা, বল, উপায়, প্রণিধি ও জ্ঞান—বুদ্ধের এই দশটি বল ছিল বলিয়া তাঁহার একটি নাম—'দশবল'; পঞ্চশিখ সাংখ্যমত (কপিল আসুরিকে ও আসুরি পঞ্চশিখকে সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করেন। এই পঞ্চশিখ হইতে সাংখ্যশাস্ত্র প্রচারিত হয়" | বামনপুরাণ, ৫০ মহাভারত-শান্তিপূর্ব্ব), অক্ষপাদ (ন্যায়শাস্ত্রকার,—গৌতম, শ্রেষ্ঠ-লোকরঞ্জক স্বর্গাদি-কামনাপূরক (পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্র অথবা লোকায়ত চার্ব্বাকমত, অথবা লৌকিক শাস্ত্রসমূহ) উত্তমরূপে বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়াছি যে শ্রীভগবানের উপাসনা ব্যতীত সিদ্ধি অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ হয় না।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন:—কেশব, তুয়া জগৎ বিচিত্র। করম বিপাকে, ভববন ভ্রমই, পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র॥ তুয়া পদবিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা, ক্লেশ-দহনে দহি যাই। কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী, জৈমিনী বৌদ্ধ আওয়ে ধাই॥ তব কই নিজ মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত, পাতই নানাবিধ ফাঁদ। সো সব্ বঞ্চক, তুয়া ভক্তি বহির্ম্মুখ, ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ॥ বৈমুখ-বঞ্চনে, ভট সো সব্, নিরমিল বিবিধ পসার। দণ্ডবৎ দূরতঃ, ভকতিবিনোদ ভেল, ভকতচরণ করি' সার॥

যে সকল আচার্য্যগণ শাস্ত্রের গূঢ় মঙ্গলময় উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া স্বকপোল কল্পিত নিজমত পোষনার্থে বেদবিরুদ্ধ ও ভক্তিবিরুদ্ধ ভাষ্যাদি রচনা করিয়া অজ্ঞলোকগণকে বিমুখমোহিনী মায়ার বশ করিয়া রাখিবার জন্য মায়াকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ও প্রকারভেদ বহুতর হইলেও মোটামুটি তাঁহাদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে শুদ্ধ বেদানুগ ও পরে ভক্তিপর ভাষ্যকার মহাজনগণের ভাষ্যে প্রকাশিত সিদ্ধান্ত আলোচনা করিবার প্রয়াস হইবে। যে সকল সিদ্ধান্ত ও জ্ঞানের প্রভাবে শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হওয়া যায়; সেই সকল সিদ্ধান্তবিৎ মহাজনগণের যে সকল সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন তাঁহাই জীবের পরমার্থের সহায়ক।

চার্ব্বাক মত:—ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তি বা নশ্বর তুচ্ছ ইন্দ্রিয়জ সুখের লালসা হইতেই চারু (আপাতমনোরম) বাক্ (বাক্য) যাহার, সেই ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ অর্থাৎ চার্ব্বাকমতের অভ্যুদয় হইয়াছে। বৃহস্পতি এই

চার্ব্বাক দর্শনের প্রণেতা বলিয়া কথিত। (পদ্ম পুঃ উঃ ৯৩ অঃ)। চার্ব্বাক-মতে এই স্থূলদেহই আত্মা, অঙ্গনা-আলিঙ্গন-জনিত সুখই পুরুষার্থ এবং কণ্টকাদি-ব্যথার জন্য দুঃখই নরক। লোক প্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর, অন্য কোনও পরমেশ্বর নাই। স্থূল দেহের নাশই মুক্তি। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ ধূর্ত্তদিগের প্রলাপবাক্য। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু—এই চারিটি তত্ত্ব। আকাশ প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং তাহা তত্ত্বের মধ্যে স্বীকৃত নহে। এই চারি তত্ত্বই দেহরূপে পরিণত হয়। সুরায় যেরূপ প্রকৃতিজাত বৃক্ষবিশেষের নির্যাসহেতু মদশক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ দেহের স্বভাবশতঃই উহাতে চৈতন্যের উদয় হয়। শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যও বিনষ্ট হয়। দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে উহা আর ফিরিয়া আসে না। অতএব যে কোন উপায়ে এই জড়জগতটাকে ভোগ করিয়া যাও। সুখের সহিত যে দুঃখ মিশ্রিত আছে অথবা পদে পদে বিঘ্ন আছে, তাহা দেখিয়া ভোগ হইতে পশ্চাৎপদ হইও না। এই চারু (আপাতমনোহারী বা প্রেয়ঃ) বাক্‌যুক্ত চার্ব্বাক-মতের নামান্তর "লোকায়ত" অর্থাৎ লোকে বা জনসাধারণের মধ্যে যাহা সহজেই আয়ত (বিস্তৃত) হয় (ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়)। মনুসংহিতার মেধাতিথির ভাষ্যে (মঃ সং ভাঃ ২।১১; ১২।১০৬) দেখা যায়, লোকায়তগণ তর্কবিদ্যায় পটু ছিল। পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্য হইতে জানা যায়, ভাগুরী লোকায়াত-শাস্ত্রের একটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন (ব্যাকরণ মহাভাষ্য ৭।৩।৪৫)। বৃহদারণ্যকোপনিষদে 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইতি" (মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা অর্থাৎ চেতন থাকে না)—মন্ত্রে (বৃঃ অঃ ২।৪।১২) চার্ব্বাক-মতের অনাদি অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৮।৮।৪,৫) দেহাত্মবাদী বিরোচনের কথা দৃষ্ট হয়। মহাভারতে (শাঃ পঃ ১১৮) চার্ব্বাকদিগকে হেতুবাদী বলা হইয়াছে। শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণে (অযোধ্যাকাণ্ড ১০৮ সর্গ) দেখা যায়, জাবালি ঋষিও চার্ব্বাক-মতের ন্যায় মত প্রচার করিয়াছিলেন। মখলি-পুত্র গোশাল (মহাবীর-ও বুদ্ধের সমসাময়িক) এবং তাহাদের অনুগত আজীব-সম্প্রদায়ের মতও অনেকটা চার্ব্বাক-সম্প্রদায়ের মতের অনুরূপ। শাক্যসিংহ বুদ্ধের সময় দেহাত্মবাদমূলক মতের প্রচার ছিল, মজ্ঝিমনিকায়ে বুদ্ধদেব উহার বিবৃতি দিয়াছেন। কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই জাতীয় মত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারে প্রচারিত হইয়াছে।

এক্ষণে চার্ব্বাকের মত বিচার করা যাইতেছে :—চারু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের রোচক যে বাক্য তাহাই চার্ব্বাক-মত। ইনি কেবল প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ শব্দে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই প্রত্যক্ষ। বাক্য পদার্থটী ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত, যদি ইন্দ্রিয় ব্যতীত সমস্তই অপ্রমাণ হয়, তবে তাহার নিজের বচনও ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত বলিয়া অপ্রমাণ। শিষ্যের শাস্ত্রজ্ঞান উৎপাদনের জন্য গুরু-কর্ত্তৃক বাক্য উচ্চারণ আবশ্যক, যদি ঐ বচন প্রমাণ না হয় তাদৃশ অপ্রমাণবচন চার্ব্বাকও প্রয়োগ করিতে পারেন না। এতএব শিষ্যের নিকট মূকই হইতে হয়। "প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ"—এতাদৃশ বাক্য যদি প্রমাণজনক হয়, তাহা হইলে উক্ত বাক্যেরও অর্থচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। উক্ত বাক্যকে যদি প্রমাণজনক বলিয়া স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলেও বাক্যার্থের চ্যুতিই হইয়া থাকে। যেহেতু পণ্ডিতগণ অযথার্থ বাক্যকেই অপ্রমাণ বলিয়া থাকেন। নিজ কথিত শাস্ত্রকে প্রমাণ স্বীকার করিলে, প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত শব্দাত্মক শাস্ত্রেরও অপ্রমাণ্যতা ও নিজ শব্দাত্মক শাস্ত্রকে অস্বীকার করিলে সমস্তই অপ্রমাণ্য হইয়া পড়ে। উভয় প্রকারেই বাক্যার্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন তুল্য দোষ ঘটে, একারণে কোন সজ্জনই চার্ব্বাকের বাক্য সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রতিপক্ষের গর্জ্জনকালে অনুমান বা আগম প্রমাণ কিছুই না থাকায় ইহাদের বাক্য নিরর্থক ও কপটতাময় বলিয়াই গণ্য হয়। বাক্য বা শব্দ প্রমাণকে স্বীকার না করিলে বিচারস্থলে কোন বাক্য প্রয়োগ অসম্ভব, সেকারণ তথায় কেবলমাত্র নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থান করিতে হয়। কিন্তু কেবল দৃষ্টি কোন উত্তর দিতে পারে না, উত্তর দিলেই নিজের কার্য্যদ্বারাই নিজমতের প্রতিকূল আচরণ করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দৃষ্টবিষয় সম্বন্ধে কোন বাক্য উচ্চারণ করিলে তদ্দ্বারা শ্রোতার যদি উক্ত বিষয়সম্বন্ধে জ্ঞানও না জন্মে তাহা হইলে বক্তৃতা নিরর্থক হইয়া পড়ে। যদি ঐ বাক্য হইতে শ্রোতার কোনরূপ জ্ঞান জন্মে তাহা হইলে ঐ

জ্ঞানের প্রামাণ্যই হইয়া থাকে এবং সেই জ্ঞানের জনক বলিয়া বাক্যের প্রামাণ্যও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, এইরূপ ঐ বাক্যের অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহাদেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়।

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এ বিষয় যদি কোন যুক্তি বলিলে অনুমানও প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধ হইয়া যায়, যদি যুক্তি প্রদর্শন করিতে না পারা যায় তাহা হইলেও অনুমানের প্রামাণ্য সিদ্ধই হইয়া থাকে। বিনা যুক্তিতে—"কেবলমাত্রই প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ নহে" ইহা বলিলেই তাহা স্বীকার করা যায় না, কারণ ইহা রাজশাসন নহে।

হৃদয়গুহাস্থিত ও জঠরমধ্যবর্ত্তী পদার্থের জ্ঞান প্রত্যক্ষ সাধ্য নহে, অতএব অন্নভোজনকারী ও ক্ষীরাদিপান-কারী ব্যক্তিগণেরজঠরমধ্যস্থ ঐ দ্রব্যাদি যে যথাবিধি পরিপক্ক হইয়া শরীরের পোষক হইবে এ বিষয়ে অনুমান ভিন্ন অন্য গতি নাই। অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ) ইহাদের তিনেরই প্রামাণ্য নিশ্চিত হইল।

যদি অদৃষ্ট নামে কোনও পদার্থ না থাকে তাহা হইলে জগতে একজন পোষ্য (পালনীয়) এবং অপর ব্যক্তি তাহার পোষক (পালনকর্ত্তা) এইরূপ বৈষম্যের হেতু কি? যদি—ধনসদ্ভাব বশতঃই পালন কর্ত্তৃত্ব এবং ধনের অভাব হেতুই পালনীয়ত্ব ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে একজনের ধনের সদ্ভাব ও অপরের তদভাবের প্রতি কোন্-দৃষ্ট হেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে অথবা অদৃষ্ট কোন পদার্থ তাহার কারণ? দৃষ্ট দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং ইচ্ছা, যত্ন প্রভৃতি উভয়েরই সমান অতএব পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যের প্রতি কোন অদৃষ্ট পদার্থই নিয়ামক হয়। অতএব যাহার সদ্ভাব বশতঃ একব্যক্তি ধনী এবং তদভাব বশতঃ অপর ব্যক্তি নির্ধন হইয়া থাকে সেই অদৃষ্টকেও কার্য্য-বৈলক্ষণ্য-দর্শনে দৃষ্ট-পদার্থের ন্যায় হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহলোকে পূর্ব্বোক্ত শুভাশুভ অদৃষ্টের জনক কোন শুভাশুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখা যায় নাই, অতএব তাদৃশ শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, দেহাতিরিক্ত একজন দেহী বর্ত্তমান আছেন, তিনি নিত্য এবং তিনিই পূর্ব্বজন্মগত শরীরে শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহা সিদ্ধ হইল। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, ভোজনব্যতীত তৃপ্তিসাধন কিংবা যত্নব্যতীত সুখলাভ হয় না বলিয়াই সকলে ভোজন ও যত্নরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, অতএব পূর্ব্বোক্ত ধনির নির্ধনত্বের প্রতিও অবশ্যই কারণ স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু দৃষ্ট কোন কারণ নাই, অতএব অদৃষ্টরূপ কারণের সিদ্ধি হইল।

দেহব্যতীত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, অবিকৃত শবদেহের মৃত্যু কিরূপে বলা যায়? কারণ মৃত্যুর পূর্ব্বেও শরীরস্থ নেত্রাদি অবয়ব সম্প্রতি অবিকল সেইরূপই বর্ত্তমান আছে। নিঃশ্বাসের সদ্ভাব এবং অসদ্ভাব দ্বারাই জীবিত ও মৃতের পার্থক্য সাধিত হইবে, এ কথাও বলা যায় না, যেহেতু নিশ্বাসবায়ু প্রত্যক্ষ গোচর হয় না, স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা কেবলমাত্র তাহার অনুমানই হইয়া থাকে, পরন্তু ইহাদের মতে অনুমানের প্রামাণ্যই স্বীকৃত হয় নাই, বিশেষতঃ মক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতিতে যে নিশ্বাস বর্ত্তমান আছে তাহা স্পর্শ-দ্বারাও অবগত হওয়া যায় না। অতএব ঐ শবদেহে বর্ত্তমানে দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার অসদ্ভাব হইয়াছে, ইহাই মৃত্যু একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য, অন্যথা মরণ বলিয়া কোন পদার্থই সিদ্ধ হয় না। অতএব যাহারা বলে যে—'তাম্বুল', গুবাকচূর্ণ প্রভৃতি বস্তু-সংযোগে যেমন অভূতপূর্ব্ব রক্তিমার সৃষ্টি হয়, সেইরূপ ভূতসমূহের যোগবিশেষ হইতেই জড় শরীরে জ্ঞান সৃষ্টি হইয়া থাকে;—তদুত্তরে;—জীবদেহে ও মৃতদেহে সমভাবেই ক্ষিত্যাদি ভূতসমুদয়ের সংযোগ অবিকল বর্ত্তমান থাকে। অতএব এ বিষয়ে বাদী (চার্ব্বাক) স্বয়ং শবতুল্য মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকে।

চার্ব্বাকের মতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় নামে কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থ নাই, তাদৃশ অধিষ্ঠান জীবদেহে ও মৃতদেহে সমভাবেই বর্ত্তমান থাকে। আত্মা ও অদৃষ্ট স্বীকারই করে নাই। অতএব জীবদেহ অপেক্ষা শবদেহে কোন্ পদার্থ ন্যূন থাকে, যাহার জন্য উহাকে শব বলা যাইতে পারে। ঐ শবদেহ ক্রমশঃ নানাবিধ ক্রিমিরূপে পরিণত হইয়া থাকে, অতএব ইহাতে জীবত্বসম্পাদক সংযোগবিশেষের অভাব হইয়াছে, একথা বলা যায় না, পরন্তু তাদৃশ সংযোগ সম্পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান থাকে। অতএব ইহাতে দেহস্বামী জীবাত্মারই অভাব হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

বায়ুর অভাববশতঃ মরণ বলা যায় না, শবদেহের নবরন্ধ্রযোগে সর্ব্বদা বায়ুর চলাচল হইতেছে, যে বায়ু ভস্ত্রামধ্যে (কামারের যাঁতা) পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহার অগমন কোথায়? অতএব এই নির্জ্জীব-দেহ-দ্বারাই জীব সিদ্ধি হইয়াছে।

তাম্বূলাদি সংযোগজনিত দৃষ্টান্ত এস্থলে সঙ্গত হয় না। যেহেতু—রক্তধাতু প্রভৃতি পার্থিবপদার্থে স্বভাবতঃই রক্তিমা আছে, অতএব রক্তিমা পার্থিবধর্ম বলিয়া তজ্জাতীয় পার্থিব পদার্থ। স্তরেও দ্রব্যসমুদয়ের সংযোগে রক্তিমা উৎপন্ন হইতে পারে, পরন্তু পঞ্চভূতাত্মক জড়সমুদয়ে কুত্রাপি জ্ঞান পরিদৃষ্ট হয় নাই বলিয়া জ্ঞানকে জড় পদার্থের ধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না, কাজেই তাদৃশ জড়পদার্থের সংযোগেও কোনরূপে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না।

জবাকুসুম সংযোগেও রূপবিশিষ্ট স্ফটিকাদিতেই রক্তিমা দৃষ্ট হইয়া থাকে, রূপহীন বায়ুতে শত শত রক্ত-দ্রব্য সংযোগেও রক্তিমা জন্মে না। শত অন্ধ একত্র হইলেও তাহাদের দৃষ্টিশক্তি উৎপন্ন হয় না, পরন্তু একজন মাত্র চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সংযোগেই তাহাদের গমনাগমন সাধিত হয় এইরূপ জ্ঞান বা জীবের সহিত যোগ হইলেই এই দেহের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং উক্ত সংযোগের অভাবেই সমস্ত কার্য্যের অভাব হইয়া থাকে। সেই জীব স্বভাবতঃই জ্ঞানবান্, পরন্তু কৃত্রিম জ্ঞানবান্ নহেন। চিত্রাঙ্কিত নেত্রে বস্তু দর্শন হয় না। অতএব জড়দেহেরই জীবত্ব, একথা জড়ব্যক্তি ব্যতীত পণ্ডিতগণ বলেন না। বস্তুতঃ জীব জড়দেহের অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার্য্য, যাহাকে পণ্ডিতগণ দেহী বলিয়া অবগত হইয়া থাকেন।

'মাতৃস্তন্যপানে সন্তানের শরীররক্ষণাদি ইষ্ট সাধন হয়' ইহা পূর্ব্বজন্মে অনুভূত বলিয়াই তজ্জাতীয় জাত-মাত্র শিশু ইহ জন্মেও মাতৃস্তন্য নিজ হিতজনক ইহা অনুমান করিয়া স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, পরন্তু দেহ ও জীবের ঐক্য বলিলে উহা সিদ্ধ হইতে পারে না, চার্ব্বাকের মত স্বীকার করিলে একজনের পূর্ব্বানুভূত বিষয়ে অপরের অনুমান হইতে পারে। পরন্তু দেহাতিরিক্ত নিত্যজীব স্বীকারপক্ষে এবিষয়ে সহজেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব ঐ মাতৃস্তন্যপানক্রিয়া কেবলমাত্র শিশুরই পুষ্টিজনক নহে, পরন্তু জীব যে দেহাতিরিক্ত পদার্থ তাদৃশ অনুমানেরও পুষ্টিসাধন করিতেছে।

"এই অন্ন যেহেতু আমার পূর্ব্ব পূর্ব্বভুক্ত অন্নের সমজাতীয় অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অন্নতুল্য হিতকারী হইবে" আমরা ভোজনের পূর্ব্বেই এইরূপ অনুমান করিতে পারি বলিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। অতএব অনুমান প্রমাণ অস্বীকার করিলে নিত্য উপবাসে মৃত্যুই সম্ভবপর, ইহা যুক্তিসিদ্ধ।

জড়দেহই জীবের স্বরূপ এবং জড়দেহের আকারই জীবের আকৃতি, ইহা স্বীকার করিলে দেহের ছেদন, ভেদন দাহন প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা নিজেরই বধ স্বীকার করিতে হয়, মৃত পিতার শবদেহ দাহ করিলে পিতৃ-হত্যা (দাহ দ্বারা) পাপ হয়। পরন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত চিত্তের খেদজনক বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন।

চার্ব্বাক মতে নিরঙ্কুশ অর্থাৎ যথেচ্ছা কাম উপভোগ পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে; পরন্তু উহা তক্ষকের মস্তকস্থিত রত্নাহরণ-চেষ্টার ন্যায় দুঃখজনকই হইয়া থাকে। যদিও ধর্ম্মরূপ অঙ্কুশ নাই বলিয়া পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক কাম উপভোগ করিতে কোন বাধক নাই, তথাপি ধনাভাবরূপ অঙ্কুশ বর্ত্তমান থাকায় লোকে ধনাভাব নিবন্ধন যথেচ্ছ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। সেই দারিদ্র্যকে দূর করিতে পারে এরূপ ধর্ম্মও ইঁহাদের মতে স্বীকৃত হয় নাই। উক্ত ধনাভাব দূর করিবার জন্য ধনিজনের সেবা অথবা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, পরন্তু চৌর্যকর্ম্মে কারাবন্ধন ও মৃত্যুভয় হেতু এবং ধনিজনের সেবায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণহেতু কেবলমাত্র লোককে দুঃখসাগরেই নিমজ্জিত করিয়া থাকে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখ প্রদান করিতে পারে না। অতএব দরিদ্রগণ কিছুতেই চার্ব্বাক মত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবে না। ধনিগণ স্বভাবতঃই ধনমদান্ধ হইয়া ভোগে প্রবৃত্ত আছেন, তাঁহারা চার্ব্বাক মত শ্রবণ করিতে কোন আবশ্যক মনে করিবেন না। বিশেষতঃ উক্ত মতাবলম্বনে তাহাদের যথেচ্ছ কাম উপভোগের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু ধনবলে বহু ভোজন করিতে পারিলেও তাহার পরিণামে অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে, প্রচুর পান

করিলে উদর রোগ হইতে দেখা যায় এবং বহুস্ত্রীসম্ভোগে পদে পদেই রোগ উৎপন্ন হয়। বহু স্ত্রীবিবাহ মহাভারস্বরূপ, তাহারা পরস্পর বিবাদাদির দ্বারা পতির মৃত্যুরই কারণ হইয়া থাকে। পরস্ত্রীভোগে শিরচ্ছেদাদি ভয়ও বর্ত্তমান আছে। অতএব দুঃখসম্পর্কশূন্য সুখই মনুষ্যের প্রার্থনীয়, দুঃখে মিশ্রিতসুখ কেহ ইচ্ছা করে না। পূর্ব্বোক্ত সকলস্থলেই সুখ অতি অল্প এবং তাহার পরিণামে দুঃখই অধিক বলিয়া উন্মত্ত ব্যক্তিও তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব মহাদুঃখসমূহসঙ্কুল কণিকামাত্রসুখে কোন বিবেকীব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, পরন্তু বিজ্ঞগণ তাহা হইতে বিরতই থাকেন। যাহারা মূর্খ তাহারা পূর্ব্ব হইতেই ভোগে প্রবৃত্ত আছে; অতএব চার্ব্বাক শাস্ত্রের জন্য তাহাদের কোন আবশ্যক নাই এবং তাহাদের ধর্মভয়ও নাই, তাহারা চিরকালই, রাগ-প্রকোপগ্রস্ত। অতএব নপুংসক ব্যক্তির শস্ত্র যেরূপ নিষ্ফল অর্থাৎ সামর্থ্যশূন্য বলিয়া সে যেরূপ শত্রুর প্রতি শস্ত্রচালনে সমর্থ নহে, সেইরূপ চার্ব্বাক শাস্ত্র নিষ্ফলই হইয়া থাকে। মত্তব্যক্তিরও মৃত্যুভয় আছে, চার্ব্বাক শাস্ত্রোক্ত উপদেশের অনুষ্ঠান করিলে পরিণামে নানাবিধ দুঃখফলই লাভ হয় বলিয়া কোন সুস্থচিত্তব্যক্তি কিছুতেই ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, বিষয়ের বিচার যুক্তিঅনুসারেই হইয়া থাকে, শরীরবল দ্বারা হয় না। প্রত্যক্ষ কেবলমাত্র পরস্ত্রীদর্শনাদি লীলাসম্পাদনেই সমর্থ পরন্তু বিপক্ষবাদীকে কিছুমাত্র শিক্ষা দিতে পারে না, বিপক্ষ শিক্ষার জন্য যুক্তিশাস্ত্রেরই আবশ্যক।

চার্ব্বাকগণ বলেন যে—"বিষয়মাত্রই প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য, প্রত্যক্ষের অগ্রাহ্য কোন বিষয় নাই—যেহেতু সর্বত্র এতাদৃশ দর্শনরূপ যুক্তিকেই অবলম্বন করিতে হইয়াছে। অতএক যাহারা যুক্তি অর্থাৎ অনুমানকে প্রমান স্বীকার না করে তাহাদের মতে কোন বিষয় সিদ্ধিই হইতে পারে না।

প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় প্রত্যক্ষদ্বারাই সিদ্ধ হয়, শাস্ত্র হইতে নহে, অদৃষ্ট বিষয় চার্ব্বাক মতে স্বীকারই নাই, অতএব চার্ব্বাক শাস্ত্রের বিষয় বিষই পান করিয়াছে অর্থাৎ চার্ব্বাক শাস্ত্রের কোন বিষয়ই সম্ভবপব হয় না। যদি ধর্ম্মাভাবই চার্ব্বাক শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় না হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধগণের কথাই নিষ্কণ্টক হইয়া থাকে।

ধর্ম্মবিষয়ে কোন প্রমাণের অভাব চার্ব্বাক শাস্ত্রে দর্শিত হয় নাই, যদি উহাই অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক প্রামানাভাবই চার্ব্বাক শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় বলা যায়, তাহা হইলে উহাই চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে, শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। আর যদি ধর্ম্মবিষয়ক প্রমাণাভাব ঐ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় না হয়, তাহা হইলে ঐ শাস্ত্রবিরুদ্ধ শাস্ত্রই নিষ্কণ্টক হইল। এইরূপে চার্ব্বাকমত যুক্তি, বিচার ও সজ্জনগণকর্ত্তৃক দূষিত বলিয়া প্রমাণিত হইল।

জৈন-দর্শন—চার্ব্বাক-দর্শনে ঐহিক ভোগবাদ স্থাপনের জন্য যেরূপ নানাপ্রকার তর্কবিদ্যা বা হেতুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, জৈন-দর্শনে ঠিক উহার বিপরীত শুষ্ক বৈরাগ্য ও নীতিবাদের দ্বারা স্ববিরত্বরূপ মুক্তিবাদ স্থাপন করিবার জন্য নানাপ্রকার হেতুবাদের অবতারণা করা হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম সমসাময়িক। মাধবাচার্য্য তাঁহার 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' (আর্হত-দর্শনের উপক্রম) মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধদের মতসহ্য করিতে না পারিয়া দিগম্বরগণ অর্থাৎ জৈনগন বৌদ্ধগণের ক্ষণিকত্ববাদ খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৩।১৭।৪১) দেখা যায়, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দেহ হইতে মায়ামোহ-নামক একব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া অসুরগণকে অর্হৎ (জৈন)-ধর্ম্ম এবং পরে অন্য অসুরগণকে অহিংসাপর (বৌদ্ধ)-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্যে জৈন নির্গ্রন্থগণের উল্লেখ দেখা যায়। শেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন—নাতপুত্ত বর্দ্ধমান মাহাবীর। ইনি গৌতম-বুদ্ধের সমসাময়িক। মহাবীরের পূর্ব্বের তীর্থঙ্কর ছিলেন—পার্শ্বনাথ। জৈনগণের মতে, জৈনধর্ম্ম প্রতি সৃষ্টিতেই প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান সৃষ্টিতে ঋষভদেব (ভাঃ ৫।৩-৬)—আদি তীর্থঙ্কর এবং বর্দ্ধমান মহাবীর—সর্ব্বশেষ তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন। জৈন "তীর্থঙ্কর"-শব্দটির অর্থ—শাস্ত্রকার বা দর্শনকার। জৈনগণের মধ্যে শ্বেতবস্ত্র-পরিধানকারী শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর (উলঙ্গ)-নামক দুইটি সম্প্রদায় আছে। মূল দার্শনিক তত্ত্বে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ নাই, কিন্তু আচারগত বৈষম্য আছে। জৈনগণ ঈশ্বর ও বেদ মানেন না। তাঁহারা বলেন—সর্ব্বগ, নিত্য, স্ববশ; বুদ্ধিমান, জগৎকর্ত্তা পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বর নাই বলিলে ইহা বুঝায় না যে

সর্ব্বজ্ঞ কেহ নাই বা দেবতা কেহ নাই। জৈনগণের মতে, তীর্থঙ্করগণ সর্ব্বজ্ঞ এবং স্বর্গবাসী জীবসমূহ মানুষের নিকট দেবতা বলিয়া পূজ্য। জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত—জীব ও অজীব। জীব-শব্দের অর্থ—জ্ঞাতা, আত্মা ও জীবনধারী প্রাণী, উভয়ই। জীব—জগতের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছে (ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে ৪৫, ৪৭, ৫২)। ইহারা যখন যে দেহে বাস করে, তখন সেই দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ দেহের অনুপাতে তাহাদের আয়তন হয়। জীব ছাড়া বিশ্বের বাকী সমস্তই—অজীব। ইহাদের নাম—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ ও পুদ্গল (জড়)। ইহারা—রূপহীন, অবিভাজ্য, নিষ্ক্রিয় ও জগতের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। কর্ম্মবশে পুদ্গলের (জড়ের) সহিত জড়ীভূত হইলেই জীবের বন্ধন হয়। এই সকলের তত্ত্ব এবং ইহাদের সহিত আরও নয়টি তত্ত্ব, তদন্তর্গত পাপ ও পুণ্যের কথা জানিয়া বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে কর্ম্মক্ষীণ হইলে মোক্ষলাভ হয়। জৈনমতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—এই দুই প্রকার প্রমাণ। বেদ বা শব্দের প্রামাণ্য যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা যাহাকে শব্দ বা শ্রুতি বলেন, জৈনগণ সেই শ্রুতি স্বীকার করেন না; কিন্তু শ্রুতির পরিবর্ত্তে 'শ্রুত'-শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের নিজেদের শাস্ত্রকে শব্দ-প্রমাণের ন্যায় মনে করেন। জৈনগণের পরোক্ষ বলিতে উক্ত শ্রুত বা শ্রুতি বুঝায়। জৈনমতে মুক্তিতে দুঃখের অবসান আছে। অচেতন প্রস্তরের দুঃখানুভূতিও নাই—সুখানুভূতিও নাই—সুখ বৈচিত্রীবোধ ত' দূরের কথা। পরমানন্দস্বরূপ পরতত্ত্বের স্বরূপশক্ত্যানন্দের আশ্রয় ব্যতীত সুখ-বৈচিত্রী বোধ হইতে পারে না। প্রাচীন জৈন-গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে একভাগের নাম 'পূর্ব্ব', আর এক ভাগের নাম—'অঙ্গ'। চৌদ্দটি 'পূর্ব্ব' এবং এগারটি 'অঙ্গ' আছে। 'পূর্ব্ব' এখন বিলুপ্ত, 'অঙ্গগুলির আবার বহু উপাঙ্গ ও প্রকরণাদি আছে। দিগম্বর জৈনগণ সমস্ত গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। জৈন-আগমগুলি অর্দ্ধমাগধী প্রাকৃতে লিখিত।

জৈন মতের দূষণ—জৈন মতে পদার্থ দুই প্রকার, জীব ও অজীব। তন্মধ্যে জীব সচেতন, দেহ-পরিমাণ এবং অবয়ব সহিত। অজীব পাঁচ প্রকার—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও অন্তরীক্ষ। যাহা গমনহেতু তাহাই ধর্ম্ম, যাহা স্থিতিশীল, তাহাই অধর্ম্ম। উক্ত অধর্ম্মই ব্যাপক। যাহাদের বর্ণ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ আছে, তাহারা পুদ্গল; পুদ্গল পরমাণুস্বরূপ এবং তৎসংঘাতরূপ ভেদে দুই প্রকার। জল, অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, তরু ও জঙ্গমাদির নামই সংঘাত। পৃথিব্যাদির হেতুভূত পরমাণুসকল চতুঃপ্রকার নহে, এক প্রকার মাত্র। উহাদের পরিণতি হইতেই অবনী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বস্তু। অতীত বিষয়ের নিদানকেই কাল বলে। উক্ত কাল অণুরূপ। অন্তরীক্ষ একমাত্র এবং অসীম। এই ছয় প্রকার পদার্থই দ্রব্যস্বরূপ। তন্মধ্যে অণু ব্যতীত অন্য পাঁচটী দ্রব্য অস্তিকায় নামে কথিত। বহুদেশবর্ত্তী দ্রব্য সকলই অস্তিকায়। জীবের মুক্তি-মার্গোপযোগী সপ্ত-পদার্থ অঙ্গীকৃত—জীব, অজীব, আস্রব, নির্জ্জর, সম্বর, বন্ধ এবং মুক্তি। জীব জ্ঞানাদিগুণযুক্ত। জীবের ভোগ্য পদার্থ সকলই অজীব। জীব যাহার দ্বারা বিষয়ে নিবিষ্ট হন, সেই ইন্দ্রিয়গণের নাম আস্রব। যদ্দ্বারা বিবেক আচ্ছাদিত হয়, সেই অবিবেকই সম্বর। যাহা দ্বারা কামক্রোধাদি জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহা নির্জ্জর। কর্ম্মাষ্টক দ্বারা সম্পাদিত জনম-মরণ- প্রবাহের নাম বন্ধ। উক্ত অষ্ট কর্ম্মের মধ্যে চারিটী পাপবিশেষরূপ ঘাতিকর্ম্ম ও চারিটি পুণ্যবিশেষ-স্বরূপ অঘাতিকর্ম্ম। ঘাতিকর্ম্মের দ্বারা জীবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, অবলোকন, বীর্য ও সুখ তিরোহিত হয়। আর অঘাতিকর্ম্ম দ্বারা জীবের শরীর-সংস্থিতি, তাহার অভিমান, এবং তৎকৃত সুখে ও দুঃখে অপেক্ষা ও উপেক্ষার সাধন হয়। স্বীয় শাস্ত্র কথিত সাধন দ্বারা উক্ত অষ্ট কর্ম্ম হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি হইলে স্বাভাবিক আত্মস্বরূপের আবির্ভাব হয়। তখন জীব ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া আলোক নামক অন্তরীক্ষে অবস্থান অথবা মোক্ষলাভ করেন। সম্যকপ্রকার জ্ঞান, সম্যক্-রূপে সন্দর্শন ও উত্তম চরিত্রতাই মোক্ষের প্রধান উপায়। জৈনগণ সপ্তভঙ্গী ন্যায় দ্বারা সমস্ত পদার্থ স্থাপন করেন—(১) "স্যাৎ অস্তি" যদি কোন মতে থাকে, তবে আছে। (২) "স্যান্নাস্তি" যদি কোন প্রকারে থাকে, তবে নাই। (৩) "স্যাদবক্তব্যঃ" যদি কোন মতে থাকে, তবে তাহা অকথ্য। (৪) "স্যাদস্তি চ নাস্তি" যদি কোন প্রকারে থাকে,

তাহা হইলে আছে কিম্বা নাই। (৫) "স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ" যদি কোন মতে থাকে, তবে আছে, কিন্তু অকথ্যই। (৬) "স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ" যদি কোন মতে না থাকে' তবে উহা নাই, অথচ উহা অব... (৭) "স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ" যদি কোন প্রকারে থাকে, তাহা হইলে আছে, যদি কোন মতে না থাকে, নাই; অথচ উহা অব্যক্তই। (বেদান্ত ১।২।৩৩—৩৬)

জৈন মতে খণ্ডন—(বেদান্ত ২।২।৩৩-৩৬)। অসম্ভাবনা বশতঃ এক বস্তুতে এক কালীন বিরুদ্ধ সমাবেশ হইতে পারে না। এক বস্তুতে এককালে শীত ও উষ্ণ থাকে না। আবার সত্ত্ব-অসত্ত্ব পক্ষেও নরক কিম্বা মুক্তি অথবা তজ্জন্য সাধনবিধি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ভেদের ন্যায় অভেদেরও অস্তিত্ববশতঃ প্র... আবশ্যক হইয়া পড়ে। জীবকে শরীর পরিমিত বলিলে বালদেহপরিমিত জীবের যুবাদি শরীরে প... ঘটে না। কোন মানব-শরীর-পরিমিত জীব হস্তিদেহ প্রাপ্ত হইলে উক্ত শরীরে সর্ব্বাঙ্গীত সুখ-দুঃখের উ... এবং মশকাদি দেহে তাহার অসমাবেশ ঘটে। জীবের অনন্তাবয়বত্ব অঙ্গীকার করিয়া বালক ও যু... শরীর কিম্বা গজতুরগাদির দেহ প্রাপ্তিতে তাহার অবয়বের অপগম ও উপগমরূপ বৈপরীত্য দ্বারা তত্ত... পরিমিতত্বের সামঞ্জস্য জ্ঞান করাও যুক্তি-সঙ্গত হয় না। তাহা হইলে বিকারাদি অপরিহার্য্য হইয়া... আবার মুক্তিকালে শরীরের পরমাণুরূপত্ব বা বিভুরূপত্ব হইবে, তাহাও নির্ণয় করা অসম্ভব। উহাদের মুক্তি ওসংসারাবস্থা একই প্রকার। আর সর্ব্বদা উর্দ্ধগতি এবং আলোক নামক আকাশে নিরাশ্রয়ে অবস্থান জনকও অসম্ভব হয়। আর ঐ উর্দ্ধগতিকে নিত্যও বলা যায় না। কারণ কর্ম্মের ধ্বংস হইলে উর্দ্ধগতি... অধোগতি ঘটিবে। অতএব এই মত অসঙ্গত।

উক্ত মতবাদ সকলে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ—ভগবান্ বিষ্ণু বুদ্ধরূপে স্নেহের পরিপন্থী দক্ষ ও জীবহিংসা-ক্রিয়াকে নিবারণ করিয়া জগতে অহিংসাবাদ স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কাণ্ডীরগণ বেদের মধুপুষ্পিতবাক্যে লুব্ধ হইয়া যখন জন্ম ও ভঙ্গের ক্রিয়াতেই মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রকৃত তাৎপর্য্য যে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা, তাহা ভুলিয়া গিয়া দেহৈকসর্ব্বস্ববাদী হইয়া যখন বাহ্যাড়ম্বরকেই যথাসর্ব্বস্ব মনে করিয়া লইয়াছিল—জীবের স্বাভাবিকী হিংসা-বৃত্তির সঙ্কোচ-উদ্দেশ্যে প্র... বৈদিক যজ্ঞ-বিধির তাৎপর্য্য-ভ্রষ্ট হইয়া যখন হিংসাবহুল কর্ম্মকাণ্ডকেই বেদের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জ... করিয়া ফেলিয়াছিল এবং বেদের দোহাই দিয়া তাহাদের জিঘাংসা-বৃত্তির সমর্থন করিতেছিল, তখন স... বিষ্ণু এই ভঙ্গলীলা হইতে—এই জগন্নাশকরী প্রবৃত্তি হইতে জীবগণকে উদ্ধার এবং বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য যথা... প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীবুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্য তর্কপন্থায় বুঝি... পারায় যাহারা বুদ্ধের অনুগতাভিমান করিয়াও বুদ্ধের প্রকৃত আনুগত্য-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারাই দেবের উদ্দিষ্ট যে বেদের বিকৃতবাদের প্রতিবাদ, সেই উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সাক্ষাদ্ বিষ্ণুবিগ্রহ বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইল এবং তদ্দ্বারা বেদাভিন্ন-বিগ্রহ বুদ্ধরূপী বিষ্ণুকেও অবমাননা করিয়া ফেলিল। বেদ-নিন্দা ও বেদাভিন্ন-বিষ্ণুনিন্দারূপ দুই ভীষণ অপরাধ ফলে বুদ্ধেরঅনুগতব্রুব বৌদ্ধগণ শ্রৌতপন্থী স... ধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকট অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ নাস্তিক বলিয়া খ্যাত হইল। অখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেই রস... আছে। তাঁহা হইতে আংশিক ভাব সমূহ বিভিন্ন অবতারের মধ্যে কিছু কিছু আছে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর প্রভৃতি গৌণ সপ্তরসের মধ্যে করুণ রসটি বুদ্ধে আছে। অবতারসমূহে সকল রসের পূর্ণতা নাই, কারুণ্য আছে... তাঁহারা করুনাপরবশ হইয়া কিছু লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধ আবেশাবতার, স্বাংশ নহেন, জীব বি... তাঁহাতে ভগবানের করুনাশক্তি নিহিত হইয়াছে। বিষ্ণুর আবেশাবতার বুদ্ধদেবে যে করুণা, সেই পূর্ণ... বুদ্ধের অনুগত জনের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে পারেন নাই, বুদ্ধকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা জানেন, বুদ্ধদেব কোন তাপস, সাধন করিয়া সি...

করিয়াছেন। জগতে করুণাবিতরণের লীলামাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা বৈদিক আলম্ভবিধি—যজ্ঞবিধিতে যে পশুবধ, সেইটি নিবৃত্ত হইয়াছে। দুর্বল পশুর প্রতি অত্যাচার না করা, বলবান্ দুর্বলের প্রতি হিংসা না করা তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। নিম্নসৃষ্টির প্রতি দয়া বিধানের যে ব্যবস্থা তাহা নিম্নশ্রেণীর দয়া। পশুবধ করিতে হইলে বেদবিধি যজ্ঞবিধিতে করা কর্ত্তব্য, তাহার অপব্যবহার হইতেছিল—সেইটি নিবারণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।১১ ও ১৪ শ্লোকে আছে;—"জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান বহির্ম্মুখ বদ্ধ প্রানিমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত থাকিলেও উহা শাস্ত্রবিধানের অনুজ্ঞা নহে, পরন্তু যদি এ সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিবাহ দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষন এবং সৌত্রামণী নামক যজ্ঞের দ্বারাই মদ্যপানের নিয়ম বিধান করা হইয়াছে মাত্র।" সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে হইবে। ঈদৃশ ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ যে সকল অসাধু, জড়বুদ্ধি; সাধুস্বাভিমানী; দুর্জ্জন নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করে, পরলোকে নিহত পশুগণ ভোজনকারী হইয়া পশুমাংসভোজীগনকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। "তাপসপ্রধান বুদ্ধের যে করুণার কথা বৌদ্ধগণ বিচার করেন তাহা ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়, "প্রানিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" কাহারও শারীরিক, মানসিক বা বাচনিক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। যাহারা উদ্বেগ দেয় তাহাদেরও উদ্বেগ পাইতে হয়। যাহারা এ প্রকার জানে না অথচ দাম্ভিকতা করে; আমি সব বুঝি, সব জান্তা, বিচারে পশুবধ কার্য্যে ব্যস্ত, তাহারা স্তব্ধ, তাহাদের বিচারে এমন জড়তা যে, "পশুবধ একটা শাস্ত্রীয় বিধান, আমরাও ধর্ম্মকার্য্য করিতেছি"—এই বিচারে সাহসের সহিত ধর্ম্মের নাম করিয়া পশুবধ করে। "শাস্ত্র যখন এ কথা বলিয়াছেন—শাস্ত্রীয় বিধানে পশুবধ করিয়া তাহার মাংস খাওয়া দরকার, বৃথা মাংস খাইতে হইবে না, তাহা হইলে সাধু বলিয়া অভিমান করিতে পারা যাইবে।" —অবশ্য রজস্তমোধর্ম্ম প্রবল না হইলে এই দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। সত্বগুন বিশিষ্ট ব্যক্তি পশুহিংসা করেন না। কিন্তু রজস্তমোধর্ম্মী মনে করে তাহারাও সাধু। ধর্ম্মের নামে পশুবধ করিয়া তাহার মাংস খাওয়ার প্রক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে চালান ঠিক নহে। কারণ সকলদেহেই হরি আছেন। উপাস্য উপাসক পৃথক হইবার উপায় নাই। যিনি সেবা করেন এবং যাঁহার সেবা করেন তাঁহারা দুইজন পৃথক্ নহেন। ভোগে চালিত হইয়া ভোগকার্য্যে ব্যস্ত হইতে পরকায়ে বিদ্বেষ প্রবল হয়। অন্যের মাংস খাইব এ বুদ্ধি ভাল নহে। বুদ্ধদেবের বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যে বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছে উহার নিরাশ হওয়া আবশ্যক এ কারনে উহা অশুদ্ধ সম্প্রদায়রূপে স্থির হইয়াছে।

যখন এই নাস্তিকতা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া একেবারে শূন্যবাদে পর্য্যবসিত হইল এবং একমাত্র প্রমান-শিরোমনি শব্দাবতার বেদকে অপ্রামানিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইল, তখন ভগবান্ বিষ্ণু অন্ততঃ ব্রহ্মের অস্তিত্ব এবং বেদের প্রামানিকত্ব স্থাপনের জন্য শঙ্করকে শক্তিসঞ্চার করিয়া জগতে প্রেরণ করিলেন। যে সময়ে শূন্যবাদ ও বেদ-বিদ্বেষ-বাদ প্রবলরূপে রাজত্ব করিতেছিল, সে সময়ে চিদ্বিলাসের কথার মোটেই স্থান হইতে পারে না, তাই ভগবান্ বিষ্ণু স্থান, কাল ও পাত্রের অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার জন্য অর্থাৎ অচিন্মাত্র শূন্যবাদের স্থলে অন্ততঃ চিন্মাত্রবাদ এবং বেদ নিন্দাস্থলে অন্ততঃ বেদের প্রশংসা বা প্রামানিকতা মাত্র স্থাপনের জন্য নিজ প্রতিনিধি শঙ্করকে জগতে প্রেরন করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের এই উদ্দেশ্য যাহারা বুঝিতে না পারিয়া বুদ্ধের অনুগতব্রুবের ন্যায় শঙ্করাচার্য্যের অনুগত অভিমানে, চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষবাদকেই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য বলিয়া ধারণা করিলেন, তাহারা শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। সেই বঞ্চনাকামী ব্যক্তিগন কিছুতেই অমায়ায় আত্ম মঙ্গল বরন করিবেন না। সুতরাং তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া ব্যতিরেকভাবেই তাহাদের উপকার করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় ভগবান্ বিষ্ণু শঙ্করাচার্য্যের প্রতি এই আদেশ প্রদান করিলেন,—"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।। এবং মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি। ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।। অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ। প্রকাশং কুরু

চাত্মানম্ প্রকাশঞ্চ মাং কুরু।।" হে শঙ্কর! তুমি কল্পিত শাস্ত্র দ্বারা (বিমুখ) মনুষ্যকুলকে আমা হইতে বিমুখ কর; সেই কল্পিতশাস্ত্রে আমার নিত্য ভগবৎস্বরূপের বিষয় গোপন করিও, তাহাদ্বারা জগতের বহির্ম্মুখ-সৃষ্টি উত্তোরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আমি এইরূপ মোহ সৃষ্টি করিতেছি, যাহা জনগণকে মোহিত করিবে, হে মহাবাহো রুদ্র, তুমিও মোহ-শাস্ত্র প্রণয়ন কর; হে মহাভুজ, অন্যায় ও ভগবৎস্বরূপ প্রকাশের বিরোধী অজস্র যুক্তিজাল প্রদর্শন কর, তোমার রুদ্ররূপ (সংহার মূর্ত্তি) প্রকাশ কর, আর আমার নিত্য ভগবৎ স্বরূপকে আবৃত কর। তাই মহাদেব একদিন বৈষ্ণবী-শ্রেষ্ঠা পার্ব্বতী দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা।।" শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! মায়াবাদ অত্যন্ত অসৎ শাস্ত্র—বৌদ্ধমত বৈদিক-বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে আর্য্যদিগের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে, কলিকালে আমি ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করিব।" বৌদ্ধ-নাস্তিক্যবাদ অপেক্ষাও মায়াবাদ অধিকতর নাস্তিকতাপূর্ণ, কেন না, বৌদ্ধগণ স্পষ্টভাবে বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া তাহাদের নাস্তিক্য মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদীগন মুখে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ বেদের প্রতিপাদ্য নিত্য ভগবদ্ভক্তি, নিত্য ভগবদ্ বিগ্রহ এবং নিত্য ভগবদ্ভক্তগণের অধিষ্ঠান স্বীকার করেন নাই। সুতরাং যেরূপ স্পষ্ট শত্রু হইতে প্রচ্ছন্ন শত্রু ভয়াবহ, সেইরূপ স্পষ্ট নাস্তিক্যবাদ হইতে মায়াবাদরূপী প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক্যবাদ অধিকতর বিপজ্জনক, বহুরূপে বিমুখ জীবগণকে বঞ্চনা করিতেছে। এজন্য পূর্ব্বে বহু প্রমাণ বচন দ্বারা সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণের মঙ্গলের জন্য আচার্য্যগণ মায়াবাদের দোষ প্রদর্শন করিয়া মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। মায়াবাদী নির্ব্বিশেষবাদী; প্রকৃত ব্রহ্মবাদী নহেন, তাহারা ব্রহ্মকেও মায়ার অভিভাব্য করিতে চেষ্টা করেন। এজন্য তাহাদিগকে "মায়াবাদী" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

পাশুপত মতবাদ—পাশুপত মতে কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি এবং দুঃখান্ত—পঞ্চ পদার্থ। শৈব, সৌর, গানপত্য ইহারা পাশুপত মতাবলম্বী। পশুপদবাচ্য জীবগণের পাশ-বিমোচনার্থ পশুপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট মতই পাশুপত মত। এই মতে পশুপতিই সংসারের নিমিত্ত কারণ। মহদাদি পদার্থ সকলই কার্য্য। ওঁকার পূর্ব্বক ধ্যানাদির নামই যোগ। ত্রৈকালিক স্নানাদিই বিধি এবং মুক্তিই দুঃখনিবৃত্তি। গাণপতদিগের মতে গণপতি ও সৌরদিগের মতে সূর্য্যই জগৎকর্ত্তা। তাহাদিগের হইতেই প্রকৃতি ও কাল দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ঐ সকল দেবতার উপাসনা দ্বারাই জগদীশ্বরের সামীপ্য লাভ হয়। এই সকল সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধ। বেদে একমাত্র বিষ্ণুরই জগৎকর্ত্তৃত্ব ও অন্যান্য দেবগনের তদধীনত্ব উপদিষ্ট। বিষ্ণুকর্ত্তৃক আদিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তিই মুক্তি-লাভের উপায়। বিষ্ণুই একমাত্র আদিকর্ত্তা এবং অন্যান্য দেবতা বা বস্তু সকলের তাঁহা হইতেই জন্ম শ্রুত হয়। ঐ সকল বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি অনুমান দ্বারা সংসারের নিমিত্ত কারণস্বরূপ যে জগদীশ্বর কল্পনা করেন, তাহা সম্বন্ধাদি বিচারসঙ্গত না হওয়ায় অযুক্ত। (বেদান্ত ২।২।৩৭—৪১)।

বৌদ্ধ-দর্শন—এই সংসারে জরা, পীড়া, মৃত্যু ও দুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীশাক্য-সিংহ গৌতমবুদ্ধের মনে প্রথমেই প্রশ্ন হইল—"কিরূপে দুঃখকে চিরতরে ধ্বংস করা যায়?" এই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল—কি না হইলে দেহের জরা পীড়া মৃত্যু হয় না?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলেন—"দেহের জন্ম না হইলে জরা, ব্যাধি, দুঃখ প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না।" এইভাবে তিনি প্রাণীর জন্মান্তরের ও কর্ম্মফলের অস্তিত্ব অনুমান করিলেন এবং নির্ব্বাণের দ্বারা স্থূলদেহ-নাশ ব্যতীত দুঃখের অবসান হইতে পারে না—সিদ্ধান্ত করিলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশের সার এই—"সর্ব্বং অনিত্যং, সর্ব্বং দুঃখম্, সর্ব্বং অনাত্মং,"—সকলই অনিত্য, সকলই দুঃখ, সকলই অনাত্ম।

বুদ্ধের মতে, দুঃখ-স্কন্ধ-নিরোধের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণলাভ হইলে সুখ দুঃখাদি থাকে না, একেবারে অভাব বা শূন্য হইয়া যায়। তৈল ও বাতির সংযোগে প্রদীপ জ্বলে, উভয়ের অভাব হইলে প্রদীপ নিভিয়া যায়,

সেইরূপ নির্ব্বাণরূপ শূন্যতায় সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। বৌদ্ধমতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—কোনটিই সত্য নহে। মহাযানিকেরা কেবল বোধি-সত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধকেই ঈশ্বর করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মতে জীব ও জগতের মধ্যে স্থিরত্ব ও স্থায়িত্ব নাই। অতএব শূন্যই সত্য আর সমস্তই মিথ্যা; শূন্য হইতে সৃষ্টি ও শূন্যেই প্রলয়। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে ক্ষুধা যেরূপ ব্যাধি হইতেও অধিক কষ্টদায়ক, সেইরূপ জীবন—দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, একমাত্র নির্ব্বাণই পরম সুখ;—"জিঘচ্ছা পরম রোগা সঙ্খার পরমদুঃখম্। এতং ঞত্বা যথাভূতং নির্ব্বাণং পরমং সুখং।।" নির্ব্বাণ লাভের জন্য দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রনিধি ও জ্ঞান (পরিমিতা) —এই সকল গুণের প্রয়োজন। ইহাদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটি প্রমাণ (সঃ দঃ সং ও বিঃ পুঃ ৩।১৮।১৪-৩০)। বৌদ্ধদর্শনের মতে কোন বস্তুই এক ক্ষণের বেশী থাকে না। এজন্য উক্ত দর্শনে আত্মা বা ঈশ্বরের স্বীকৃতি নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, বৌদ্ধদর্শনে জন্মবাদ স্বীকার করা হয়, কিন্তু আত্মা না থাকিলে কিরূপে জন্মান্তর স্বীকৃত হয়? তদুত্তরে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, আত্মা বলিয়া যাহা আমাদের কাছে মনে হয়, তাহা—(১) রূপ-স্কন্ধ (স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর), (২) বেদনা-স্কন্ধ Feeling, Sensations, সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখঅসুখবেদনা), (৩) সংজ্ঞা স্কন্ধ (Perception —সংজ্ঞান), (৪) সংস্কার-স্কন্ধ (Mental and physical tendencies) ও (৫) বিজ্ঞান-স্কন্ধ (চিত্তের প্রতিস্পন্দ বা reaction) ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইগুলি আমাদের বুঝিবার ভুলে যখন একটি সমষ্টিগত বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, তখন আমরা উহাকে 'আমি' বা 'আত্মা' বলিয়া মনে করি। রূপ, বেদনা প্রভৃতি স্কন্ধগুলি যেমন প্রকাশিত হইতেছে, অমনি প্রতিমুহূর্ত্তে ধ্বংস হইতেছে। এই ভাবেই আমাদের সমগ্র জীবনকালকে ব্যাপ্ত করিয়া উক্ত পঞ্চ-স্কন্ধের অবিরাম উৎপত্তি ও বিনাশের ধারা চলিয়াছে। যে স্কন্ধসমষ্টি একটি কর্ম্ম করে, উহার পরবর্ত্তী কোন ক্ষণের সমষ্টি সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করে। তৃষ্ণা ও কর্ম্ম বিনষ্ট হইলে এই ধারা বন্ধ হইয়া নির্ব্বাণ-অবস্থা লাভ হয়।

বুদ্ধের মতে, দেহের নাশের সহিত জীবত্বের বিনাশ হয় না। মৃত্যুর পর দেবশরীর, নারকীয়-শরীর, প্রেত-শরীর ও পাশব-শরীর—এই পঞ্চবিধ জন্মান্তর হয়। এই জন্মান্তর পুনর্জ্জন্ম নহে, ইহা নব জন্ম। বুদ্ধদেব 'সাত্তত আত্মা' স্বীকার করেন না। বুদ্ধদেবের বিজ্ঞান-ধাতু—"বিঞ্ঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সর্ব্বতোপহং" (দীর্ঘনিকায়, ১১)। অর্থাৎ—অদৃশ্য, অসীম, সর্ব্বতোপহ। বুদ্ধমতে—রূপকায় (স্থূলদেহ)+নামকায় (সূক্ষ্মদেহ)+বিজ্ঞান=পুরুষ। আর পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টিই ভূতাত্মা (personality)। সংসার—অনাদি, কিন্তু সান্ত। যে অবস্থায় চিত্ত সংস্কারহীন ও তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হয়, তাহাই নির্ব্বাণদশা। দেহ থাকাকালে নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে। ইহাকে 'সোপাধিশেষ নির্ব্বাণ' বলা হয়। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই অর্হৎ-পদবাচ্য। দেহান্তে পরিনির্ব্বাণ লাভ হয়; উহা 'অনুপাধিশেষ নির্ব্বাণ'। নির্ব্বাণাবস্থায় ব্যক্তিত্বের বিনাশ হয়। এই নির্ব্বাণ—অকথ্য ও অবর্ণ্য। নির্ব্বাণ—ভাবও নহে, অভাবও নহে। নির্ব্বাণ-অবস্থায় কোনো জ্ঞানও নাই, কোনো প্রতীতিও নাই; প্রতীতি যে বিধ্বংস হইয়াছে, তাহারও বোধ নাই—স্বয়ং বুদ্ধ পর্য্যন্ত মায়ামরীচিকা। নির্ব্বাণকে কেহ কেহ পরম সুখ বলিয়াছেন,—"নির্ব্বাণং পরমং সুখং।" কিন্তু যেখানে সমস্ত ব্যক্তিত্বের বিনাশ, যেস্থানে কোনও অনুভূতিই নাই—জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান কিছুই নাই, সেস্থানে সুখের বা পরম সুখের কল্পনা আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রবৎ কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা ব্যতীত আর কি? দুঃখের নিদান পঞ্চ স্কন্ধ-নিরোধের চেষ্টায় বাস্তব সুখ নাই, সুখবৈচিত্রীবোধ ত' দূরের কথা। বৌদ্ধগণ বহু শাখায় বিভক্ত। পরস্পরের আচার্য্যের পার্থক্যই ঐরূপ বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু দার্শনিক মতের পার্থক্যের উপরই বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক—এই চারিটি শাখার উদ্ভব হইয়াছে।

গৌতম-বুদ্ধের নিজের রচিত কোন গ্রন্থ নাই। পরবর্ত্তিকালে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বুদ্ধের যে সকল উপদেশ পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করেন, তাহা তিনভাগে বিভক্ত—(১) সুত্তপিটক, (২) বিনয়পিটক ও (৩) অভি-ধর্ম্মপিটক নামে প্রসিদ্ধ। পালিভাষায় রচিত ঐ সকল গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া 'হীনযান' বৌদ্ধমত উৎপন্ন হয়। ইহার পরবর্ত্তিকালে সংস্কৃত ভাষায় যে সকল বৌদ্ধ-গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে মহাযান-মত প্রপঞ্চিত হয়। ঐ মতে বস্তু

মাত্র যে কেবল ক্ষণস্থায়ী, তাহা নহে; উহার কোন বাস্তব সত্তাই নাই। রজ্জুতে যেমন আমাদের সর্পভ্রম হয়, এবং তথায় যেরূপ সর্প-প্রতীতি একেবারে সত্তাহীন প্রতীতিমাত্র, সেইরূপ সমগ্র জগৎ কেবল প্রতীতি-ভ্রম। এই মহাযানিক বৌদ্ধদর্শনের সহিত শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মায়াবাদের ঐক্য আছে বলিয়াই শ্রীভাস্করাচার্য্য, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু ও অন্যান্য বৈদান্তিক আচার্য্যগণ মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়াছেন। মহাযান-শাস্ত্রের শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, উভয়ের সহিতই মায়াবাদের সাদৃশ্য আছে। বিজ্ঞানবাদে বলা হইয়াছে, কেবল জ্ঞান ছাড়া কোন জ্ঞেয়বস্তু নাই। সমস্ত প্রতীতি—স্বপ্নের ন্যায় ভ্রমমাত্র। শূন্যবাদে এই ভ্রমকে অনির্ব্বাচ্য বলা হইয়াছে। মায়াবাদের অপর নাম—অনির্ব্বাচ্যবাদ। আধুনিক কালের কেহ কেহ বৌদ্ধমতকে নাস্তিকতার অপবাদ হইতে মোচন করিবার প্রচেষ্টায় বলেন, বুদ্ধদেবের শূন্যবাদটি 'নাস্তিক্যবাদ' (nihilism) নহে, উহা শঙ্করবেদান্তেরই অনুরূপ মত। কারণগুলি এই,—(১) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের 'সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ'-গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে—"যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ" অর্থাৎ যাহা শূন্যবাদিগণের শূন্য, আর ব্রহ্মবিদ্গণের যাহা ব্রহ্ম। (২) বুদ্ধদেব সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর মানিতেন না; সেই ঈশ্বর জন্য-ঈশ্বর অর্থাৎ উপাধিকল্পিত—যাহা পঞ্চদশীকারের মতে 'মায়া-নাম্নী কামধেনুর বৎস (পঞ্চদশী ৪।২৩৬)। যাহা শঙ্করবেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম—যাহা বুদ্ধদেবের শূন্য তাহাও জন্য নহে—নিত্য, সত্য, সনাতন। (৩) একাধারে জড়বাদী, উচ্ছেদবাদী (nihilist), দৃষ্টবাদী (positivist), সংশয়বাদী, হেতুবাদী (Rationalist), প্রেয়োবাদী (Hedonist), দেহবাদী, অনাত্মবাদী ও ইহসর্বস্ববাদী—চার্ব্বাক ছিলেন আদর্শ নাস্তিক। বুদ্ধদেবের মত ঐরূপ আদর্শ নাস্তিক্যবাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হওয়ায় বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই আদর্শ আস্তিক। (৪) বুদ্ধদেব জীবঘাতি-যজ্ঞ বিধায়ক বেদের নিন্দা করায় বেদনিন্দক হ'ন নাই। ঐরূপ বেদ-নিন্দা উপনিষদ্ ও গীতাতেও পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবকে এইরূপভাবে যে আস্তিক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা চার্ব্বাকের দেহ-সর্ব্বস্ব মতবাদের তুলনা মূলে অর্থাৎ চার্ব্বাক-বাদকে আদর্শ নাস্তিক্য-মত এবং নির্ব্বিশেষবাদকে আস্তিক্য-মত বা আদর্শ বেদান্ত সিদ্ধান্তরূপে অনুমান করিয়াই উহাদের সহিত তুলনায় বৌদ্ধমত আস্তিক্য-মত বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ দুইটি মতবাদ অন্যান্য দার্শনিক মতের বা ধর্ম্মমতের নাস্তিকতা ও আস্তিকতা-নিরূপণের মানদণ্ড নহে।

পরমেশ্বর মানার অর্থ কি? পরমেশ্বর মানি, অথচ তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা, অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তা স্বীকার করি না; পরমেশ্বরকে আমার ক্ষুদ্র ধারণার ছাঁচে ঢালিয়া আমার বিচারের কয়েদী করিয়া তাঁহাকে মানি—ইহা ঈশ্বর-মানা নহে; ইহা ভয়াবহ নাস্তিকতা। সচ্চিদানন্দপরাৎপরতত্ত্বের স্বরূপশক্ত্যানন্দের দিকে যে সিদ্ধান্ত যতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ততটা আস্তিক সিদ্ধান্ত। অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি-ব্যক্তিগণের নিকট চার্ব্বাক 'নাস্তিক' বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। কিন্তু চার্ব্বাক হইতেও কোটিগুণ ভগবদ্বিরোধী নাস্তিকতা—যে সকল মতবাদের গতি নির্ব্বিশেষবাদের দিকে ধাবিত, তাহাদের গতিই সারগ্রাহী তত্ত্ববিদ্গণ লক্ষ্য করিয়াছেন। বৌদ্ধমত, জৈনমত ইহাদের প্রতিযোগী বা সহযোগী বিভিন্ন মতের চরম লক্ষ্য কি—সর্ব্বাগ্রে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। সাংখ্য পাতঞ্জলাদি পঞ্চদর্শন তথা বেদান্তদর্শনের উপর শাঙ্কর-শারীরকের নির্ব্বিশেষপর সিদ্ধান্ত এবং ঐগুলিরই অসম্পূর্ণ বিকৃত প্রতিবিম্বস্বরূপ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক মতসমূহ একান্ত ভগবৎ-স্বরূপশক্ত্যানন্দের নিরুপাধিক বিলাস স্বীকার করিয়াছে কি? অথবা আধ্যক্ষিকতা ও নির্ব্বিশেষগতিই উহাদের চরম লক্ষ্য?—ইহা নিরপেক্ষ ভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

বুদ্ধ নিজ আগমে চারি প্রকার অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই অর্থ চারিজন বুদ্ধ-শিষ্য স্ব-স্ব বাসনানুসারে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের নাম—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। তন্মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও তদ্ভিন্ন পদার্থ মাত্রই ক্ষণিক ও সত্য। বৈভাষিক ঘটাদি পদার্থকে প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন, আর সৌত্রান্তিকের মত—জ্ঞানটী ঘটাদি আকারে জন্মাইলে সেই আকার প্রত্যক্ষদ্বারা অপ্রত্যক্ষ ঘটাদি অনুমিত হয়। যোগাচার মতে অর্থশূন্য বিজ্ঞানই পরমার্থ সৎ। আর বাহ্য অর্থ স্বপ্নতুল্য; সবই শূন্য—ইহা মাধ্যমিকের মত।

ঐ মত সকলের নিরাসার্থ কহিতেছেন (বেদান্ত ২য় অধ্যায় ২য় পাদঃ১৮-৩২) উভয় সংঘাত হেতুক উভয়বিধ সমুদায় স্বীকার করিলেও তদ্‌প্রাপ্তি ও জগদাত্মক সমুদায়ের অসিদ্ধি হয়। কারণ সমুদায়ি বস্তুর অচেতনত্বহেতু ও অন্য স্থিরচেতন সংহন্তার অভাবহেতু এবং ভাবক্ষণিত্ব স্বীকার জন্য ঐ সকল অসিদ্ধ হয়। আর স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তির আবির্ভাব স্বীকারে তাহার নৈরন্তর্য্যপ্রসঙ্গ যাইয়া পড়ে। সুতরাং তাদৃশ কল্পনা অযৌক্তিক। অবিদ্যাদির পরস্পর-হেতুত্ব থাকায় সংঘাতের জন্ম হইতে পারে না। কারণ অবিদ্যাদির পূর্ব পূর্ব ভাব উত্তর উত্তর উৎপত্তিমাত্রের নিমিত্ত হইতে পারে, কিন্তু সংঘাতের প্রতি স্থির চেতনরূপ নিমিত্ত অঙ্গীকার না করিলে ক্ষণিক আত্মায় ভোগের সম্ভাবনা কোথায়? আত্মস্বরূপের স্থায়িত্বস্বীকারে সর্ব্বক্ষণিকত্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। সুতরাং ইহা অযুক্ত। ক্ষণভঙ্গবাদে উত্তর ক্ষণবর্ত্তি কার্য্য উৎপন্ন হইলে পূর্ব্ব ক্ষণবর্ত্তি কারণ নষ্ট হয়। তাহা হইলে উত্তর-ক্ষণবর্ত্তি কার্য্যের হেতুতা অসঙ্গত। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিও অযৌক্তিক। অসৎ উপাদানে কার্য্য উৎপন্ন হইলে বীজনাশের হেতু উপাদানের অসদ্রূপতা আসে। আর সকল দেশে সকল কালে অসতের সৌলভ্যহেতু সকল উৎপন্ন কার্য্যই অসৎ (মিথ্যা) হইবে। কার্য্যের অনুগত উপাদান স্বীকার করিলে ভাব-ক্ষণিকত্ব মত ভঙ্গ হয়। সুতরাং অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব।

পদার্থের বুদ্ধিপূর্ব্বক ধ্বংসের নাম প্রতিসংখ্যা নিরোধ (বর্ত্তমান ঘটকে অবর্ত্তমান করিতেছি ইত্যাকার বুদ্ধি)। ইহার বিপরীত অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ। আবরণাভাব মাত্র আকাশ। এই তিনটি (প্রতিসংখ্যা, অপ্রতি-সংখ্যানিরোধ ও আকাশ) নিরুপাখ্য অর্থাৎ শূন্য বা অবস্তুভূত। এই তিনটিকে শূন্য দর্শন করিলে নিজেও অভাব-গ্রস্ত বোধ করিবে। কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ শূন্যবোধ হয় না। সুতরাং নিরন্বয়-বিনাশ রক্ষা করা যায় না। বৌদ্ধমতে সংশয়হেতু অবিদ্যার নাশই মুক্তি। সেই নাশ কিরূপে হয়— সম্যগ্‌জ্ঞানে বা স্বয়ংই? উভয় মতই নিরর্থক। তাহা হইলে সাধনের জন্য উপদেশও নিরর্থক হয়। আকাশকে অবস্তুভূত বলিলে "আকাশে পক্ষী উড়িতেছে" ইহা মিথ্যা হয়। আকাশের অপ্রতীতিহেতু বিশ্ব নিরাকাশ হইয়া পড়ে।

বস্তুর ক্ষণিকত্ববাদও বিচারযোগ্য। পূর্বানুভূত বস্তুর বিষয়িণী বুদ্ধির নাম অনুস্মৃতি তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। ক্ষণিকত্ববাদে "সেই এই বস্তু, সেই এই গঙ্গা" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার দ্বারা পূর্বানুভূত বস্তুর স্মৃতি অসম্ভব হয়। আবার ক্ষণিকত্ব অর্থে কি বুঝায়? ক্ষণসম্বন্ধ, না ক্ষণদ্বারা উৎপত্তি-বিনাশ? ক্ষণসম্বন্ধ হইতে পারে না। আর ক্ষণদ্বারা বস্তুর উৎপত্তি-বিনাশ হইলে কোন বস্তুই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব ভাব-পদার্থ ক্ষণিক হইতে পারে না। কার্য্য-উৎপত্তি আরম্ভ হইলে হেতুর ক্ষণিকত্ব জন্য বিনাশ স্বীকার দ্বারা কার্য্যের আরম্ভে কার্য্যের উপায়ভূত, যে-হেতু, তাহাও অভাবগ্রস্ত হয়। কাজেই অকারণে উৎপত্তি হইয়া পড়ে।

অর্থ-ব্যতীত ব্যবহার-সিদ্ধি স্বপ্নবৎ। যদি ব্যবহারসিদ্ধি জ্ঞান দ্বারাই হয়, তবে বাহ্য পদার্থ স্বীকারের কোন আবশ্যকতা থাকে না। ক্ষুদ্র চিত্তে অবস্থিত আন্তরজ্ঞান কি প্রকারে ঘট-পর্বতাদির আকারে প্রকাশ পায়? এই প্রকার আশঙ্কাও অসম্ভব। বুদ্ধির বৈচিত্র্য, বাসনার বৈচিত্র্য হইতে সঞ্জাত হয়। বাহ্য অর্থের অভাব বলিতে পারা যায় না। আমি ঘট জানিতেছি ইত্যাদি স্থলে ধাত্বর্থ, সকর্ম্মক ও সকর্ত্তৃক, সংবেদনবেদ্য। এস্থলে ধাত্বর্থ-ঘট ভিন্ন এবং জ্ঞান আরও ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং জ্ঞান ব্যতীত আর কিছু নাই বলিলে উপহাস-হেতু হইতে হয়। সকল বিষয় ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার করিলে এবং ত্রিকালস্থিত-সম্বন্ধি চেতনে অসৎবাদ স্বীকারে দেশ ও কাল জন্য সাপেক্ষ বাসনাধীন ও স্মরণাদি ব্যবহার সম্ভব হয় না। অতএব আশ্রয়-অভাবহেতু বাসনা সিদ্ধ হয় না। বাসনার অভাবে বিজ্ঞান বৈচিত্র্য অসম্ভব।

বুদ্ধকর্ত্তৃক বাহ্যার্থ ও বিজ্ঞান অঙ্গীকৃত হইয়া ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা আরোহণের জন্য সোপানের ন্যায় ক্ষণিকত্বাদি-বাদ কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বাহ্য অর্থ সকল বা বিজ্ঞান সৎ স্বরূপে বিদ্যমান নাই। শূন্যই তত্ত্ব, সেই ভাবপ্রাপ্তিই মোক্ষ—ইহাই এই মতের রহস্য। 'ঐ শূন্য পদার্থ ভাব কি ভাবাভাব? এ তিনের মধ্যে কোনটিই প্রতিপন্ন হইবে না।

যে সকল প্রমান প্রয়োগে শূন্যমের প্রতিপাদন করা হইবে, তাহার মধ্যে শূন্যমের শূন্যবাদে ব্যাঘাত ও তাহার যাথার্থ্যে সকল প্রকার সত্যতা-প্রসঙ্গ সংঘটিত হইয়া শূন্যবাদকে দূষিত করিবে। যদি বলা যায়—ভগবদবতার বুদ্ধদেবের বঞ্চনার উদ্দেশ্য কি? তদুত্তর—হরিবহির্ম্মুখ জনগণ বেদোক্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অতি প্রবল হইয়া দৈত্যগণের ন্যায় সদ্ব্যক্তিগণকে পীড়িত করিবে, তদুদ্দেশ্যে, বেদকে অস্বীকার করিবার ছলনা। বৌদ্ধমতের নিরাকরনে বৌদ্ধতুল্য মায়াবাদীর মতও নিরাকৃত হইল। মায়াবাদীব বৌদ্ধমতের ক্ষণিকত্ব অনুসরণে শূন্যবাদের আশ্রয়ে বিবর্ত্তবাদ প্রচার করেন।

বৌদ্ধ ও জৈনমত সম্বন্ধে শ্রীবাদিরাজ স্বামীর সিদ্ধান্ত—"যেরূপ বৃথা পশু-হিংসা হইতে পারে না, সেইরূপ যজ্ঞাদিতেও পশুবধ হইতে পারে না।" এতাদৃশ বচন রাজাজ্ঞা তুল্য, যেহেতু ইহাতে কোন যুক্তি নাই, প্রত্যক্ষ বা আগমপ্রমাণ উভয়েরই সমান, কারণ প্রত্যক্ষধর্ম্মাদি বিষয় প্রতিপাদনে অসমর্থ, আগম বা শাস্ত্র আমার হইলে উহা তোমার অস্বীকার্য্য, তোমার হইলে আমার অস্বীকার্য্য, অতএব পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা আগম প্রমাণ হইতে পারে না। যদি বলা যায়—"যজ্ঞীয় পশুহিংসা অধর্ম্মজনক, যেহেতু ব্রাহ্মণহত্যার ন্যায় উহাও হিংসাই হইয়া থাকে" এইরূপ অনুমান প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—প্রত্যক্ষ বা শাস্ত্রবলশূন্য কেবল-অনুমানকে প্রমান বলা যায় না, যেহেতু তাদৃশ কেবল অনুমান প্রমাণ হইলে সর্ববিষয়েই এক একটী অনুমান প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। অন্যথা—"মদ্যের ন্যায় দুগ্ধও অপেয়, যেহেতু উহাও মদ্যতুল্য দ্রববস্তু" এইরূপ অনুমানের দ্বারা দুগ্ধও অপেয় বলা যাইতে পারে। অতএব যে কোন একটা হেতুকল্পনা দ্বারা অনুমান করিলেই উহা প্রমাণ হয় না, পরন্তু উহা প্রত্যক্ষ বা শাস্ত্রমূলক হইলেই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। পরন্তু এস্থলে অর্থাৎ যজ্ঞীয় পশুহিংসা পাপজনক এই অতীন্দ্রিয়বিষয়ে প্রত্যক্ষ তোমার অনুমানের মূল হইতে পারে না। যদি বল আমার শাস্ত্রই আমার অনুমানের মূল হইবে—তাহাও সঙ্গত নহে যেহেতু—নিজবাক্য কখনও নিজের প্রমাণ হইতে পারে না, প্রত্যেকের মতেই নিজ নিজ যথেষ্ট বচন আছে।

প্রাচীন ব্যাসবাল্মীকাদিবচন তোমার প্রমাণ হইতে পারে না, যেহেতু তুমি উহাদিগকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করায় উহারা শোকগ্রস্ত, যদি যুক্তিপ্রমাণ বল, তাহা হইলে—উহা হিংসাকে প্রশংসাই করিয়া থাকে, যেহেতু—এই শরীর কারাগৃহ-স্বরূপ, দেহঘাতদ্বারা ইহার মধ্য হইতে জীবকে মুক্তি প্রদান করিলে উহা কারাগৃহ হইতে আবদ্ধ ব্যক্তির মোচনের ন্যায় উত্তম কার্য্যই হইয়া থাকে।

অতএব প্রমাণহীন কেবলমাত্র অহঙ্কারাশ্রিত তোমার সহিত বিচার কিরূপে হইবে? বিশেষতঃ তুমি যদি একমাত্র যুক্তিরই ভক্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে মাংসভক্ষণ নিষেধ করিতে পার না, যেহেতু অন্ন মধ্যে যেরূপ পঞ্চভূত ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, সেরূপ মাংস মধ্যেও পঞ্চভূত ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, এ অবস্থায় একটি ভোজ্য এবং অপরটি কিরূপে পরিত্যাজ্য হইতে পারে?

হিংসা দ্বারা পাপ জন্মে—এই যুক্তিবলে তুমি যজ্ঞনিন্দা করিতে পার না, জিনমন্দির নির্ম্মাণকালে ভূমি-পরিষ্কারাদি কর্ম্মে এবং তদীয় যাত্রাকালে পদাঘাতে যজ্ঞাপেক্ষা কোটিগুণ প্রাণিহিংসা হইয়া থাকে, শঙ্খ প্রাণীর অঙ্গ বলিয়া আমাদের শঙ্খধারণকে তুমি নিন্দা করিয়া থাক, পরন্তু উহা শোভা পায় না, যেহেতু—তুমি স্বয়ংও শরীরস্থ মক্ষিকাদি তাড়নার জন্য ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়া থাক, উহাও প্রাণীর অঙ্গ। লবণের সঙ্গে শুক্তি (ঝিনুক) চূর্ণ মিশ্রিত থাকে, অতএব লবণভক্ষণে শুক্তিরূপ অস্থিভক্ষণই করিয়া থাক, যদি বল লবণকে দ্রব করিয়া নিম্নস্থ অস্থিকনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমরা ভক্ষণ করিয়া থাকি, তাহা হইলেও উহা অস্থি প্রক্ষালন-জলেরই পান করা হয়।

ঈশ্বরই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা, তাঁহার অস্বীকারের হেতু কি বল দেখি? যদি বল, স্বভাব হইতেই এই চরাচর জগতের সৃষ্টি বলিয়া ঈশ্বর স্বীকারে আবশ্যক নাই, তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে—স্বভাব যদি জড়

পদার্থ হয় তাহা হইলে ঘটাদি জড়পদার্থের ন্যায় অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই থাকে, স্বয়ং অপরকে পরিচালন করিতে পারে না, পরন্তু কোন কার্য্য করিতে হইলে প্রথমতঃ জ্ঞান, অতঃপর তদ্‌বিষয়ে ইচ্ছা এবং তৎসম্পাদন হইয়া থাকে, ইহা শুন নাই কি? এ সমস্ত জড়বস্তুর পক্ষে সম্ভবপর হয় কি? যদি স্বভাবকে চেতন এবং অন্যের অধীন বল, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত দোষই হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার পরিচালক একজন ঈশ্বর স্বীকারই করিতে হয়, আর যদি তাহাকে চেতন এবং স্বাধীন বল, তাহা হইলে এক ঈশ্বর স্বীকার করিতে দোষ কি? পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন চেতন ও স্বাধীন অনন্ত স্বভাব কল্পনা অপেক্ষা আমার মতে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা এক ঈশ্বর স্বীকারেই লাঘব হয়।

আরও বল দেখি—যে স্বভাব হইতে কার্য্য জন্মে ঐ স্বভাব কাহার, যদি নিজের অর্থাৎ ঐ কার্য্যেরই স্বভাব হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় বল, তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটে যেহেতু নিজের উৎপত্তির পূর্ব্বে নিজের স্বভাব বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে না বলিয়া এরূপ উক্তিই দোষযুক্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি বল নিজের কারণের স্বভাব হইতে কার্য্য জন্মে, তাহা হইলে নিজের কারণ হইতে কার্য্য জন্মে এইরূপ বলিলেই হয়, আবার তাহার স্বভাব বলিয়া গৌরব স্বীকারের আবশ্যক কি?

যদি কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে কারণসমষ্টি মধ্যে একজন কর্ত্তারও আবশ্যক, অতএব পৃথিবী, পর্ব্বতাদির যিনি কর্ত্তা তিনি ভগবান্ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত, যদি কর্ত্তৃব্যতীত কেবল স্বভাব হইতেই কার্য্য সম্ভব হয়, তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের জন্য কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তার আবশ্যক থাকে না। কার্য্য হইলেই তাহার একজন কর্ত্তা আবশ্যক, ইহাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে, কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্যোৎপত্তি অদৃষ্ট বিষয়, অতএব তোমার মত স্বীকার করিলে দৃষ্টবিষয়ের হানি এবং অদৃষ্ট বিষয়ের অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে।

তোমার মতে মুক্তি যদি ব্রতচর্য্যাদি যত্নসাধ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে 'স্বভাব হইতেই কার্য্য হয়' এরূপ কথারই অভাব ঘটে, পক্ষান্তরে মুক্তিকে স্বভাব হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিলে ব্রতচর্য্যাদির নির্ব্বাসন হইয়া থাকে। স্বভাব, কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ জড়, ইহারা চেতন বস্তুর প্রেরণা ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না, কুঠার কখনও স্বয়ং বৃক্ষচ্ছেদনে কিম্বা ঘট স্বয়ং জল আহরণে প্রবৃত্ত হয় কি? মণিবিশেষের বা মন্ত্রবিশেষের দ্বারা অগ্নির স্বভাব (দাহকত্ব) অবরুদ্ধ হয়, পুনরায় বিজাতীয় মন্ত্র বা মণিসংযোগে ঐ অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনা দেখা যায়, অতএব স্বভাবের স্বাধীনতা নাই। অতএব সর্ব্বযুক্তিবলে স্বভাব ও কর্ম্মাদি চেতনা পরিচালিত স্বীকার করিতে হয়, চেতন-জীব স্বয়ং নিজের অনিষ্টজনক কর্ম্মাদির প্রেরক নহে, অতএব জীব ব্যতীত অন্য একজন চেতনকে কর্ম্মাদির প্রেরক স্বীকার করিতে হয়।

পুণ্যপদার্থ লঘু অতএব উহা লোককে ঊর্দ্ধদিকে পরিচালিত করিয়া থাকে এবং পাপপদার্থ গুরু বলিয়া পদবদ্ধশিলার জন্য লোককে নিম্নদিকেই চালিত করে, তোমার এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু পুণ্য লঘু এবং পাপ গুরু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, অতএব শিলাপ্রভৃতি দৃষ্টান্ত কেবল-মাত্র তোমার বাক্যেরই ভার উৎপাদন করিয়া থাকে, পরন্তু উক্ত শিলাদিমধ্যেও সর্ব্বকর্ত্তা ভগবান আছেন বলিয়া তিনিই অধোদেশে পরিচালনাদি করিয়া থাকেন। যিনি স্তম্ভমধ্য হইতে প্রকাশিত হইয়া হিরণ্যকশিপুর হস্ত হইতে বালক প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমার সেই প্রভু কাহার অন্তর্য্যামী নহেন বল দেখি?

শিলার যদি নিজেরই অধোদেশে পরিচালনের ক্ষমতা থাকে, তাহা জলের ন্যায় স্থলেও কেন পাদবদ্ধশিলা পুরুষকে নিম্নদেশে ভূমধ্যে পরিচালনা করে না, পরন্তু সমপ্রদেশে মনুষ্যই ঐ শিলাকে

পরিচালিত করিয়া থাকে। যেহেতু শিলা জলমধ্যে কেবলমাত্র নিম্নদিকেই প্রবৃত্ত হয়, পরন্তু ইতস্ততঃ গমন করিতে পারে না, সেই জন্যই জল বা স্থল কোথাও তাহার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব নাই বলিতে হইবে। অতএব উক্ত শিলা অন্তর্যামী ঈশ্বরের গুরুত্ব এবং স্বকীয় গুরুত্ববশতঃ অধোদেশে চালিত করে, যেহেতু ভগবান্ গুরুত্ব ধর্ম্মকে নিম্নদেশে পরিচালনের কারণ বলিয়া নিয়ম-বিধান করিয়াছেন।

যৎকালে তিনি উক্ত গুরুত্বধর্ম্মকে অবরুদ্ধ করেন তখন বস্তু নিম্নদেশে গমন করে না। সেই জন্যই ভগবান্ সমুদ্রমন্থনকালে মন্দরপর্ব্বতের গুরুত্বধর্ম্ম হরণ করায় উহা জলমগ্ন হইয়া যায় নাই এবং বর্ত্তমানেও এই পৃথিবী নিম্নবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডগর্ভোদকে মগ্ন হইতেছে না। যে ভগবানের (রামচন্দ্রের) প্রদত্ত বর-বশতঃ নলবানরকর্ত্তৃক সেতুবন্ধনার্থ শিলা জলোপরি বিন্যস্ত হইয়া নিমগ্ন হয় নাই, তিনি কাহারই বা দুর্জ্জনতা বিনাশ না করিয়া থাকেন। বিষপান করিলে ঐ বিষ যে শরীরের ঊর্দ্ধদেশে সঞ্চারিত হয়, উহা নিজের শক্তিবশতঃ নহে পরন্তু ভগবানের শক্তিই তাহাকে ঊর্দ্ধে চালিত করে। যদি বিষের নিজেরই এরূপ সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুদত্ত বিষভক্ষণে; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুতনাপ্রদত্ত বিষপানে এবং শঙ্কর সমুদ্রমন্থনে কালকূটবিষ পানে বিষাদযুক্ত হ'ন নাই কেন?

অতএব দৃষ্ট যাবতীয়কার্য্যেই কুম্ভকার প্রভৃতি দৃষ্টকর্ত্তা এবং ঈশ্বর এই উভয় হইতে হইয়া থাকে, পরন্তু অদৃষ্টকার্য্যের কেবল ঈশ্বরই কর্ত্তা, এইরূপে ঈশ্বরই সমস্ত কর্ত্তৃরূপে সিদ্ধ হইয়া থকেন। শিলা, বিষ প্রভৃতিস্থলে ঈশ্বরকর্ত্তৃত্বের যে ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছিল, এই যুক্তি অনুসারে, তত্তৎস্থলেও ঈশ্বরকর্ত্তৃত্ব সাধিতই হইল। অতএব তাদৃশ দোষপ্রদর্শকব্যক্তি শাস্ত্রমর্যাদা অবগত নহে বলিয়া সজ্জনসমাজে নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই।

রত্নের ঔজ্জ্বল্য যদি শিলার স্বভাব হয়, তাহা হইলে সমস্ত শিলাতেই ঐরূপ ঔজ্জ্বল্য নাই কেন? অতএব শিলাবিশেষেই ঐরূপ ঔজ্জ্বল্য হইবে এইরূপ নিয়মকর্ত্তা একজন আছেন। শ্রীহরির ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রেরিত হইলেই ঐ স্বভাবাদি বীর্য্যশালী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহা আর্য্যার্জনসম্মত, কোন পণ্ডিতব্যক্তি বৌদ্ধের ন্যায় ঈশ্বরপরিচালনরহিত স্বভাবপ্রভৃতিকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

অন্যকর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়াই অচেতনবস্তুমাত্রের স্বভাব, অতএব তুমি যে স্বভাবের কথা বলিয়াছ উহাও অচেতন বলিয়া তাহার পরিচালক রূপেই আমার প্রভু সিদ্ধ হইলেন। তিনি নিজ ইচ্ছানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের উচ্চনীচভাবের বিধান করিয়া থাকেন। তিনি স্বাধীন, তাঁহার ইচ্ছা পরিচালনে অন্যের শক্তি নাই, তাঁহাকে স্বতন্ত্র স্বীকার না করিলে এই জগতে রাজ্য অরাজক হইয়া নষ্ট হইয়া যাইত। মনুষ্যমধ্যে কেহ মূক কেহ বাক্‌পটু ঐ মূকত্ব ও বাচালত্ব মনুষ্য স্বভাব নহে, ইহা উভয়মতে সিদ্ধ। অন্যথা যাবতীয় মনুষ্যই মূক বা বাচাল হইত, অতএব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্নধর্ম্ম ভগবানেরই নির্দ্দিষ্ট। যদি বল কেবল স্বভাব কারণ নহে, পরন্তু কর্ম্মই কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার পক্ষে কেবল-মাত্র স্বভাবের চরণাশ্রয় রহিত হইয়া গেল। পরন্তু কোনও, স্থলে স্বভাব কারন, কোনও স্থলে বা কর্ম্ম কারণ এইরূপ নিয়মবশতঃ কলহই সম্ভবপর হইয়া থাকে।

কর্ম্ম যদি স্বয়ংই প্রভু হয়, তাহা হইলে তাহার জড়তাসম্পাদন কে করিলেন? আর স্বয়ং প্রভু হইলে তাহার উৎপত্তি বিনাশই বা কি জন্য হইয়া থাকে, অতএব একজন কর্ত্তা স্বীকার্য্য নহে কি? অতএব যিনি স্বভাব এবং কর্ম্মের জড়ত্ব প্রভৃতি হেয়ধর্ম্ম বিধান করিয়াছেন, সেই স্বতঃসিদ্ধ সম্রাট অনিন্দনীয় পরমেশ্বর কিরূপে অসিদ্ধ হইতে পারেন। যদি জীবকৃত কর্ম্ম অন্যচেতনের সাহায্য ব্যতীতই জীবের জন্মমরণাদি নিষ্পাদন করে, তাহা হইলে জীবমাত্রই নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারাই হত হইয়া থাকে, কেহই কাহারও বিনাশক হয় না, অতএব

প্রাণিহিংসা বলিয়া তোমার মতে যাহার নিন্দা করা হইয়াছে, সেই হিংসা দোষের প্রস্তাবই হয় না। পক্ষান্তরে তোমার মতে কর্ম্ম যদি অন্য কর্ত্তার সাহায্য অপেক্ষাসহকারে কার্য্য সম্পাদক হয়, তাহা হইলে সর্ব্বকর্ত্তা একজন ঈশ্বরেরই উত্থাপন হইয়া থাকে। এবম্বিধ একটিমাত্র বিচার-প্রহারদ্বারা যুক্তিযোগে নিরীশ্বর ভাট্ট, সাংখ্য এবং প্রভাকরমতাবলম্বিত্রয়েরই আশ্চর্য্যরূপে খণ্ডন করা হইল। অতএব জড়বস্তুর অনুশরণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বভাব কাল কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তের নিয়ামক মহাপ্রভুকে আশ্রয় করা উচিত।

গোপীসঙ্গ অথবা প্রলয়ে গোবিপ্রাদিবিনাশ যেরূপ ঈশ্বরের পাপজনক নহে, সেইরূপ পরস্ত্রীসঙ্গ বা গোব্রাহ্মণহত্যায় অন্যেরও পাপ হয় না, এরূপ বলিতে পার না, যেহেতু কর্ম্মবিশেষে কাহারও পাপ হয়, কাহারও পাপ হয় না, এরূপ দেখা যায়, স্ত্রীপরিগ্রহ সন্ন্যাসিগণের যেরূপ পাপ জনক, গৃহস্থগণের পক্ষে সেইরূপ হয় না।

অতএব তোমার পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তি ব্যর্থ হইল, পরন্তু বিধিবাক্য (শাস্ত্রবচন) অনুসারেই পাপ-পুণ্যের নির্ণয় হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তি শাস্ত্রকারগণ যে কার্য্যে পাপ হইবে, নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার অনুষ্ঠানেই পাপ হইবে, যে কার্য্যে পাপ নাই বলিয়াছেন, তদনুষ্ঠানে পাপ হইবে না।

বেদপ্রভৃতি শাস্ত্রসকল যাঁহাকে অনিন্দিতপুরুষ বলিয়া নিরন্তর স্তুতি করিয়াছেন, সেই জগদীশ্বর পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানেও পাপলিপ্ত হ'ন না। নিন্দিতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীব যেরূপ পাপগ্রস্ত হয়, সেইরূপ ভগবান্‌ও লোককে সেই পাপকর্ম্মে নিযুক্ত করেন বলিয়া তাঁহারও পাপ হয় না কেন? এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু যুক্তি অনুসারে বিচার করিলে পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠাতার যেরূপ পাপ হয়, পাপে নিয়োগকর্ত্তা পুরুষের তাদৃশ পাপ হয় না। রাজা যদি শাস্তিরূপে কোন পুরুষকে জলে নিমগ্ন করেন, তাহা হইলে সেই নিমগ্নপুরুষের যেরূপ দুঃখ হয় রাজার সেরূপ দুঃখ হয় কি? যদি বল যুক্তি-ব্যতীত শাস্ত্রবিধি অনুসারেই তাদৃশ স্থলে ভগবানের পাপ হইবে, তাহা হইলে তিনি স্বয়ংই বিধির জনক বলিয়া তাঁহার ভয় কি? পরন্তু শ্রুতিই সগর্জ্জনে বলিতেছেন যে—ভগবান্ স্বয়ং পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিম্বা পাপকর্ম্মে লোকের প্রেরণদ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হ'ন না। যেহেতু বিধি এবং নিষেধ লোককেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত করিয়া থাকে, সেইজন্য বদ্ধজীবেরই বিধিনিষেধ বন্ধন সম্ভবপর, মুক্তপুরুষের তাহা হইতে পারে না। শ্রুতি নিত্যমুক্ত প্রভুরূপে যাঁহার প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই হয়গ্রীব শ্রীহরি সর্ব্বদা নির্দ্দোষরূপে বিজয়লাভ করিতেছেন।

(জৈনগণের এরূপ নিয়ম আছে যে—তাহাদের স্ত্রীগণ কোন ব্রতাবলম্বিনী হইয়া হস্তে মঙ্গলসূত্রবন্ধন করিলে ঐ সূত্রের ধারণকালপর্য্যন্ত তাহাদের রজোদর্শন হইলেও তন্নিবন্ধন অশৌচ হয় না, ইহাই উদাহরণ-রূপে বলিতেছেন) তোমার স্ত্রীগণও যদি ব্রতাবলম্বিনী হইয়া হস্তে সূত্র বন্ধন করিলে তদ্দ্বারাই রজোদর্শনজনিত-পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ তন্তুবায়নির্ম্মিত একটা মাত্র সূত্রধারণেই পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে ব্যাসদেব কৃত শাস্ত্ররূপ সপ্তসতী সূত্রশালী এবং কণ্ঠসমাপে ত্রিবৃৎ যজ্ঞোপবীতধারী ভগবানের পাপে ভয় কি? আমার প্রভুর কি ঐ সূত্র তুল্য ক্ষমতাও নাই যে নিজেকে পাপ হইতে মুক্ত রাখিবেন।

সংসারি জীবের পক্ষে বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে পাপ হয়, মুক্তজীব বন্ধনরহিত বলিয়াই তাঁহাদের তাদৃশ অনুষ্ঠানে পাপ হয় না, অতএব মুক্তত্ব অর্থাৎ মুক্তাবস্থা জীবের পাপনিবারক হইয়া থাকে। অতএব এই যুক্তি অনুসারেই ঈশ্বরও সর্ব্বত্র পাপে অলিপ্ত থাকেন, একস্থলে যদি মুক্তত্ব পাপ নিবারক হয়, তাহা হইলে অন্যস্থলে অর্থাৎ ভগবানের পক্ষে সেরূপ হইবে না কেন? যেহেতু তিনি নিত্যকাল ক্লেশবিবর্জ্জিত, সেই জন্য তাঁহার মুক্তত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ধামত্রয়বর্ত্তী প্রভু নারায়ণ প্রলয়কালেও লক্ষ্মীদেবীর সহিত ক্ষীর সমুদ্রে

অনন্তশয্যায় বিরাজমান থাকেন এবং তিনি জন্ম, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণাপ্রভৃতি শূন্য ইহা শ্রুতি হইতে অব… হওয়া যায়। অতএব তিনি যে নিত্যকাল ক্লেশশূন্য ইহারও অনুমান হইয়া থাকে। তিনি যুগে যুগে পরক্লে… নিবারণের জন্য অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক, ইহা হইতেই নিজের ক্লেশাভাব বুঝা যায়। যে ব্যক্তি নিজেই … হইতে উদ্ধৃত হয় নাই, সে অন্যকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে পারে কি ?

পত্নী লক্ষ্মীদেবী নিত্যমুক্তস্বরূপিণী, ভগবান্ নারায়ণও নিত্যমুক্ত স্বরূপ, তাঁহাদের উভয়ের … বন্ধনই আছে, পরন্তু সংসার বন্ধন নাই। পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণের নামই ভব অর্থাৎ সংসার বলা হয়, পরন্তু লক্ষ্মী… দেবী ও নারায়ণ অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান, অতএব তাঁহাদের সংসারদশা প্রভৃতি কিছুই নাই। তাঁহা… যদি সংসারী হইতেন তাহা হইলে লক্ষ্মীদেবী স্বামীদ্বারা শতপুত্রবতী হইতেন, ভগবান্ নারায়ণ ও তাদৃশ প… বর্ত্তমান থাকিতে নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি করিতেন না। অতএব নারায়ণ কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর ভ… অর্থাৎ পোষণ করেন বলিয়া ভর্ত্তা এবং লক্ষ্মীদেবী পোষিত হ'ন বলিয়া ভার্য্যা সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। তাঁহা… নিত্যকাল সুখমগ্ন এবং সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত ; অতএব তাঁহাদের সংসার নাই। **দুঃখকেই প্রকৃতপক্ষেসংসার বলা হ…** প্রাকৃতশরীরাদি ঐ দুঃখের হেতু বলিয়া তাহাদিগকেও গৌনভাবে সংসার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে… পরন্তু ঐ লক্ষ্মীদেবী দুঃখস্বরূপও নহেন অথবা দুঃখের হেতুস্বরূপও নহেন, অতএব তাঁহাকে সংসাররূপি… কিরূপে বলা যাইবে ? যদি বলা যায় তিনি স্ত্রীত্ব ধর্ম্মবিশিষ্টা বলিয়াই সংসাররূপিণী, তাহা হইলে পুংত্ব… বিশিষ্ট বলিয়া পুরুষকেও তাহা বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে তোমার মতে মুক্তিরই সম্ভব হয় না… ইহলোকে ভার্য্যার ন্যায় আত্মীয়গণও সংসারহেতু হইয়া থাকে, পরন্তু তোমার মতে মুক্তিদশায় আত্মীয়গণে… অবস্থান স্বীকৃতি হইয়াছে, অতএব ভার্য্যার অবস্থানে দোষ কি, যদি বল আত্মীয়দর্শনে রাগ উৎপন্ন হয় না… পরন্তু স্ত্রীদর্শনে রাগ উৎপন্ন হয়, অতএব মুক্তিদশায় স্ত্রীলোকের অবস্থান নিষিদ্ধ, তাহা হইলে উত্ত… এই যে—লক্ষ্মীদেবী ও শ্রীনারায়ন নিত্যকাল রাগযুক্ত বলিয়া তাঁহাদের একত্র অবস্থান দোষজনক না… অতএব তুমি ভার্য্যাহীন গুরুর বাক্যে আশ্বাস পরিত্যাগ কর। ভার্য্যা যেহেতু সহধর্ম্মিণী সেইজন্য তাঁহাকে… উৎকৃষ্ট ধর্ম্মে উন্নতিভাগিনী কর। তোমার মতে পুরুষের নিত্যকাল ঊর্দ্ধগতির নামই মুক্তি, পরন্তু উহা… অতি ক্লেশকরকার্য্য, যদি তাহাকেই মুক্তিসুখ বলিয়া মনে করিতে পার, তাহা হইলে তৎকালে স্ত্রী বিক… দুঃখকরী বলিয়া গণ্য হয়।

অতএব বেদ, দেবগণ এবং যাজ্ঞিক প্রভৃতি সজ্জনগণের প্রতি নিরর্থক মাৎসর্য্যভাব ধারন করিও না… পরন্তু কিঞ্চিৎপরিমাণেও ঐ মহাদোষ পরিত্যাগ কর। অতএব বিবেকিগণের সর্ব্বতোভাবে বৈদিকমর্য্যাদা… অবলম্বনই একমাত্র কর্ত্তব্য, যদি বল তোমাদের বৈদ্বিকগণের মধ্যেও পরস্পর কলহ দেখা যায়, তাহার উত্ত… এই যে—বেদার্থের সম্যক্ প্রকাশ না হইলেই ঐরূপ কলহ ঘটিয়া থাকে।

আত্মার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র নিত্য আকাঙ্ক্ষা পরতত্ত্বের নিত্যসেবা। পরতত্ত্বের সেবাবিহীন হইয়া… জাগতিক পরোপকারে নিযুক্ত হওয়া 'কর্ত্তব্য' বলিয়া বিবেচিত হইবে। জাগতিকব্যাপারে তুলনামূলক বিচারে… এই সমুদয় লোকাহিতকর কার্য্য প্রথমদৃষ্টিতে অত্যন্ত লোভনীয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পরতত্ত্বের সে… আচরণীয়। কিন্তু পরতত্ত্বের অধিষ্ঠান কোথায় ? পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতি পাঁচটী অধিষ্ঠানের কথা বলে—(১) সূর্য্য; (২) গণেশ, (৩) শক্তি, (৪) শিব ও (৫) কর্ম্মফলবাধ্য বিষ্ণু (?) পঞ্চোপাসক বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে… না। বিষ্ণু সকলের মূল বাস্তবতত্ত্ব—ভগবান্ পুরুষোত্তম। ভগবান্ পূর্ণব্যক্তিত্ব সম্পন্ন-সত্তা। অপর ত… গুলির ব্যক্তিত্ব অনর্থ-যুক্ত দ্রষ্টার বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী—তাহা ভগবানের বিকৃতদর্শন। যেরূপ, ২. ধর্ম্মকামী…

বাসনা বিষ্ণুকে বিকৃত (?) করিয়া সূর্য্যরূপে দর্শন চেষ্টা, অর্থকামীর গনেশরূপে দর্শন চেষ্টা, কাম-কামীর শক্তিরূপে দর্শন-চেষ্টা, এবং মোক্ষকামীর রুদ্ররূপে দর্শন চেষ্টা। পয়ঃস্বিনী-তটের আদিকেশব মন্দির হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে "ব্রহ্মসংহিতা"র পঞ্চমঅধ্যায় গ্রন্থটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল বিচার সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের গীত ঐরূপ অনর্থময় দর্শনের গর্হণ করিয়াছেন। বাসনাতাড়িত অবিধিপূর্ব্বক উপাসনায় কখনও গতাগতির নিবৃত্তি বা আত্যন্তিক মঙ্গল হইতে পারে না। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই চরম গানেও অপর অনর্থময় অধিকারের পুতুলখেলা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বাস্তব সত্য অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার উপদেশই আছে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে—ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র" শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অপর ভাষায় বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি 'অশান্ত'।

শাক্ত মতবাদঃ—শাক্তমতে শক্তিই সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টা এবং তাঁহা হইতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। ইহাও বেদবিরুদ্ধ। অনুমান দ্বারাই শক্তির কারণত্ব কল্পনা করা হয়। এ বিষয়ে লৌকিকযুক্তিও প্রযুক্ত হইতেছে—কেবলমাত্র শক্তি হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব সম্ভব হয় না। পুরুষ ব্যতীত কেবলমাত্র স্ত্রী হইতে অপত্যাদির উদ্ভব কেহ দেখে নাই। শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ অবশ্যই স্বীকার্য্য। পুরুষ-কর্ত্তৃক অনুগৃহীতা শক্তিকে কর্ত্রী বলিলে দোষ হয় না। শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ অঙ্গীকার করিলেও ব্রহ্মাণ্ড-উদ্ভবের উপযোগী ইন্দ্রিয়াদি স্বীকার না করিলে পুরুষের অনুগ্রাহকতা উপপন্ন হয় না। অতএব শ্রুতি-যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া শাক্তবাদ তুচ্ছ। শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি জগদীশ্বরেরই শ্রেষ্ঠত্ব ও জগৎকর্ত্তৃত্বাদি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। (বেদান্ত ২।২।৪২-৪৩)।

তলবকার উপনিষদে বর্ণিত আছে :—"উমাদেবী ইন্দ্রকে বলিলেন, পরব্রহ্মের শক্তিতেই দেবগণ গৌরব লাভ করিয়াছেন। উমাদেবীও সেই পরব্রহ্মেরই শক্তি, তাঁহারও স্বতন্ত্রতা নাই। শক্তি সর্ব্বদা পুরুষাধীনা বলিয়াই স্ত্রীরূপে কল্পিতা। যেমন ধনবানের অধীন ধন, তেমনি শক্তিমানের অধীন শক্তি। শক্তিমানের ইচ্ছায়ই শক্তি ক্রিয়াবতী হয়। বস্তুর গুণ বা স্বভাবের কখনও স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি থাকিতে পারে না "কুন্তখড়্গধনুর্ব্বানাঃ প্রবিশন্তি" বলিলে যেরূপ কুন্তখড়্গ-ধনুর্ব্বানধারী ব্যক্তির প্রবেশই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ শক্তিগমন করিতেছে বলিলে শক্তিমানের কর্ত্তৃত্বই বুঝাইয়া থাকে।

যখন মানব ইহজগতের অভিজ্ঞান লইয়া শক্তির স্বতন্ত্রতা এবং শক্তিকে আকর্ষণকারিণী ও আনন্দদায়িনী মনে করেন, তখন তাঁহারা চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত কামের উপাসক হইয়া পড়েন। পরাধীনাকে স্বাধীনা মনে করায়—কৃষ্ণমায়াকে 'কৃষ্ণ' মনে করায় তাঁহাদের উপাসনা অবিধিপূর্ব্বক হইয়া যায়। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি একটী, সেই পরাশক্তির পরত্ব হ্রাস হইতে হইতে যেখানে অপরত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে—চিচ্ছক্তি যোগমায়ার উপলব্ধি হ্রাস হইতে হইতে যেখানে অচিচ্ছক্তি মহামায়ার উপলব্ধি আসিয়াছে, ভুবনমোহন-মোহিনীত্ব দর্শন কমিতে কমিতে যেখানে ভুবনমোহিনীত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেখানে কৃষ্ণের উপাসনা নহে উহা অবিধিপূর্ব্বক পূজা। যখন জীব স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হ'ন—কৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত না হ'ন—যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন আদিগুরু ব্রহ্মার ন্যায় বিধিপূর্ব্বক পূজা করিতে করিতে বলেন,—"**সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা। ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা। গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।**" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৪)। স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপ প্রাপঞ্চিকজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী-মায়া-শক্তিই ভুবনপূজিতা 'দুর্গা'। **তিনি যাঁহার** ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি।

ব্রহ্মসূত্র আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত শাক্তের মতবাদই খণ্ডন করিয়াছেন। জগতে এই শাক্তমত প্রচুরভাবে প্রচারিত হইয়াছে। শক্তিমান্ পরমপুরুষ বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তি মায়া হইতেই এই মায়িক জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। এর নাম দেবী ধাম। তাই ভাগবত বলেছেন—"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।" এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—মহামায়া দুর্গা। এই সংসার-দুর্গের সকলকে মহামায়া নানা প্রকার 'চুষি' দিয়ে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন, কাজেই এখানকার গণ-সমষ্টি—মহামায়ারই উপাসক। শৈবমতের অন্তর্ভুক্ত শাক্তমত। রুদ্র—সংহারের দেবতা। শৈবমতের শেষ উদ্দেশ্য নির্ব্বিশেষ, যাহা বৌদ্ধগণের পরিভাষায় ও চিন্তাস্রোতে 'শূন্য'। শাক্তমত, বৌদ্ধমতবাদের ধারণা হইতে কিছু Develop করিয়াছে। ভোগবাদ হইতেই শাক্তেয় মতবাদ প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা মনে করিতেছি ওকে ভোগ করিব, আর সে মনে করিতেছে, আমাকে ভোগ করিবে। নেশাকে ভোগ করিতে গিয়া নেশা আমার উপর চড়িয়া বসিয়াছে। নেশা তখন প্রভু পুরুষ হইয়া গেল, আর আমার ইন্দ্রিয়গুলি বধূ হইয়া হইল প্রকৃতি। পুরুষ তখন আমার উপর চড়িয়া প্রচণ্ড নৃত্য করিতে থাকিল, শাক্তেয় মতবাদ সৃষ্টি হইল। বহির্জগৎ আমাকে কিছুকালের জন্য পুরুষ সাজাইয়া misguide করিয়াছে যোষারূপে। আমি সেই যোষা হইতে আমার পরিদৃশ্যমান দেহ ও মনের উপাদান লাভ করিয়াছি বলিয়া জন্য-জনক সূত্রে তাহাকে মাতৃত্ব আরোপ করিতেছি। আবার যোষার প্রতি 'মা' 'মা' বলিয়া আব্‌দার দেখাইতে গিয়া—তার কাছ থেকে অনেক জিনিষ চাহিতে গিয়া মাতৃত্বকে বামত্ব করিয়া ফেলিতেছি। সেখানে তখন আপাত লোক দেখান পূজ্যভাবটীও থাকিতেছে না—ভোগ্যভাব আসিয়া পড়িতেছে। আমি তখন পুরুষ সাজিয়া পড়িয়াছি, পুরুষ সাজিতে গিয়া প্রকৃতির প্রকৃতি হইয়া পড়িতেছি। প্রকৃতি তখন পুরুষ আর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি তখন প্রকৃতি হইয়া যাইতেছে। এইরূপ পুরুষ প্রকৃতিভাব কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের ভোগ চেষ্টা হইতে উদ্ভূত। এই সকলই মনোধর্ম্ম। এই মননধর্ম্ম হইতে নিস্তার লাভ হইতে পারে, যদি আমরা 'মন্ত্র' লাভ করি, তাহা হইলেই সুবিধা হয়। মন্ত্রলাভ করিলে বৈষ্ণব গুরু উপাসনার প্রণালী শিক্ষা দিবেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের উপাসনা প্রণালীতে বিশেষ ভেদ আছে। বৈষ্ণবগন ভগবানের পাল্য ভাব বিচার করেন। তাঁহারা বলেন, ভগবত্তা কখনও মাতৃত্ব হইতে পারে না। মাতৃভাব ঈশ্বরে আছে বটে, কিন্তু মাতৃত্বের সেবাপরা ক্রিয়াকে সেব্যপর পরমেশ্বরত্ব বলা যায় না। যেখানে জন্য-জনক-ভাব, সেখানে প্রাকৃতত্বের কোননা কোন প্রকার লেশ বর্ত্তমান আছে। Christ যে ঈশ্বরের পিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে গৌরবজ্ঞান ও কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে। তাহা দাস্যরসের সহিতই সমান। ভাগবতের বিচার আরও উন্নত, তাহাতে পরতত্ত্বের পাল্য ভাব স্বীকৃত হইয়াছে।

সৌর মতবাদ—দ্বিতীয় অধিকারে মানব যখন অভিজ্ঞানের প্রণালী সম্বল করিয়া ইহজগৎ হইতে বিচার করিতে থাকেন, তখন আর একটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে, এই জড়ের মধ্যে উত্তাপশক্তিই শ্রেষ্ঠ ও আশ্চর্য্য ক্ষমতার নিদান। ঋতুসকলের নিয়মানুসারে সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প সকল উঠিয়া মেঘরূপে বায়ুদ্বারা চালিত হয় এবং উত্তাপ উপস্থিত হইলে পুনরায় বৃষ্টি হইয়া পতিত হয়। গন্ধক লৌহাদিধাতুর উত্তাপ-শক্তির সংযোগের দ্বারা পর্ব্বতসকল ভগ্ন হয়, পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং কামান বন্দুক হইতে অস্ত্র সকল নির্গত হইয়া বৃহৎব্যাপার সম্পাদন করে। বিদ্যুতের উত্তাপ-শক্তি জগতের কতই না মহৎকার্য্য করিতেছে। অগ্নি মুহূর্ত্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভস্মসাৎ, আবার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কত মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতেছে। এই উত্তাপের মূলাধার সূর্য্য, সূর্য্য না থাকিলে আজ জগতের সমস্ত উত্তাপশক্তি রহিত হইয়া যাইত, সুতরাং এই সূর্য্যই উপাস্য। এইরূপ বিচার যাঁহারা সূর্য্যের আকর্ষণীসত্তা ও আনন্দসত্তা অনুভব করিয়া সূর্য্যকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাহারাও কৃষ্ণেরই উপাসনা করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কৃষ্ণের উপাসনা হয় না—অবৈধ পূজা হইয়া যায়।

যদিও বাহ্য-অভিজ্ঞানে উত্তাপকেই সমস্ত সঞ্চালনের কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়, তথাপি চেতনা-প্রেরণা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। যখন অন্তঃকরণে কোন বৃত্তির বিশেষ সঞ্চালন হয়, তখনই দেহে উত্তাপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সমস্ত প্রকার প্রাকৃত পদার্থে যে উত্তাপের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল চেতন-পদার্থের ক্রিয়ার ফল। যে-কালে পার্থিব পদার্থ সকল সৃষ্ট হয় নাই, তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ছিল; কিন্তু চিৎস্বরূপ ঈশ্বর-বীর্য্য তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভবিতব্য শক্তিরূপা প্রকৃতির গুণ ক্ষুব্ধ হওয়ায় সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। 'প্রকৃতি'—শব্দের অর্থ—প্রধান শরীর; এই শরীর চেতন বিহীন হইলে শব হয় এবং চেতনের দ্বারা চালিত হইলে কার্য্য করে। পরমেশ্বরের ঈক্ষণের দ্বারা ঐ প্রকৃতিতে যে ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই উত্তাপরূপে বর্ত্তমান। অতএব উত্তাপকে স্বীকার করিয়া চেতন-প্রেরণা অস্বীকার করা কেবল আত্মবঞ্চনা মাত্র। ঐ ঈক্ষণের আভাসমাত্র উত্তাপ ও আকর্ষণ—যদ্দ্বারা সৌরজগতের যাবতীয় গতি ও ক্রিয়া নিয়মিত হইয়াছে। ঋতুদিগের গমনাগমনের দ্বারা মেঘাদির উৎপত্তি ও বর্ষন, লৌহ প্রভৃতি জল সংযোগের দ্বারা পর্ব্বতবিদারণ ও ভূমিকম্প এবং তিথিযোগে জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস—এ সকলেই ভগবানের ঈক্ষণজনিত নিয়ম বলিতে হইবে। আকর্ষণ বা উত্তাপ কদাচ স্বয়ংসিদ্ধ গুণ হইতে পারে না। চেতন স্বয়ং বিধাতাস্বরূপ এবং আকর্ষণাদি বিধি মাত্র, অতএব বিধাতাকে অস্বীকার পূর্ব্বক বিধি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে।

কিন্তু যাঁহারা—"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ (গীতা ১৫।১২) সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজ অখিলজগৎকে প্রকাশিত করে, সে তেজ আমারই জানিবে। —'নতত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' (কঠ ২।১৫)। প্রভৃতি কৃষ্ণের সাক্ষাদুপদেশ বা শ্রুতি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত ধর্ম্মের কামনা লইয়া সূর্য্যের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন, তাহারা কৃষ্ণপূজা করিলেও তাহাদের প্রকৃত কৃষ্ণপূজা হয় না—অবিধি পূর্ব্বক হইয়া যায়।

যখন জীব স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহা বুঝিতে পারেন, তখন আদিগুরু ব্রহ্মার ন্যায় কৃষ্ণের বিধিপূর্ব্বক পূজা করিতে করিতে বলিতে থাকেন,—

"যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকল গ্রহাণাং রাজা সমস্ত সুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।

যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫২)। যিনি গ্রহগনের রাজা, অশেষ-তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তি, জগতের চক্ষুস্বরূপ অথবা ভগবানের প্রাকৃত বিরাটরূপে কল্পিত চক্ষুরূপ, সেই সূর্য্যদেব যাঁহার আজ্ঞায় কাল চক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

গাণপত্য মতবাদ—তৃতীয় অধিকারে মানব যখন ইহজগৎ হইতে অভিজ্ঞান পাথেয় লইয়া যাত্রা করেন, তখন ঐ উত্তাপকেও তাহার জড় বলিয়া বোধ হয় এবং আর একটুকু অগ্রসর হইয়া পশুচৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া থাকেন। বিঘ্নরাশিদ্বারা সতত অভিভূত মানব-জগৎ এই জগতে ধনশক্তির ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া বিঘ্ন-বিনাশার্থ চতুর্ব্বর্গান্তর্গত অর্থপ্রাপ্তির লালসায় গণপতিকেই পরমেশ্বর বলিয়া বোধ করেন। কামনা-মূলে তাঁহাতেই শ্রদ্ধা হওয়ায় গণপতির স্বতন্ত্রতা বিচার করিয়া তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হন। ইহাদ্বারা কৃষ্ণের উপাসনা হইলেও প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণ উপাসিত হন না, কারণ ঐরূপ উপাসনা অবৈধ। জীব স্বরূপে অবস্থিত হইলে যখন ইহা বুঝিতে পারেন, তখন আদিগুরু ব্রহ্মার অনুসরণে বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপাসনা করিতে করিতে স্তব করিয়া বলেন,—

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভদ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।

বিঘ্নান বিহন্তমলমস্য জগত্রয়স্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" (ব্রঃ সং ৫।৫০) "গণপতি ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎকার্য্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয়মস্তকে কুম্ভ-যুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

ব্রহ্মা-শিবাদিপ্রমুখ নিখিলদেবতা যেরূপ কীর্ত্তনমুখে বৈধভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই বৈধ-প্রণালীতে কৃষ্ণের কীর্ত্তনময়ী উপাসনা করিতে করিতে জীব বলেন,—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়িবদ্ধ সৌহৃদাঃ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥" (ভাঃ ১০।২।৩৩)

ব্রহ্মাদিদেবতা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেবকীগর্ভ স্তুতি করিয়া বলিতেছেন,—হে মাধব! হে প্রভো! আপনাতে প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত ভবদীয় ভক্তগণ কখনই শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট হন না, বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সকল বিঘ্নজনক দেবতাগণের মস্তকরূপ সোপান-সমূহে পাদন্যাসপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠপদে আরোহণ করেন।

শৈব মতবাদ—চতুর্থ স্থূলাধিকারে মানব যখন ইহ-জগতের অভিজ্ঞান-পাথেয়সহ পরমপদবীতে আরূঢ় হইয়া ক্লেশ-নিবৃত্তির জন্য আত্মহত্যা বা ত্রিপুটীবিনাশরূপ মোক্ষকেই পরম-প্রয়োজন বলিয়া বিচার করেন, তখন পশু-চৈতন্যর পরিবর্ত্তে নর-চৈতন্য তাঁহার আরাধ্য বস্তু হয়। মোক্ষকামী হইয়া নর-চৈতন্য রুদ্রের উপাসনায় ত্রিপুটীবিনাশ-চেষ্টা এবং তাহাতে আনন্দের অনুসন্ধান—অবিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণেরই উপাসনা। আনন্দের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের নিত্যত্ব না থাকায় কেবলানন্দের স্বার্থকতা নাই। নপুংসক ও বন্ধ্যার নিকট যেমন পুত্রস্নেহের পরিচয় নাই, আনন্দের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের অভাবেও তদ্রূপ আনন্দত্বের উপলব্ধি নাই। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ত্রিপুটীবিনাশরূপ মোক্ষধর্ম্ম বা আনন্দের অনুসন্ধানের জন্য নর চৈতন্য রুদ্রের উপাসনা করেন, তাঁহারাও বিপথে কৃষ্ণেরই অনুসন্ধান করিতেছেন—তাঁহারাও অবধিপূর্ব্বক কৃষ্ণেরই উপাসনা করিতেছেন। তাই লোক-পিতামহ আদিগুরু-ব্রহ্মা আমাদিগকে বিপথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপাসনার কথা জানাইয়াছেন,—

"ক্ষীর যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ সংজায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।

যঃ সম্ভূতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৫)

"দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" দুগ্ধরূপ উপাদানে অম্লসংযোগ করিলেই দধি হয়, জল হইতে দধি হয় না, বা দুগ্ধের ন্যায় দেখিতে চুণগোলা বা চা-খড়িগোলায় অম্লসংযোগ করিলে দধি হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণ হইতেই রুদ্রতত্ত্ব আবির্ভূত হন। দুগ্ধ হইতে দধি হইলেও দধিকে যেরূপ 'দুগ্ধ' বলা চলে না, আবার দুগ্ধ হইতে পৃথক্ বস্তুও বলা চলে না অর্থাৎ দধিত্ব যেরূপ দুগ্ধত্ব নয়—দধিকে দুগ্ধের সহিত একাকার করা যায় না, তাহা হইলে দুগ্ধ আর 'দুগ্ধ' থাকে না; দুগ্ধ বিকারী হইয়া প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণ-উপাদান-কারণ হইতে শম্ভুতা প্রকাশিত হইলেও শম্ভুতাকে কৃষ্ণের সহিত সমন্বয় বা একাকার করিলে কৃষ্ণত্ব আর থাকিল না, কোন একটী বিকারী বস্তুরূপে প্রকাশিত হইল। তাৎপর্য্য এই যে, শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ আর একটী ঈশ্বর নহেন, শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধিত্বলাভ করে, তদ্রূপ বিকারবিশেষ-যোগে ঈশ্বর পৃথক্-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র'। সে স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমোগুণ, তটস্থশক্তির স্বল্পতাগুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প-হ্লাদিনীমিশ্রিত সম্বিদ্গুণ বিমিশ্রিত হইয়া একটী

বিকারবিশেষ হয়। সেই বিকারবিশেষযুক্ত স্বাংশ-ভাবাভাস-স্বরূপই—ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ সদাশিব এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকটিত হন। সৃষ্টিকার্য্যে দ্রব্যব্যূহময় উপাদান, স্থিতিকার্য্যে কোন-কোন-অসুরনাশ এবং সংহার-কার্য্যে সমস্ত ক্রিয়াসম্পাদনার্থ স্বাংশভাবাপন্ন বিভিন্নাংশরূপ শম্ভু-স্বরূপে গোবিন্দ 'গুণাবতার' হন। শম্ভুরই কালপুরুষত্ব নির্ণীত আছে। ''বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু'' ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয়-কালশক্তি-দ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধশাস্ত্রে জীবদিগের অধিকার-ভেদে ভক্তিলাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচার-পূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বের সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশদ্‌গুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে 'জীব' বলা যায় না। তিনি—ঈশ্বর, তথাপি 'বিভিন্নাংশগত'।

পাঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবমত—পঞ্চমাধিকারে অভিজ্ঞতাবাদী মানবের হৃদয়ে জীবচৈতন্যের পরমচৈতন্যের উপাসনার আভাস হৃদয় অধিকার করে। মানব যখন স্বীয় অভিজ্ঞতাবাদের উপর একটুকু অধিক নির্ভর করে, তখন পরমচৈতন্যের উপাসনা বৃদ্ধির আভাস-প্রতিবিম্ব ছায়াভাসরূপে তাহার হৃদয় প্রতিফলিত হয়। পরমচৈতন্যের প্রতি এই প্রতিবিম্ব-ছায়াভক্ত্যাভাসই পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণুপূজা বা কৃষ্ণোপাসনা; ইহা কৃষ্ণের উপাসনা হইলেও ইহাতে প্রতিবিম্ব ছায়াভক্ত্যাভাস থাকায় ইহাকেও বৈধ কৃষ্ণোপাসনা বলা যায় না। ইহা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিদ্ধ বিষ্ণু-আরাধনা বা বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মনামে কথিত হইয়া থাকে। ইহাতে পরম-চৈতন্যের পরম স্বতন্ত্রতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, নিরঙ্কুশ ইচ্ছা, অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তা, চিদ্বিলাসত্ব, নিত্যত্ব, অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় এবং আরোহবাদ মূলে পরমচেতনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও নিত্যত্ব খর্ব্বীকৃত হওয়ায় এইরূপ বিষ্ণু কৃষ্ণোপসানাকেও বৈধ কৃষ্ণোপাসনা বলা যায় না। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক অভিজ্ঞতাবাদী, আরোহবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী, মায়াবাদী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী পঞ্চোপাসকগণের যে বিষ্ণুপূজা বা কৃষ্ণোপাসনা, তাহাও বৈধ কৃষ্ণ আরাধনা নহে,—অবিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণপূজা।

আরোহবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ লইয়া অচিন্ত্যবস্তুকে মাপিতে গেলে অবশেষে কূল-কিনারা না পাইয়া হয় বিরাটরূপের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের 'স্বকীয়রূপ' দর্শনে প্রতিহত হইতে হইবে, না হয় অবশেষে তুরীয়বস্তুকে তুতীয়মানের বিচার লইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ মাত্র বলিয়া হাঁপ ছাড়িতে হইবে এবং এই নির্ব্বিশেষরূপের প্রতীকস্বরূপ 'ব্রহ্মণোরূপ-কল্পনা' প্রভৃতি পৌত্তলিকতা-ন্যায়ের আশ্রয়ে বিষ্ণুর কল্পিত মূর্ত্তি গড়িবার চেষ্টা করা হইবে। এ সকলই অবৈধ উপাসনা। এই আরোহবাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে কৃষ্ণের স্বকীয়রূপ বা পরিপূর্ণ-চেতন বাস্তবসত্য কৃষ্ণের বৈধ উপাসনা হইতে পারে না। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—''যমেবৈষ বৃণুতে তেনলভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।'' হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ। তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।'' যাঁহাকে সেই পরমচেতন বরণ করেন, তিনিই সেই পরমচেতনকে লাভ করিতে পারেন। সেই পরমচেতন তাঁহারই নিকট স্বকীয় তনু প্রকাশিত করিয়া থাকেন। জ্যোতির্ম্ময় আবরণের দ্বারা পরমসত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে। এই জগৎ হইতে অভিজ্ঞতাবাদ লইয়া দর্শন করিতে গেলে সর্ব্বোচ্চশিখরে উঠিয়া নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। নিজচেষ্টায় কেহ সেই দুর্ভেদ্য জ্যোতির্ম্ময় পাত্র ভেদ করিয়া পরম সত্যস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন না, তাই হে পূর্ণ! আপনি আপনার অঙ্গকান্তিস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় আবরণ সত্যধর্ম্মপিপাসুগণের জন্য উন্মোচন করুন্, তাহা হইলেই তাঁহারা আপনার দ্বিভুজমুরলীধর সত্যস্বরূপ দর্শন করিতে পারিবেন। হে পূর্ণ! হে সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানি! হে সম্বিদ্বিগ্রহ! হে সর্ব্বনিয়ামক! হে সূরিগণপ্রাপ্য! হে আদিগুরু ব্রহ্মার আরাধ্য! আপনার অঙ্গকান্তিচ্ছটাকে

অপনয়ন করুন, আপনার তেজোরাশিকে উপসংহার করুন, যেন আপনার কল্যাণতমরূপ অর্থাৎ কল্যাণরূপ ও ব্রহ্মরূপ, কল্যাণতররূপ যে পরমাত্ম-নারায়ণাদিরূপ এবং তাঁহাদেরও মূলরূপ স্বয়ংরূপ দ্বিভূজমুরলীধরের স্বরূপ দর্শন করিতে পারি।

এইরূপে জীব যখন আরোহবাদে আস্থা পরিত্যাগ করিয়া অবরোহবাদ বা ভগবৎকৃপার অপেক্ষা করেন তখন কনিষ্ঠাধিকারে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব—ছায়াভক্ত্যাভাস বিদূরিত হইয়া ছায়াভক্তির আভাসযুক্ত পুরুষের হৃদয়ে যে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা কৃষ্ণের বৈধ উপাসনার সর্ব্বনিম্নস্তরমাত্র। মধ্যমাধিকারে কৃষ্ণের বৈধ উপাসক কার্ষ্ণ্যগণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাঁহাদের পূজা করিতে শিখেন। তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণের বৈধ-উপাসনা আরম্ভ হয়, তখন আদিগুরু ব্রহ্মাসিদ্ধান্ত শ্রীগুরুমুখে শ্রবন করিয়া বুঝিতে পারেন যে গীতার একাদশ অধ্যায়োক্ত বিরাটরূপের উপাসনাও বৈধ উপাসনা নহে, তাহা নবীন উপাসকগণের জন্য কল্পিত; নরাকৃতি পরব্রহ্মই কৃষ্ণের স্বকীয়রূপ, তাঁহার উপাসনাই বৈধ উপাসনা। তাই ভগবান্ বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া পরম মাধুর্য্য দ্বিভূজ স্বকীয়মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলে অর্জ্জুনের চিত্ত স্থির হইয়াছিল। জীব বৈধ কৃষ্ণোপাসকগণের কৃপায় স্বরূপে অবস্থিত হইলে বুঝিতে পারেন যে আরোহপান্থী নির্ব্বিশেষবাদী ব্রহ্মোপাসকগণ কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিলেও তাঁহাদের পূজাচেষ্টা অবিধিপূর্ব্বক। যাঁহারা ব্রহ্মবাদী হইয়া বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণোপাসনা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা আদিগুরু ব্রহ্মার ন্যায় স্তব করিতে করিতে বলেন,—

যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত নির্ব্বিশেষব্রহ্ম কোটিব্রহ্মাণ্ডাগত বসুধাদি-বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ-তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামিগণের আরাধ্য যথাক্রমে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্রদেব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামী মানবের যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন যখন তাহা সমস্তই নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন কামনার বস্তু আর কি থাকিল? সুতরাং বিষ্ণুদেবতার স্থান কোথায়? বিষ্ণু কি কামনা পূর্ণ করিবেন? বিষ্ণু—কামনার দেবতা নহেন। তাঁহার স্বয়ংরূপস্বরূপ স্বয়ংই কামদেব। তিনি কাহারও কাম চরিতার্থ করেন না। সকল জীব, সকল চেতন, নিখিলশক্তি, তাঁহার কাম চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত। অপ্রাকৃত কামদেবের দ্বারা জীব স্ব-স্ব কার্য্য চরিতার্থ করিতে চাহিলে সেই কামদেব জীবের নিকট সেইসকল আবৃতস্বরূপের মধ্যে কোন না কোন একটি স্বরূপ অর্থাৎ জীবের কামানানুসারে সূর্য্য, গণেশাদি স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ যে বিষ্ণুদেবতার উপাসনা করেন, তাহা পঞ্চোপাসনার বিষ্ণু নহেন বা দ্বাদশাদিত্যের অন্যতমও নহেন। বৈষ্ণবগণ যে বিঘ্নবিনাশনের উপাসনা করেন, তাহা অর্থকামী গণসমষ্টির দেবতা গণেশ নহেন। গণেশ যাঁহার শ্রীচরণদ্বয় তাঁহার মস্তকে ধারণ করিয়া যাবতীয় বিঘ্নবিনাশের শক্তি লাভ করেন, বৈষ্ণবগণ সেই শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসক। পঞ্চোপাসনার পঞ্চদেবতার প্রত্যেকেই সমান। তন্মধ্যে বদ্ধজীব তাহার বদ্ধরুচির অভিলাসানুসারে কোন একটি দেবতাকে সাময়িক প্রাধান্য প্রদান করিয়া সেই দেবতার সাময়িক উপাসনা করেন এবং পরে আপনাকে সেই দেবতার সমান কল্পনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ সেই দেবতাই হইয়া যান। ইহা ভক্তি নহে, ভক্তি শব্দের ব্যাভিচার। ভাঙ্গি যেরূপ কুকুরের প্রতি ভক্তি করে, বিদ্যার্থী যেরূপ সরস্বতীদেবীকে ভক্তি করেন, সেইরূপ ভক্তি শুদ্ধভক্তি বা হরিসেবা নহে। উহা উপাস্যবস্তু (?)-দ্বারা স্ব-স্ব কামচরিতার্থ করাইবার চেষ্টা মাত্র। ধনংদেহি দ্বিষো জহি প্রভৃতি ঐহিক-আমুষ্মিক প্রার্থনা। ইহজগতে বা পরজগতে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অভিলাষমূলে যে ভক্তির ভান কিংবা চরমে ভক্তি বিনাশ করিবার জন্য মাঝপথে যে ভক্তির অভিনয়, তাহা ভক্তি নহে। গুণজাত জগতের পঞ্চোপাসনা এবং তদ্সঙ্গে Crescent ও Cross এর উপাসনা অন্তর্ভূক্ত করিয়া কেহ কেহ সপ্তোপাসনার স্বরূপ নির্ণয় করেন।

কৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত ত্রিদল বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট সুতরাং তাঁহার ভোগ কেহ বাধা দিতে পারে না। তাঁহার পূজা সকলেই করিতেছে। কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক পূজা হইলে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁহারা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণেরই ছায়া শক্তির পূজা করেন; কারণ কৃষ্ণ হইতে কাহারও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার পূজা হইয়া যাওয়ায়, তাঁহাদের স্বরূপ-জ্ঞান হইতেছে না—সম্বন্ধ-জ্ঞান বিকশিত হইতেছে না। যেদিন সম্বন্ধ-জ্ঞান হইবে; সেদিন জানিতে পারিবে—কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু—জীব মাত্রেই কৃষ্ণের নিত্যদাস—কৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চোপাসনাকে নিরাশ করিয়াছেন। সর্ব্বেশ্বর—কৃষ্ণের ভজনই জীবের নিত্য কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেবতাগণ সকলই বিষ্ণুর কিঙ্কর। গোবিন্দের আদেশ বহনই তাঁহাদের কার্য্য। যাঁহারা দেবতাগণকে 'বিষ্ণুর কিঙ্কর' না জানিয়া বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা কোন কালেই মুক্ত হইতে পারেন না।

কৃষ্ণ যে স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই স্বরূপ, উভয়েরই শুদ্ধস্বরূপতা আছে। বিষ্ণু বিকৃত-হেতু অর্থাৎ প্রকটিত-হেতুরূপে কৃষ্ণের সহিত সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট, মূলহেতুরূপ কৃষ্ণের স্বীয় প্রকরণ-রূপই বিষ্ণু। কৃষ্ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি—নারায়ণে ষষ্টিসংখ্যক গুণরূপে পূর্ণভাবে রহিয়াছে। বিষ্ণু হইতেও চারিটী গুণ অধিক-রূপে এবং নারায়ণের ষট্‌টী গুণ অত্যদ্ভুতরূপে শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ মূলদীপস্বরূপ। তাঁহা হইতেই অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বরূপ দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। মহাদীপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি হইতে মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী এবং রামাদি স্বাংশ অবতার সকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তিগত দীপ-স্বরূপ।

সবিশেষ-বিষ্ণুর উপাসকই বৈষ্ণব আর নির্গুণ বিষ্ণুউপাসকই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও বিষ্ণু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাবত্রয়। ব্রহ্মজ্ঞের নাম ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকের নাম 'বৈষ্ণব'। পূর্ণাবির্ভাব-তত্ত্ব—ভগবান্ এবং অসম্যগাবির্ভাব-তত্ত্ব—ব্রহ্ম, সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞানময় ব্রাহ্মণই ভজনপ্রভাবে বৈষ্ণব হইতে পারেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে ব্রহ্মের যে পাঁচ প্রকার সগুণ উপাসনা কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের নির্দ্দেশক নহে। বিবর্ত্তবাদী ব্রাহ্মণ অভিমান করিতে গিয়া সকাম অনুভূতিতেই ব্রাহ্মণতা আবদ্ধ স্থির করেন; কিন্তু জীবের স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞধর্ম্মই নিত্য বর্ত্তমান। বিষ্ণুর কৃপায় মায়াবাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেই ব্রাহ্মণ 'অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ' বা বৈষ্ণব হইতে পারেন। ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্ব্ব-নিম্ন সোপান। 'বৈষ্ণবতা' ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন লক্ষপতির সহস্র মুদ্রা আছে। বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।

তার্কিক মত—বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে তার্কিক মতের কথা লিখিত হইয়াছে। তার্কিকগণের মত—পার্থিবাদি চারিপ্রকার পরমাণু নিরবয়ব, রূপাদিমান, পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণ ও প্রলয়সময়ে অনারব্ধ কর্ম্মস্বরূপে অবস্থিতি করে। সৃষ্টিসময়ে উহারা জীবাদৃষ্টাদি পুরঃসর দ্ব্যণুকাদিক্রমে অবয়ববিশিষ্ট স্থূলতর জগৎ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। উভয় পরমাণুর ক্রিয়া অদৃষ্ট-সাপেক্ষ। সেই ক্রিয়াদ্বারা পরস্পরের সংযোগ ঘটিলেই হ্রস্বদ্ব্যণুক সঞ্জাত হয়। এখানে পরমাণুদ্বয় সমবায়িকারণ। উভয়ের সংযোগ অসমবায়িকারণ, আর উহার নিমিত্তকারণ জীবাদৃষ্ট। এইরূপে দ্ব্যণুকত্রয়ের ক্রিয়াদ্বারা মহৎত্র্যণুক সঞ্জাত হয়। এইপ্রকারে স্থূল হইতে স্থূলতরের সমুৎপত্তিতে ক্রমান্বয়ে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু সমুৎপন্ন হইয়াছে। যৎকালে ঈশ্বর পৃথিবীকে সংহার করিতে বাসনা করেন, তৎকালে পরমাণুতে ক্রিয়াদ্বারা পরমাণুদ্বয়ের বিভাগ, তাহা হইতে সংযোগের বিয়োগ ও দ্ব্যণুকসমূহের নাশ হইলে পৃথিব্যাদিরও ধ্বংস হয়। এস্থলে হ্রস্বদ্ব্যণুকও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘ-ত্র্যণুকের সমুদ্ভব এবং ত্র্যণুক হইতে চতুরণুকের উৎপত্তি বিরুদ্ধ ভাবযুক্ত। উক্ত পরমাণুক্রিয়া কি পরমাণুগত

অদৃষ্টজন্য অথবা আত্মগত অদৃষ্টজন্য? পরমাণুগত অদৃষ্টের পরমাণুগতত্বের অসম্ভাবনাবশতঃ উহা অযুক্ত আবার আত্মগত অদৃষ্টজন্য পরমাণুগত ক্রিয়ার উদ্ভবও সম্ভব হয় না। সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধে উক্ত ক্রিয়ার উদ্ভবও অসম্ভব। নিরবয়ব আত্মার সহিত অবয়বহীন পরমাণুসকলের সংযোগও অনুপপন্ন। সুতরাং আত্মক্রিয়াজনক অদৃষ্ট উভয়থা অযুক্ত। ক্রিয়ার কোনরূপ নিয়ত হেতুর বিদ্যমানতা অভাবে পরমাণুর ক্রিয়া স্বীকারও অযৌক্তিক। এদিকে আবার ক্রিয়ার অভাবে সংযোগের অভাব, তাহাতে দ্ব্যণুকাদির অভাব এবং তৎফলে সৃষ্টিরও অভাব ঘটিয়া পড়ে। এক্ষণে যুক্তিমল্লিকার যুক্তিপ্রদর্শিত হইতেছে। (শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ।)

তার্কিকগণ বলেন,—সমস্ত ঘটের মধ্যে ঘটত্ব নামে একটী জাতি বর্ত্তমান আছে—পরন্তু ঘট এবং ঐ ঘটত্ব জাতি অভিন্ন নহে, যদি জাতি ও ঘট এক হয় তাহা হইলে সমস্ত ঘটই এক হইতে পারে, অতএব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী পৃথক বস্তু, এক নহে। সম্প্রতি তাহাদের এই মত দূষিত হইতেছে, তার্কিকগণ বলেন যে—'ঘট আছে' এইরূপ একবিধ ব্যবহার সমস্ত ঘটেই হইয়া থাকে বলিয়া সত্তা নামক জাতি সর্ব্বত্রই এক।

সম্প্রতি তাদৃশ অজ্ঞগণের নিকট বিবেকিগণের প্রশ্ন এই যে—তুমি যে সর্ব্বত্র একবিধ অস্তিত্ব ব্যবহার বলিতেছ, ঐ অনুগত ধর্ম্মটী অভেদ অথবা একধর্ম্ম বিশিষ্ট অথবা একরূপ আকারবিশিষ্ট, এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশের অতিরিক্ত কিছুই বলিতে পার না।

তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বব্যবহারের অভেদবাদী প্রতিবাদী উভয়েরই অসম্মত, দ্বিতীয়পক্ষ আমাদের মতে সিদ্ধ, তৃতীয় পক্ষ অপ্রয়োজক, একাকার অনেকব্যবহারহেতু একবিধ অনেক ধর্ম্মই সিদ্ধ হয়, একধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। অনেক ব্যবহার সিদ্ধ ধর্ম্মসকলের অনেকত্ব ব্যতীত একত্ব সিদ্ধ হয় না, যক্ষগণের যাদৃশ আকার তদুপযোগী বলি (আহার্য্য উপহার) দানই কর্ত্তব্য, ইহাই প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন। ঘটত্বরূপ অখণ্ডজাতির এক একটী অংশ এবং এক একটী ঘটে বর্ত্তমান আছে এরূপ অঙ্গীকার করিলে—ঘটত্বরূপ জাতির এক অংশ মাত্র একটী ঘটে থাকায় ঐ ঘটটীও অংশস্বরূপই হইতে পারে, পূর্ণ ঘট হইতে পারে না।

সম্পূর্ণ পটত্বরহিত খণ্ডপটে যেরূপ পটাংশ বুদ্ধি হয় এইরূপ সম্পূর্ণ জাতিরহিতবস্তুতেও অংশবুদ্ধি হইতে পারে। যদিও আকাশের অংশমাত্রেও আকাশশব্দ ব্যবহার দেখা যায় তাহা হইলেও অবকাশ দানরূপ ধর্ম্মবশতঃ অথবা উপচার (লক্ষণ দ্বারা অর্থবোধ)-মাত্রেই ঐরূপ ব্যবহার হয়। তুমি জাতিব্যঞ্জক প্রকাশক অনেক ধর্ম্মদ্বারা একটী মাত্রই জাতি বর্ত্তমান, একথা যেরূপ বলিয়া থাক, সেইরূপ অনেক ঘটত্বরূপ নিমিত্ত হইতেও একরূপ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হউক। তুমি জাতির ঐক্য অঙ্গীকার করিয়াও জাতিব্যঙ্গ্য (অঙ্গহীন) শব্দসকলের একত্ব স্বীকার কর না, এইরূপ নিয়ম্যশব্দ ও নিয়ামিকা জাতির একত্ব সহ্য করিতে পারে না, ইহাই আমার বুদ্ধি।

অনেক কার্য্যর কারণও বহু বর্ত্তমান, কারণ অনেক হইলে কারণবৃত্তিধর্ম্ম এক হইতে পারে না। লোকে গুরুর গুরু পরমগুরুই হইয়া থাকেন, পরন্তু মূঢ় হ'ন না। জাতিব্যঞ্জক উক্তি অনেক, জাত্যুক্তিও অনেক, উভয়ের অনেকত্ব অবস্থায় জাতির একত্ব কিরূপে হইতে পারে?

তার্কিকগণ অযুক্তসিদ্ধপদার্থদ্বয়ের সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করেন। উক্ত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একটী নিত্য ও অন্যটী অনিত্য, তন্মধ্যে অনিত্যের নাশ হইলে নিত্য পদার্থটী অন্যত্র অবস্থান করে—ইহাই তাহাদের মত। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে—প্রলয়কালে যদি সর্ব্বত্র নিত্যা জাতি বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে জাতির আশ্রয় সর্ব্বপদার্থের অভাব-হেতু অপরাশ্রিত জাতিরই অসম্ভব হয়।

"ঘট নাই" "পট নাই" এইরূপ বস্তুর অভাব বিষয়ক অনুগত ব্যবহার সত্ত্বেও অভাবের একত্ব নিয়মের অভাব হেতু জাতিমাত্রেও একত্ব অঙ্গীকার ব্যর্থই হইয়া থাকে। অনেক পদার্থে অনেক ব্যবহারকারিনী

জাতি বহুত্বধর্ম্মব্যাপ্তই হইতে পারে. এক কুঠার লক্ষ কার্য্য সাধন করিলেও তদীয় ব্যাপার লক্ষবিধ বলিয়া বহুত্ববিশিষ্টই হইয়া থাকে। অতএব অনেক কার্য্যের প্রতি একের কারণতা কিরূপে কল্পনা করা যায়? ভিন্ন ভিন্ন পদার্থসম্বন্ধী জাতিরূপ পদার্থ ও স্বয়ং অনেক হইয়াই অনেক কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। এইরূপে সর্ব্বত্র অনুগত একমাত্র জাতির খণ্ডন-হেতু—ধর্ম্মধর্ম্মির অভেদ ধর্ম্মিসকলেও অভেদ হইতে পারে—এইরূপ তার্কিক প্রদত্ত দোষসমূহদ্বারা শুদ্ধমত দূষিত হইতে পারে না। (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।

ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্যকারগণ—ব্রহ্মসূত্র বা বাদরায়ণসূত্র বেদান্তদর্শনের মূল গ্রন্থ। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ 'ব্রহ্মসূত্র'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—"ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি" (গীতার সুবোধিনী টীকা ১৩।৪) অর্থাৎ ব্রহ্ম ইঁহাদের দ্বারা সূত্রিত অর্থাৎ সূচিত হন, এই অর্থে—ব্রহ্মসূত্রসমূহ। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন—প্রত্যেকটিই সূত্রাকারে গ্রথিত। দর্শনসমূহের মধ্যে বেদান্তদর্শনের সূত্রসমূহ বিশেষভাবে সুসংবদ্ধ ও সুসমঞ্জস। ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসংখ্যা—৫৫৫; কোন মতে—৫৫৮ বা কিছু কম বেশী। এই ব্রহ্মসূত্রসমূহ (১) সমন্বয়, (২) অবিরোধ, (৩) সাধন ও (৪) ফল—এই চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় চারিটি পাদ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পাদে আবার বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে অধিকরণ-সংখ্যা দৃষ্ট হয়। এই অধিকরণ-সংখ্যাও বিভিন্ন আচার্য্যের সিদ্ধান্তানুসারে কম বেশী হইয়াছে।

প্রস্থান ভেদ—শঙ্কর-সম্প্রদায় প্রভৃতি কতিপয় দার্শনিক বেদান্ত শাস্ত্রের ত্রিবিধ প্রস্থান, শ্রীমধ্বাচার্য্য চতুর্ব্বিধ প্রস্থানের কথা বলিয়াছেন। প্রস্থান-শব্দের অর্থ— আকর-গ্রন্থ। যে-স্থানে প্রকৃষ্টভাবে দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তু নিহিত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই সকল আকর-স্থানই—প্রস্থান। শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের মতানুসারে উপনিষৎসমূহ—**'শ্রুতিপ্রস্থান,'** ব্রহ্মসূত্র—'ন্যায়প্রস্থান' ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সনৎসুজাত প্রভৃতি—'স্মৃতিপ্রস্থান' নামে উক্ত হয়। ন্যায়দর্শনে যেরূপ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই পঞ্চাবয়বের বিচার-পদ্ধতিক্রমে অনুমানের মীমাংসা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়, সেইরূপ বেদান্তদর্শনেও বিষয়, সংশয় পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সংগতি—এই পঞ্চ ন্যায়াঙ্গ-দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য বেদান্তদর্শনকে ন্যায়প্রস্থান বলে।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতে—(১) প্রমানপ্রস্থান (দশপ্রকরণ), (২) শ্রুতিপ্রস্থান, (৩) গীতাপ্রস্থান ও (৪) সূত্রপ্রস্থান।

ব্রহ্মসূত্রকে কেহ কেহ 'শারীরক-সূত্রও বলেন। শরীরাধিষ্ঠিত জীব বা শরীরভব সুখ-দুঃখ—শারীরক (ভাঃ ৩।৩১।১৭) নামে অভিহিত। তৎসম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত-সার সূত্রসমূহই শারীরক-সূত্র অর্থাৎ যে গ্রন্থে সংক্ষেপে জীবের অধিষ্ঠানভূত শরীরের বা তদুত্থিত সুখ-দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বিষয়ক মীমাংসা আছে। ইহা শারীরকমীমাংসা-সূত্র নামেও খ্যাত। কেহ কেহ বেদান্তশাস্ত্রকে শারীরকভাষ্য বলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের দুইটী শরীর বা অঙ্গ, একটি বাহিরেরদিকের অঙ্গ আর একটি ভিতরেরদিকের অঙ্গ। ব্রহ্মের এই দুইটি অঙ্গ বা শরীর আছে বলিয়া ব্রহ্মাভিন্ন বেদান্ত-সূত্রকে শারীরক বলা হয়। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগন এই শারীরকের বাহিরেরদিকের অঙ্গের বিক্রমে মুহ্যমান হইয়া আছে, আর 'সত্যং পরং' এর ধ্যানকারিগন ব্রহ্মের অন্তরঙ্গে তাঁহাকে বিলাসময় দর্শন করেন।

প্রাচীন বেদান্তাচার্য্যগণ—বিভিন্ন বৈদান্তিক মত ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বে হইতেই প্রচারিত ছিল। ইহার পরিচয় ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। মীমাংসাসূত্র ও ব্রহ্মসূত্র, উভয় স্থানেই চারি চারিবার বাদরির মত আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে জৈমিনির নাম ব্রহ্মসূত্রে এগারবার উল্লিখিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন-প্রমুখ আচার্য্যগণের নাম ব্রহ্মসূত্রে দৃষ্ট হয়। আশ্মরথ্যের নাম জৈমিনি তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনেও উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য আশ্মরথ্যকে ভেদাভেদবাদী (মতান্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী), আচার্য্য ঔড়ুলোমি ও বাদরিকেও ভেদাভেদবাদী. আত্রেয়কে মীমাংসক, কাশকৃৎস্ন ও কার্ষ্ণাজিনিকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলিয়া কেহ কেহ নির্ণয় করিয়াছেন। বাদরায়ন অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ছিলেন। ইহা তাঁহার ব্রহ্মসূত্র এবং তাঁহারই রচিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র হইতে জানা যায়। বাদরায়ণ যেরূপ ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনির নাম উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার মত উদ্ধার করিয়াছেন, জৈমিনিও পূর্ব্বমীমাংসায় সেইরূপ বহুস্থানে—কোনস্থলে পূর্ব্বপক্ষরূপে, কোনস্থলে বা স্বীয় মতপোষক প্রমাণরূপে বাদরায়নের মত উদ্ধার করিয়াছেন। জৈমিনি শ্রীব্যাসের শিষ্য বলিয়া কথিত (ভাঃ ১।৪।২১, ১২।৬।৫৩)। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পিতৃদেব শ্রীপরাশর ও শ্রীগুরুদেব শ্রীনারদ এবং মহর্ষি শ্রীশাণ্ডিল্য অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ছিলেন। শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীপরাশরপাদ যে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ছিলেন, তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৩।১—৩) তাঁহার উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদও ইহা আত্মপ্রকাশ-টীকায় সমর্থন করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তরাজ শ্রীভগবৎপাদ শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই "ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো" (ভাঃ ১।৫।২০) ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার হৃদ্গত ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। আচার্য্যপাদ শ্রীশাণ্ডিল্যের "উভয়পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্" (শাণ্ডিল্যসূত্র ৩১)-সূত্রে অতিস্পষ্টভাবে তিনি যে ভেদাভেদবাদী আচার্য ছিলেন, তাহা জানা যায়। শ্রীস্বপ্নেশ্বর উক্ত সূত্রের ভাষ্যে বহু শ্রুতি মন্ত্র ও শ্রীগীতার প্রমাণ উদ্ধার করিয়া শাণ্ডিল্যমুনির ভেদাভেদসিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন।

শঙ্কর-পূর্ব্ব ভাষ্যকারগণ—সূত্র-যুগের পর ভাষ্যকার-যুগে মহর্ষি বোধায়নই প্রাচীনতম বৈদান্তিক আচার্য্য বলিয়া কথিত হ'ন। বোধায়ন বেদান্তসূত্রের 'বিস্তীর্ণা' বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীভাষ্যে ও বেদার্থসংগ্রহে সেই বৃত্তিরই অনুসরণ ও স্থানে স্থানে উহার অংশ উদ্ধার করিয়াছেন (শ্রীভাঃ ১।১।১।১)। শ্রীবোধায়নাচার্য্য জৈমিনির মীমাংসাসূত্রের 'কৃতকোটি' নামে এক বৃত্তি রচনা করেন। বোধায়নের পর উপবর্ষ মীমাংসাসূত্র ও ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি রচনা করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার সূত্রভাষ্যে উপবর্ষের বৃত্তি উল্লেখ করিয়াছেন (শঃ ভাঃ ১।৩।২৮)। শ্রীযমুনাচার্য্যের সিদ্ধিত্রয়, শ্রীরামানুজের বেদার্থসংগ্রহ ও শ্রীনিবাসের যতীন্দ্র-মতদীপিকা হইতে বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দি. ভারুচি ও শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র-প্রমুখ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তাচার্য্য গণের নাম জানা যায়। শ্রীযামুনাচার্য্য সিদ্ধিত্রয়ে ৫পৃঃ বলিয়াছেন, দ্রমিড়াচার্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহার উপর শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র বিস্তৃতা টীকা রচনা করেন। 'ভর্তৃপ্রপঞ্চভাষ্য'-নামক ভেদাভেদ সিদ্ধান্তমূলক বেদান্তভাষ্য রচনা করেন। সুন্দরপাণ্ড্য এবং আরও কয়েকজন বৈদান্তিক আচার্য গৌড়পাদের (শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরুর) পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার বলেন তাহা অলীক।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র-অবলম্বনে কেবলাদ্বৈতভাষ্য রচনা করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাদিকাল হইতেই ব্রহ্মসূত্রে ভেদাভেদসিদ্ধান্তপর-ভাষ্য প্রচারিত ছিল বলিয়া আধুনিক গবেষকগণও স্বীকার করিয়াছেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে এই ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের মূল পাওয়া যায় (ঋক ১০।৯০।১-৫)। এতদ্ব্যতীত শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, পুরানসমূহ এবং সাত্বতপঞ্চরাত্রসমূহ ন্যূনাধিক অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে ব্যাখ্যাকার শ্রীদ্রমিড়াচার্য্য সরলভাষার ছান্দোগ্যোপনিষদের ভেদাভেদসিদ্ধান্তপর-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মহর্ষি বোধায়নকে ভেদাভেদবাদী মনে করেন।

ব্রহ্মসূত্রের অনিবার্য্য স্বতঃসিদ্ধ-সিদ্ধান্ত—এইরূপে দেখা যায়, কেবল অভেদ বা কেবল ভেদ, কোনটিই ব্রহ্মসূত্রের একান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া সুপ্রাচীনকাল হইতেই গৃহীত হয় নাই। অপরদিকে ইহাও দেখা যায়, ভেদাভেদসিদ্ধান্তটিই ব্রহ্মসূত্রের মধ্যমণির ন্যায় প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং স্বয়ং শ্রীনারদ, শ্রীপরাশর, শ্রীব্যাস, শ্রীশাণ্ডিল্য-প্রমুখ সূত্রকর্ত্তা-মহাজনগণ হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরি, দ্রমিড়াচার্য্য-প্রমুখ অধিকাংশ শঙ্কর-পূর্ব্ব বৈদান্তিক আচার্য্যগণ এবং প্রসিদ্ধ আলবরগণ ভেদাভেদসিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বোধায়ন, টঙ্ক, গুহদেব, কপর্দ্দি, ভারুচি-প্রমুখ শঙ্কর-পূর্ব্ব ভাষ্যকারগণও কেবলাদ্বৈতবাদ বা কেবলদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন নাই। শঙ্করোত্তর আচার্য্যগণও,—শ্রীভাস্করাচার্য্য, শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু, শ্রীবল্লভাচার্য্য-প্রমুখ ভাষ্যকৃৎ আচার্য্যগণও কেহই কেবল অভেদ বা কেবল ভেদবাদ স্বীকার করেন নাই। একমাত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্য কেবল অভেদ-বাদ দ্বারা ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমাধ্বাচার্য্য ভেদাভেদবাদই প্রচার করিয়াছেন ইহা পূর্ব্বে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় আম্নায় বিচারে দেখান হইয়াছে। একদিকে যেমন কেবল অভেদবাদের দ্বারা বা কেবল ভেদবাদের দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের মীমাংসা হইতে পারে না, অপরদিকে ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য (যুগপৎ ভেদ ও অভেদপর বিরুদ্ধ-তাৎপর্য্যময়) শ্রুতি-সমূহের মীমাংসা ও সমন্বয় শ্রুত্যর্থাপত্তি-প্রমাণ বা শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোনভাবেই সাধিত হইতে পারে না। কেবল অভেদ ও কেবল ভেদবাদের যখন প্রতিষ্ঠা নাই তখন উভয়পর সিদ্ধান্ত যে ভেদাভেদ, তাহা স্বীকার করাই অনিবার্য্য হয়। কারণ, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য উপনিষৎসমূহের ভেদ ও অভেদ, উভয় সিদ্ধান্তপর মন্ত্র পাওয়া যায়। আর শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বৌদ্ধমতানুকরণিক মতানুসারে ভেদপর শ্রুতিগুলিকে সগুণ ব্রহ্মপর বা ব্যবহারিক আর অভেদপর শ্রুতিগুলিকে নির্গুণ ব্রহ্মপর বা পারমার্থিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও কতকগুলি শ্রুতিকে কল্পনাবলে ঔপাধিক, মায়িক, তুচ্ছ বা নিকৃষ্ট এবং কতকগুলিকে পারমার্থিক বা উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থাপন করিতে হয়। বস্তুতঃ, সমস্ত শ্রুতিই সমানভাবেই পূজ্য। অতএব যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু অভেদ ও ভেদ—এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ অবস্থিতি এই জড়রাজ্যে জড়ের ধারণায় অসম্ভব। ইহা কল্পনামূলে সাধন করিবার চেষ্টা করিলেও অবাস্তব বা কাল্পনিক বলিয়া গণ্য হয়। এজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রুত্যর্থাপত্তিপ্রমাণ বা শব্দপ্রমাণমূলে ব্রহ্মসূত্রের যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ''শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ,'' এই ব্রহ্মসূত্রে যে শ্রুত্যর্থপত্তিপ্রমাণ বা শব্দপ্রমাণের কথা উক্ত হইয়াছে, শ্রীমহাভারত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শ্রীব্যাসপ্রকটিত শাস্ত্রসমূহ এবং শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-প্রমুখ জগদ্গুরু আচার্য্যগণ যে শ্রুত্যর্থপত্তি-প্রমাণকে 'অচিন্ত্য'-শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ভেদাভেদসিদ্ধান্ত উক্ত অচিন্ত্য-শব্দ অর্থাৎ শ্রুত্যর্থপত্তি-প্রমাণ-দ্বারা ব্যাখ্যাত না হইলে তাহাতে শ্রুতিপ্রমাণে নানাপ্রকার অসঙ্গতি, জড়ীয় ভেদ স্বকপোল-কল্পনা প্রভৃতি দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

গতানুগতিক ধারণায় শঙ্কর-শারীরকই 'বেদান্ত' বলিয়া বিবেচিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য বা মায়াবাদ-ভাষ্যকেই অধিকাংশ ব্যক্তি বেদান্তমত বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ-ভাষ্যে কিছুটা স্বকপোলকল্পনার মৌলিকতা থাকিলেও তাহা শ্রৌত-সিদ্ধান্ত নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার বৌদ্ধমত-প্রবণ পরমগুরু গৌড়পাদের বৌদ্ধমতকে মূল করিয়াই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্রের কোন ভাষ্যেই বিবর্ত্তবাদ প্রপঞ্চিত হয় নাই। উহা বেদ-বিরোধী বৌদ্ধমত। একথা আধুনিক গবেষকগণও স্বীকার করিতেছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত, তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের মত হইতে কিছুটা পৃথক হয়। গৌড়পাদ তাঁহার মাণ্ডুক্যকারিকা-গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বৌদ্ধমতেরই সমর্থন

করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধগণের উচ্ছেদবাদ, অজাতিবাদ, সর্ব্বশূন্যতাবাদ প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য অনেকে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরমগুরুকে বৌদ্ধ বলিবার পক্ষপাতী। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গুরুদেব শ্রীগোবিন্দযোগীর কোন বেদান্ত-গ্রন্থ না পাওয়ায় তাঁহার যে কি মতছিল, তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে তাঁহার 'যোগী' উপাধি হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। যাহা হউক শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার পরমগুরুদেবের স্পষ্ট বৌদ্ধমতকে সংশোধিত করিয়া "যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাংচ যৎ" শঙ্করাচার্য্যের এই উক্তি অনুসারে বৌদ্ধগণের 'শূন্য' স্থানে 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করিয়া ব্রহ্ম-সত্য-জগন্মিথ্যাবাদ' প্রচার করেন। কেবলাদ্বৈতবাদে মায়ার স্বরূপ, অবিদ্যার স্বরূপ, জীবের ও জগতের স্বভাব, ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা প্রভৃতি বহুবিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতি থাকায় তাহা নানাভাবে সমালোচিত হয়। তখন শ্রীশঙ্করের শিষ্য পদ্মপাদ, সুরেশ্বরাচার্য্য (পূর্ব্বনাম মণ্ডনমিশ্র) এবং তৎপরে বাচস্পতিমিশ্র ('ভামতী'—টীকাকার) ও প্রকাশাত্ম-যতি ('পঞ্চপাদিকা বিবরণ'-টীকা-রচয়িতা)-প্রমুখ শঙ্করানুগ মনীষিগণ স্থানে স্থানে শঙ্করাচার্য্যের মত হইতে কিছুটা পৃথক্ হইয়া শঙ্করমতের পরিষ্কৃত সাধন করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে আবার শঙ্করানুগ-গণের মধ্যে বিভিন্ন বিবাদমান মতের সৃষ্টি হয়।

মণ্ডনমিশ্র জীব-সম্বন্ধে প্রতিবিম্ববাদী ছিলেন, বাচস্পতি মিশ্র—অবচ্ছেদবাদী ছিলেন, আর সুরেশ্বরাচার্য্য ছিলেন—আভাসবাদী।

সূর্য্য যেরূপ বিভিন্ন জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও বিভিন্ন অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত হন। এই প্রতিবিম্বই—জীব। যেরূপ বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন, সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব-জীব বস্তুতঃ অভিন্ন। ইহাই প্রতিবিম্ববাদ (পঞ্চপাদিকা বিবরণ)। মণ্ডনমিশ্রের মতে অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। অবিদ্যাই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত দর্পণ। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন; সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন। মিথ্যা ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলেই জীব পারমার্থিক ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রতিভাত হয়। ইঁহার মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় তিনি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। জীবেরই অজ্ঞান, জীবই অবিদ্যার আশ্রয়; জীবের ব্রহ্ম-বিষয়ে অনাদি অজ্ঞান চলিয়া আসিয়াছে। জীবের জীবভাবের মূলই যখন অজ্ঞান, তখন অজ্ঞান ফলিত-জীব আবার অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে কিরূপে? জীব স্বীয়ভাবের জন্য অজ্ঞানের অপেক্ষা করে এবং অজ্ঞান নিজ আশ্রয়ের জন্য জীবের অপেক্ষা করে; জীব-ভাব অজ্ঞানের অধীন আবার অজ্ঞান জীবের অধীন—ইহাতে পরস্পর—আশ্রয়দোষ আসিয়া পড়ে। এই আশঙ্কার উত্তরে মণ্ডনমিশ্র বলেন, অবিদ্যা ও জীব উভয়ই অনাদি ও পরস্পর আশ্রিত। ইহাদের এই সম্বন্ধ বীজ ও অঙ্কুরের সম্বন্ধের ন্যায় অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাদের পরস্পর-আশ্রয়দোষ হয় না।

অপর কেবলাদ্বৈতবাদীর মতে, জীব—ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহে। জীব—অখণ্ডব্রহ্মের সখণ্ড প্রকাশ; যেমন—ঘটাকাশ ও মহাকাশ। অখণ্ড মহাব্যোম যেরূপ ঘটাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ঘটাকাশ নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ অখণ্ড নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তঃকরণের আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া জীব নাম ধারণ করেন। জীব—ঘটাকাশ, আর ব্রহ্ম—মহাকাশ। ইহাই অবচ্ছেদবাদ বা পরিচ্ছেদবাদ (সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ ১।১৮।)

সুরেশ্বরাচার্য্যের মতে অজ্ঞান-কল্পিত জীব কোনমতেই অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই বটে। ইহার মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব কখনও অভিন্ন নহে। কারণ, প্রতিবিম্ব বিম্বের ছায়া বা আভাস। তালগাছের ছায়া তালগাছ হইতে ভিন্ন; সুতরাং ব্রহ্মের ছায়া বা আভাস—জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ছায়া সত্য নহে, উহা মিথ্যা; অতএব প্রতিবিম্বও সত্য নহে, উহা মিথ্যা। সমষ্টি মায়ার আভাস—ঈশ্বর, আর ব্যষ্টি-অবিদ্যার আভাস—জীব। ঈশ্বরের উপাধি-শুদ্ধসত্ত্বগুণ, সুতরাং ঈশ্বর—সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান; জীবের উপাধি মলিনসত্ত্বগুণ, অতএব জীব—অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি। আভাসবাদে—আভাস বা প্রতিবিম্ব মিথ্যা

জীব ও ব্রহ্মের ভেদও মিথ্যা; সুতরাং মিথ্যা ভেদের ন্যায় মিথ্যা প্রতিবিম্বও উচ্ছেদসাধন করা কর্ত্তব্য। প্রতিবিম্ববাদে—ভেদের উচ্ছেদসাধন করিলেই হয়; প্রতিবিম্বের উচ্ছেদসাধনের প্রয়োজন হয় না; কেননা, উক্তমতে প্রতিবিম্ব সত্য এবং বিম্ব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু আভাসবাদে ভেদের ন্যায় প্রতিবিম্বেরও উচ্ছেদ সাধন করা প্রয়োজন হয়। ইহাই প্রতিবিম্ববাদ ও আভাসবাদের মধ্যে পার্থক্য।

শ্রীশঙ্করোত্তর বেদান্তভাষ্যকারগণ—(১) শঙ্করশিষ্য পদ্মপাদ, (২) সুরেশ্বরাচার্য্য, (৩) হস্তামলক, (৪) তোটক, (৫) সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, (৬) অবিমুক্তাত্ম আচার্য্য, (৭) বোধঘনাচার্য্য, (৮) বাচস্পতি মিশ্র, (৯) প্রকাশাত্মযতি, (১০) শ্রীহর্ষাচার্য্য, (১১) অদ্বৈতানন্দ, (১২) বাগীশ্বর, (১৩) আনন্দবোধেন্দ্র, (১৪) আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর, (১৫) জ্ঞানোত্তমাচার্য্য, (১৬) চিৎসুখাচার্য্য, (১৭) বিদ্যাশঙ্কর, (১৮) অমলানন্দ-যতি (ব্যাসাশ্রম), (১৯) ভারতী-তীর্থ, (২০) সায়ণাচার্য্য, (২১) বিদ্যারণ্য (মাধব; দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য নামে কথিত), (২২) আনন্দগিরি; (২৩) প্রকাশানন্দ-সরস্বতী, (২৪) রঙ্গরাজ অধ্বরী, (২৫) ননোদীক্ষিত, (২৬) নৃসিংহাশ্রম, (২৭) নারায়ণাশ্রম, (২৮) অপ্পয়দীক্ষিত, (২৯) সদানন্দযোগীন্দ্র, (৩০) রামতীর্থস্বামী, (৩১) ভট্টোজী দীক্ষিত, (৩২) মধুসূদন-সরস্বতী, (৩৩) বেঙ্কটনাথ, (৩৪) অধ্বরীন্দ্র, (৩৫) রাঘবেন্দ্র-সরস্বতী, (৩৬) ব্রহ্মানন্দ-সরস্বতী, (৩৭) অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ তীর্থ, (৩৮) রামানন্দ সরস্বতী, (৩৯) গোবিন্দানন্দ সরস্বতী, (৪০) কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী, (৪১) ধনপতি-সূরি ইত্যাদি।

মায়াবাদের প্রতিবাদকারী মহাজন ও আচার্য্যগণ—শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদ, শম্ভু, চতুঃসন,
দেবহূতি নন্দন কপিলদেব, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলিমহারাজ, শুকদেব গোস্বামী, যমরাজ প্রমুখ ভাগবতধর্ম্মবেত্তা
মহা ভাগবতগণ তথা পরাশর শাণ্ডিল্যপ্রমুখ আচার্য্যগণ, দিব্যসূরি আলবরগণ, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি- বাদরিপ্রমুখ
প্রাচীন বেদান্তাচার্য্যগণ, শ্রীবোধায়নাদি প্রাচীনতম বেদান্তভাষ্যকারগণ এবং বেদবিভাগ-কর্ত্তা ও ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং
শ্রীব্যাসদেব কাহারও অনুমোদিত নহে বলিয়া, শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র, শ্রীনাথ মুনি, যামুনাচার্য্য প্রমুখ-ভাগবতাচার্য্যগণ, এমনকি
ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্য, শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর, শৈব প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনাচার্য্য অভিনবগুপ্ত,
বাচস্পতিমিশ্র (২য়), বিজ্ঞান-ভিক্ষু, শৈবনীলকণ্ঠ প্রমুখ আচার্য্যগণ সকলেই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের প্রতিবাদ
করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। একমাত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার অনুগত শিষ্যানুশিষ্যগণ ব্যতীত সকল
সম্প্রদায়ের আচার্য্যবৃন্দ এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বাচার্য্যশিরোমণি কলিযুগ পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব
তাঁহার সমসাময়িক দুইজন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী প্রসিদ্ধ শঙ্কর-বৈদান্তিক আচার্য্যের নিকট মায়াবাদ
খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য প্রকৃত দার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রীব্যাসকৃত স্বতঃসিদ্ধভাষ্য হইতে প্রদর্শন
করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য ও তাঁহার অনুগত, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও তাঁহার অনুগত এক শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও তাঁহার
অনুগত-আচার্য্যগণ।

আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ—ষতপ্রকার দার্শনিক মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে,
উহাদের সংক্ষেপে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) আরম্ভবাদ, (২) পরিণামবাদ ও (৩) বিবর্ত্তবাদ।
কার্য্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ-বিষয়ক আলোচনা হইতে ঐ সকল দার্শনিকমতের উদ্ভব হইয়াছে।

(১) আরম্ভবাদ—দ্রব্যসকল দ্রব্যান্তরকে আরম্ভ করে। পরমাণুসমূহ দ্ব্যণুকাদিক্রমে এই জগৎকে আরম্ভ
করে। অবয়ব দ্রব্য হইতে অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, যথা—সূত্র হইতে বস্ত্রেরউৎপত্তি, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য
সম্পূর্ণ অসৎ অর্থাৎ তাহার কোন সত্তাই থাকে না, উৎপন্ন হইয়া কার্য্য সৎ হয় এবং কার্য্য হইতে কারণ সম্পূর্ণ
ভিন্ন—এইরূপ সিদ্ধান্তই আরম্ভবাদ। আরম্ভবাদে ব্রহ্ম—জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন না। ন্যায় ও
বৈশেষিক—আরম্ভবাদী। আরম্ভবাদের অপর নাম অসৎকার্য্যবাদ।

(২) পরিণামবাদ—এইমতে কার্য্য—কারণের রূপান্তর। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য—কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। পরিমাণমবাদ তিন প্রকার—(ক) প্রকৃতি-পরিণামবাদ, (খ) ব্রহ্ম-পরিণামবাদ বা বস্তু-পরিণামবাদ ও (গ) ব্রহ্মশক্তি-পরিণামবাদ বা শক্তি-পরিণামবাদ। পরিণামবাদের অপর নাম—সৎকার্য্যবাদ।

(ক) নিরীশ্বর সাংখ্যমতে এই জগৎ—প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি—পরিণামশীলা, যেমন—লৌহ ও চুম্বক উভয়ই জড়স্বভাবসম্পন্ন, ইচ্ছাদিগুণশূন্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্রই পরস্পর পরস্পরের শরীরে বিক্রিয়া (লৌহদেহে গতি ও চুম্বকদেহে আকর্ষণী শক্তি) উপস্থিত করে, সেইরূপ আত্মা—নিষ্ক্রিয় ও ইচ্ছাশূন্য হইলেও এবং প্রকৃতি—জড় ও স্বতঃপ্রবৃত্তিরহিত হইলেও সন্নিকর্ষ-বিশেষের প্রভাবে প্রকৃতিদেহে পরিণামশক্তির উদয় হয়। সাংখ্যকার—প্রকৃতিপরিণামবাদী। একশ্রেণীর বৈদান্তিক ব্রহ্মপরিণামবাদ বা বস্তুপরিণামবাদ এবং আর একশ্রেণীর বৈদান্তিক শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার করেন।

(খ) ব্রহ্মপরিণামবাদে ব্রহ্মই স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া জগতরূপে পরিণত হ'ন। অর্থাৎ সর্ব্বকারণ-ব্রহ্মই জগৎকার্য্যরূপে অবিকৃত পরিণামপ্রাপ্ত। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় নিত্যসত্য। শ্রীধরস্বামিপাদও, পরমার্থভূত বস্তুর কার্য্য—জগৎ (ভাবার্থদীপিকা ১।১।২), এইরূপ বস্তুপরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কও ব্রহ্মকে কারণ ও জগতকে কার্য্য বলিয়াছেন। শ্রীমধ্বের মতে ব্রহ্ম—জগতের নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন। শ্রীরামানুজ; জগতকে শরীরী-ব্রহ্মের স্থূল শরীর বলিয়াছেন।

(গ) ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলে দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামের (বিকারের) ন্যায় ব্রহ্মে বিকার উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কার সম্পূর্ণ নিরসন এবং চিদ্‌বৈজ্ঞানিক দর্শনের পূর্ণতা শক্তি-পরিণামবাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিনাম বা ব্রহ্মের শক্তিকৃত বিস্তারই হইল এই জগৎ (পরমাত্ম সন্দর্ভ)—ইহাই বেদব্যাস তথা শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত।

(৩) বিবর্ত্তবাদ—বস্তুতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যে অবস্থান্তর-কল্পনা, তাহারই নাম বিবর্ত্ত। যে বস্তুতে সেই কল্পনা হয়, সেই বস্তুই উপাদানকারণ। রজ্জুর অবস্থান্তরপ্রাপ্তি না হইলেও সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রমকল্পিত সর্পের উপাদান-কারণ হইল রজ্জু অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত জগতের উপাদান-কারণ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমতের অনুকরণে কেবল 'শূন্য' স্থানে 'ব্রহ্ম' নাম দিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। কারণে মিথ্যা কার্য্য-প্রতীতিই বিবর্ত্ত। মায়াবাদিগণের মতে ইহার অপরনাম—সৎ-কারণবাদ। বস্তুতঃ 'সৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম কারণ হইলে মিথ্যাকার্য্যের (জগতের) উৎপত্তি হইতে পারে না। এজন্যই বিবর্ত্তবাদকে সৎকারণ বা ব্রহ্মকারণবাদ না বলিয়া মায়াকারণবাদ বা মায়াবাদ বলা হয়। মায়াই ভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত উৎপাদন করে। আধুনিক মায়াবাদিগণ ইহাকে 'ব্রহ্মবাদ' নামে অভিহিত করিতে চাহিলেও বিচারে ইহা প্রচ্ছন্ন শূন্যবাদ (শূন্যরূপ কারণ হইতে শূন্যরূপ জগতের উৎপত্তি) বা মায়াবাদ [মায়ারূপ কারণ হইতে মিথ্যাকার্য্যের (জগতের) উৎপত্তি] বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

ভাস্করাচার্য্যের মতবাদ—ত্রিদণ্ডী ভাস্করাচার্য্য প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ছিলেন। ইনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস ও পঞ্চরাত্রের মত স্বীকার করিলেও শ্রীযামুনাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের ন্যায় বৈষ্ণব-বৈদান্তিক নহেন। ইঁহার রচিত 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যই প্রসিদ্ধ। 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্যসার নামক একটি গ্রন্থও ইহার নামে আরোপিত হয়। ভাস্করমতকে ঔপাধিক বা ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ বলে। [ব্রহ্ম—কারণরূপে অভিন্ন, কার্য্যরূপে 'ভিন্ন'; কার্য্যরূপটি—'ঔপাধিক' (আদি ও অন্তের মধ্যে অল্পকালস্থায়ী অবস্থা); জীব, জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদই—'স্বাভাবিক' ভেদাঔপাধিক (সাময়িক)] ব্রহ্ম—সগুন, নিরাকার সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্; নিরাকাররূপই—ব্রহ্মের

কারণরূপ ; ব্রহ্ম—কার্য্যরূপে 'জীব' ও 'প্রপঞ্চ'। ব্রহ্ম—সল্লক্ষণ ও বোধলক্ষণ, সত্যজ্ঞানানন্ত-লক্ষণ চৈতন্যমাত্র, রূপান্তর-রহিত অদ্বিতীয়।

জীব—ব্রহ্মই জীবরূপে পরিণত ; জীব—সংসার দশায় ব্রহ্মের অংশ, তাঁহার ভোক্তৃশক্তি অণু ; ইহা জীবের ঔপাধিক পরিমাণ ; জীব স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্ম বা বিভু ; জীবের বহুত্ব ও ভোক্তৃত্ব ঔপাধিক ; সংসারী, দেহী জীবই কেবল ভোক্তা, প্রলয়কালীন জীব অথবা মুক্তাত্মা ভোক্তা নহেন।

জগৎ—ব্রহ্ম কার্য্যরূপে জগতে পরিণত হইলেও স্বয়ং অপরিণত ও অপরিবর্ত্তিত থাকেন ; 'সৃষ্টি' অর্থে—ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপমাত্র ; জগৎ—'সৎ', মিথ্যা নহে, কিন্তু ঔপাধিক বা অনিত্য ; জগৎ—জীবেরই ন্যায় কেবল সৃষ্টিকালেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন ; প্রলয়কালে ব্রহ্মের সহিত একত্বপ্রাপ্ত ; ব্রহ্মই—নিমিত্ত ও উপাদানকারণ।

মায়া—মায়া অনির্ব্বচনীয়া হইলে আচার্য্য-কর্ত্তৃক শিষ্যোপদেশ অসম্ভব ; সুতরাং মায়া পরব্রহ্মের বস্তুভূতা 'প্রকৃতি' ; 'মীয়তে পরিচ্ছিদ্যতে অনয়া ইতি প্রজ্ঞা উচ্যতে'—বহ্নির ধূমশক্তিবৎ। (সূত্রভাষ্য)

শঙ্কর মতের সহিত ভাস্করমতের পার্থক্য—(১) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', এই ব্রহ্মসূত্রের 'অথ'-শব্দে—(ক) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, (খ) ইহলোক ও পরলোকের সকলপ্রকার বিষয়ভোগে বিরাগ, (গ) শমদমাদি ছয়প্রকার জ্ঞানলাভের উপায় ও (ঘ) মোক্ষলাভের ইচ্ছা। এই চারিপ্রকার সাধন-সম্পত্তি-লাভের 'অনন্তর' ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার লাভ হয়, বুঝাইতেছে।

(১) শ্রীভাস্করাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথিত চারিপ্রকার সাধনের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার লাভ হয়—ইহা স্বীকার করেন না। ইনি বলেন,—কর্ম্মমীমাংসা (পূর্ব্বমীমাংসা) পাঠের পরেই ব্রহ্মমীমাংসা (বেদান্ত) অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য ; কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ও ফলবিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকিলে বেদান্তশাস্ত্রে অধিকার লাভ হয় না—ইহা ব্রহ্মসূত্রেই (৩।৪।২৬) প্রতিপাদিত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্মের যথাযথ সমুচ্চয়ই মোক্ষলাভের উপায়। অতএব কর্ম্মজিজ্ঞাসার পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

(২) শঙ্করের মতে যাহা ঔপাধিক, তাহাই মিথ্যা ; তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না। শঙ্কর সত্যত্ব ও নিত্যত্বকে সম-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

(২) ভাস্করাচার্য্য বলেন,—সত্যবস্তুও অনিত্য হইতে পারে, অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য সত্য থাকিয়া অন্য সময় অসত্য হইতে পারে। ইঁহার মতে ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতা স্বাভাবিক অর্থাৎ সত্য ও নিত্য ; উহা সৃষ্টি, লয় ও মুক্তি—সকল অবস্থাতেই সত্য। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ—ঔপাধিক অর্থাৎ সত্য অথচ অনিত্য ; সৃষ্টিকালেই কেবল সত্য, প্রলয় ও মোক্ষকালে নহে। উপাধির বিনাশে জীব ও ব্রহ্মের পুনরায় অভেদত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, যেরূপ—ঘট ভগ্ন হইলে ঘটস্থিত আকাশ মহাকাশের সহিত একীভূত হয়।

(৩) শঙ্করাচার্য্য বলেন,—ভেদ-শ্রুতির নিন্দা থাকায় 'অভেদই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

(৩) ভাস্কর বলেন,—'ভেদ' ও 'অভেদ', উভয়ই শ্রুতির তাৎপর্য্য ; তাত্ত্বিক-বিচারে ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হইলেও বাস্তব জগতে প্রত্যেক বস্তু অপরাপর বস্তু হইতে কেবল ভিন্নও নহে, কেবল অভিন্নও নহে ; কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। একই কারণসম্ভূত ও একই জাতিভুক্ত বলিয়া অপর বস্তুর সহিত অভেদ, যেমন—বৃষ ও গাভীর আকার-প্রকারে ভেদ ; কিন্তু জাতিতে অভেদ। যেমন—মাটি ও ঘট কারণরূপে অভেদ, কিন্তু কার্য্যরূপে ভেদ। স্বর্ণকুণ্ডল ও স্বর্ণবলয়—কুণ্ডল ও বলয়রূপ ভেদবিশিষ্ট হইলেও স্বর্ণরূপে অভেদ। অতএব ভেদ ও অভেদ উভয়ই সমভাবে সত্য। ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য হইলেও সমভাবে নিত্য নহে। ভেদ স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিকমাত্র অর্থাৎ যাবৎকাল স্থায়ী, তাবৎকাল সত্য ; অভেদই স্বাভাবিক অর্থাৎ শাশ্বত, চিরস্থায়ী ও চিরসত্য।

ভাস্কর শঙ্করমতকে বৌদ্ধমত বলিয়াছেন। কিন্তু ভাস্কর পরিণামে নির্ব্বিশেষকারণ স্বীকার করায় তাঁহার মত প্রচ্ছন্ন শঙ্করমতই হইয়াছে।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ ও সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ—১। জগন্মিথ্যাত্ববাদ স্থাপন করিতে গিয়া আরও অনেক প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীব্যাসরায় বলিয়াছেন,—জগতের সত্যতা বিষয়ে মানব মাত্রেরই ধ্রুব বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, 'এই সেই বস্তু, যাহা আমি ও আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যাহা আমার ও আমাদের বাস্তব জীবনের শতশত প্রয়োজন সাধন করিয়াছে'—এইরূপ জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে সকলেরই জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায়। অতএব এই প্রপঞ্চ-সৃষ্টিকে মিথ্যা বা দৃষ্টিকালেই উদ্ভূত ভ্রমমাত্র কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তরে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, জীব যাহা দেখিতেছে, তাহা জীব নিজেই নিজের অজ্ঞানতা বশতঃ সাময়িকভাবে সৃষ্টি করে। ইহারই নাম 'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ' অর্থাৎ দৃষ্টিই বা জ্ঞান বিশেষই সৃষ্টি, দৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টি নাই। মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধিতে, প্রকাশানন্দ সরস্বতী বেদান্তসিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীতে, অমলানন্দের বেদান্ত কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের স্বীকার দৃষ্ট হয়। ইহার অপর নাম—'একজীববাদ'। অহং-অভিমানী দ্রষ্টা জীবই একমাত্র প্রাণবান্ ও সক্রিয়, আর পরিদৃশ্যমান সমস্ত জীব ও জগতই স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর ন্যায় নির্জীব ও নিষ্ক্রিয়। একদ্রষ্টা জীব ব্যতীত দ্বিতীয় জীব নাই—এই জন্যই ইহার নাম 'একজীববাদ'। জীবই নিজ অজ্ঞানবশে জগতের—উপাদান ও নিমিত্ত, দেহভেদে জীবভেদের ভ্রান্তি হয়। গুরু, শাস্ত্র, সাধন সবই—স্বকল্পিত। এই মতানুসারে এখনও কাহারও মোক্ষ হয় নাই।

২। চিৎসুখাচার্য্য-প্রমুখ কেবলাদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদের সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শেষোক্ত মতে দৃষ্টির পূর্ব্বেই সৃষ্টি থাকে, সৃষ্ট বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়িলে জ্ঞান হয়। এই মতবাদিগণ বলেন, যদি দৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে বেদোক্ত যাগ, যজ্ঞ, উপাসনা এবং উপাসনা লভ্য জ্ঞেয় বস্তু ব্রহ্ম বা প্রয়োজন মোক্ষ—সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। আর বেদ—মিথ্যা বিষয় প্রতিপাদন করায় তাহাও অপ্রমাণ ও মিথ্যা হইয়া পড়ে। এই সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ স্বীকার করিলে জগতের মিথ্যাত্ব রক্ষা করা যায় না এবং ন্যায়ামৃত কারের প্রবল যুক্তিও এড়াইবার উপায় থাকে না; এজন্য মধুসূদন সরস্বতীকেও দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদই স্বীকার করিয়া বলিতে হইয়াছে যে, এই বিশ্ব প্রপঞ্চের মূলে কোন সত্যতা নাই। বিশ্বের সত্যতা প্রতীতিকালেই মাত্র সাময়িকভাবে সত্যরূপে প্রতিভাত। এইরূপে দ্বৈতবাদিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে পরস্পর বহু বিবদমানমতের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীকণ্ঠের মতবাদ—শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের মতবাদ শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্তেরই অনেকটা অনুকরণ। ইহার নাম বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদ। শ্রীকণ্ঠ শ্রীরামানুজের কথিত পরমতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের স্থানে শিবকে পরতত্ত্ব বলিয়াছেন। শিবই—পরব্রহ্ম। তিনি সমস্ত প্রতিবন্ধক ও কলঙ্করহিত, নিরতিশয় জ্ঞানানন্দাদি-শক্তিবিশিষ্ট। সেই সর্ব্বজ্ঞ ও শক্তিমান্ ব্রহ্মের চিদচিৎ শক্তিবিশিষ্ট তাই স্বাভাবিক। তিনি কখনও নির্ব্বিশেষ নহেন। তিনি যুগপৎ ভীষণ ও মধুর। চিৎ ও অচিৎ—শিবের শক্তিবিশেষ। চিচ্ছক্তি—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এবং অচিৎ শক্তি—পঞ্চ মহাভূতের সমাহার; এই অষ্টরূপী চিৎ ও অচিৎ—ব্রহ্মের শরীর স্থানীয়। অথবা চিৎ ও অচিৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ বা গুণও বলা যাইতে পারে। এইরূপ চিদচিদ্ বিশিষ্ট ব্রহ্ম—কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থাদ্বয়—বিশিষ্ট। কারণাবস্থায় বা প্রলয়কালে চিৎ ও অচিৎ—অনভিব্যক্ত সূক্ষ্ম শক্তিরূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে এবং কার্য্যাবস্থায় নামরূপযুক্ত প্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হয়। শিব—জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তিনি নিরুপাধিক পরমৈশ্বর্য্যবান বলিয়া—ঈশান। তিনি পশু (জীব) ও পাশের (মায়ার) ঈশ্বর বলিয়া 'পশুপতি'। জীবের পাশপটল বিধ্বস্ত

হইলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ঘটে। শ্রীকণ্ঠের মতে জীব—ব্রহ্মের কার্য্য ও কারণের অভিন্নতাবিষয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয়-ভেদরহিত হইলেও স্বগত-ভেদ বিদ্যমান। আত্মা—বিভু অর্থাৎ ব্যাপক, কিন্তু প্রতিশরীরে ভিন্ন। এই মতে শিবের পরমা শক্তিতেই জগতের বীজ নিহিত রহিয়াছে। সেই পরমা শক্তিই চিচ্ছক্তি। সূক্ষ্ম চিদচিদ্-বিশিষ্ট ব্রহ্মই কারণ ও স্থূল চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মই তাঁহার কার্য্য। তত্ত্বমসি-বাক্য উপাসনাপর। বেদ শিববাক্য বলিয়া অভ্রান্ত, শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতির অনুকূল অনুমান প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। ধর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা উভয়েই একযোগে এক শাস্ত্র। শিবত্ব-প্রাপ্তিই মুক্তি। মুক্তিই সাধ্য বা উপাসনার ফল।

শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ ও শ্রীকণ্ঠের মতের পরস্পর পার্থক্য—শ্রীকণ্ঠাচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতমতের ছায়া গ্রহণ করিয়া স্বীয় মত গঠন করিলেও এবং নির্ব্বিশেষভাব অস্বীকার করিয়া শঙ্কর-মতের কতকটা প্রতিযোগী মত প্রচার করিলেও শ্রীরামানুজাচার্য্যের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে শঙ্করমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

শ্রীকণ্ঠ—আত্মাকে বিভু বলেন; কিন্তু রামানুজমতে আত্মা অণু। শ্রীকণ্ঠের মতে মুক্তাত্মা—উপাস্যবস্তুর স্বরূপ অর্থাৎ শিবত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু শ্রীরামানুজমতে মুক্তাত্মাও শ্রীনারায়ণ-সেবক। শ্রীকণ্ঠের মতে মুক্ত জীব ব্রহ্মসম ঐশ্বর্য্য লাভ করে, তখন আর শিবের দাস্য থাকে না। শ্রীরামানুজ সর্ব্বাবস্থায় জীবের নিত্য দাস্য স্বীকার করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সহিত শ্রীকণ্ঠের কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীকণ্ঠ—পরিণামবাদী আর শঙ্কর—বিবর্ত্তবাদী। শ্রীকণ্ঠের মতে জগৎ—সত্য; শঙ্করের মতে জগৎ—মিথ্যা। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্মের সগুণত্ব ও সবিশেষত্ব পারমার্থিক; শঙ্করের মতে সগুণত্ব ও সবিশেষত্ব মায়িক। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম—সক্রিয়, শঙ্করের মতে ব্রহ্ম—নিষ্ক্রিয়।

শ্রীকণ্ঠ—ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ নহে এবং সবিশেষত্বই স্বাভাবিক বলিলেও অহংগ্রহোপাসনা অর্থাৎ উপাসকের উপাস্যবস্তুরূপে পরিণতি স্বীকার এবং নিত্য ভগবদ্দাস্য অস্বীকার করায় এক প্রকার প্রচ্ছন্ন শঙ্কর-মতেরই গ্রাহক হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সবিশেষ উপাসনার দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।—(ভঃ সঃ ২৮৬) (১) সৎ-সবিশেষ ও (২) অসৎ-সবিশেষ। সৎ-সবিশেষ আবার দুইভাগে বিভক্ত—(ক) পরমাত্ম-নিষ্ঠোপাসনা বা ভক্তিবিশেষযোগ (যোগমিশ্রা ভক্তি) এবং (খ) ভগবন্নিষ্ঠোপাসনা বা শুদ্ধা ভক্তি। পরমাত্ম-নিষ্ঠোপাসনা দুই প্রকার—(ক) ব্যষ্টি-অন্তর্য্যামী বা পরমাত্মার (অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর) উপাসনা ও [খ] সমষ্টি-জীবান্ত-র্য্যামীর [গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর] উপাসনা। অসৎ-সবিশেষ তিন প্রকার—[ক] শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্যাকারে ঈশ্বরজ্ঞান (শ্রীকণ্ঠাদির বা বীরশৈবগণের মত), [খ] নিরাকারে ঈশ্বরজ্ঞান (হিরণ্যকশিপুর মত), ও [গ] অহং-গ্রহোপাসনা। এই শেষোক্ত অহংগ্রহোপাসনা আবার দুই প্রকার—[ক] বিষয়বিগ্রহাভিমান (পৌণ্ড্রক-বাসুদেব ইত্যাদি), [খ] আশ্রয়বিগ্রহাভিমান (নিজেকে নন্দ-যশোদাদি মনেকরা-রূপ চরম পাষণ্ডতা)।

শ্রীরামানন্দের মতবাদ (আরোপিত)—শ্রীরামানন্দস্বামী বলেন,—ব্রহ্মমীমাংসাবিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তই সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি-শাস্ত্রে সমন্বিত হয়; কেবলাদ্বৈতমতে সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় হয় না। ব্রহ্ম—শ্রীরামচন্দ্রই ব্রহ্মশব্দবাচ্য; তিনি মহাপুরুষাদি-শব্দের দ্বারা বিদিত, নিখিল দোষ হইতে নিত্য নির্ম্মুক্ত এবং অসমোর্দ্ধ, অশেষ অসংখ্য কল্যাণগুণের আকর শ্রীভগবান্। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, জগতের কারণ এবং একাধারে নির্গুণ ও সগুণ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-সূত্রে সেই শ্রীরামই জগৎকারণ-ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছেন। 'সগুণ' বলিতে তিনি দিব্য বা অতিমর্ত্ত্যগুণশালী, আর 'নির্গুণ' বলিতে তাঁহা হইতে সত্ত্বাদি-প্রাকৃতগুণসমূহ নিত্য নির্গত, ইহাই বুঝায়। 'নিকৃষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের রাহিত্যই তাঁহার নির্গুণতা আর দিব্যগুণশালিতাই তাঁহার

সগুণতা। নির্গুণতা—প্রাকৃতগুণনিষেধক এবং সগুণতা—অপ্রাকৃতগুণব্যঞ্জক। এইরূপে সমগ্র বেদান্তদর্শনে সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। শ্রীরামানন্দস্বামীর মতে শ্রীরামচন্দ্রই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। জীবগণের বহুত্ব ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ বর্ত্তমান। জীবের স্বরূপতঃ অণুত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকৃত। শ্রীরামানন্দস্বামী বিবর্ত্তবাদ অর্থাৎ জগন্মিথ্যাত্ববাদ ও অনির্ব্বাচ্যবাদকে খণ্ডন এবং সংখ্যাতিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কর্ম্মকে ভক্তির অঙ্গ এবং ভক্তি ও প্রপত্তিকে মোক্ষের অব্যবহিত উপায় বলেন। তিনি সদ্যোমুক্তি স্বীকার করেন নাই এবং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীরামানন্দ ভক্তিকে উপায় বা সাধন এবং মোক্ষকে উপেয় বা সাধ্য বলায় তাঁহার মতকে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বলা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে মোক্ষাভিসন্ধিরহিত ভক্তিরই সাধ্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ে শ্রীরামচন্দ্র মুক্তিদাতৃরূপেই পূজিত হ'ন। শ্রীরামানন্দের শিষ্য কবীরের মতে নির্ব্বিশেষোপলব্ধিই চরম লক্ষ্য। এইজন্য আধুনিক রামানন্দিগণ দুইজন কবীরের কল্পনা করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী কবীরকে কবীরপন্থিদলের প্রবর্ত্তক এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মূল-কবীর বা শ্রীরামকবীরকে রামানন্দী বৈষ্ণব বলিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দের মত যে শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত, উপাসনা-প্রণালী ও আচার-বিচার হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছে, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সমধিকরূপে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনাই প্রচলিত। কিন্তু শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ে শ্রীসীতারামের উপাসনাই মুখ্যভাবে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামানন্দি-সম্প্রদায়ে শুদ্ধভক্তির পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষ মত প্রবিষ্ট হইয়াছে। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীরামদাস বিশ্বাসের বৃত্তান্ত আলোচ্য (অন্ত্য ১৩।১০৯।১১০)। এই সম্প্রদায়ে সংস্কৃত অপেক্ষা হিন্দীভাষায়ই অধিকতরভাবে গ্রন্থ প্রচলিত।

শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুর মত—বিজ্ঞানভিক্ষুর মত একপ্রকার ভেদাভেদবাদ। অবিভাগ বা অভেদই আদি ও অন্তে বিদ্যমান, স্বাভাবিক ও নিত্য বলিয়া সত্য, আর বিভাগ বা ভেদ মধ্যবর্ত্তিকালে পরিচ্ছিন্নরূপে বর্ত্তমান বলিয়া নৈমিত্তিক। বেদান্তের ভাষ্যের নাম—বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য।

ব্রহ্ম—চিদচিচ্ছক্তিযুক্ত চিন্মাত্ররূপ, পরমেশ্বর, অন্তর্লীন-প্রকৃতি পুরুষাদি অখিল-শক্তিবিশিষ্ট, বিশুদ্ধ-সত্ত্বাখ্য মায়া-উপাধি-বিশিষ্ট, ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ের দ্বারা অনভিভূত চেতনবিশেষ। ব্রহ্ম—জগৎকর্ত্তা, জগতের অধিষ্ঠানকারণ অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মে জীব ও জগৎ অবিভক্তরূপে বিদ্যমান থাকে এবং সেই আধার হইতেই প্রকৃতিপুরুষরূপ উপাদানকারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়। ব্রহ্ম—অবিকারী চিন্মাত্ররূপে বিদ্যমান থাকিয়াও জগতের অভিন্ন নিমিত্ত উপাদানকারণরূপে উপলব্ধ হ'ন। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট বলিয়াই সেই সেই উপাধিদ্বারা জগতের সর্ব্বপ্রকার কারণত্ব ব্রহ্মে সম্ভব হয়। এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অবিরুদ্ধভাবে বৈশেষিক ও সাংখ্যশাস্ত্রের সম্মত। অন্যোন্যাভাব-লক্ষণ ভেদের দ্বারা জীব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ঈশ্বরই ব্রহ্ম-শব্দের বাচ্য।

জীব—সূর্য্য ও তাহার কিরণের ন্যায় ব্রহ্মের অংশ। জীব ও ঈশ্বরের এই আংশাংশিভাবে বিভাগ ও অবিভাগরূপ ভেদাভেদ—শ্রুতি-সিদ্ধ। তবে এইমাত্র বিশেষ যে—অবিভাগই (অভেদই) আদি ও অন্তে অনুগমন করে এবং স্বাভাবিক ও নিত্য বলিয়া সত্য। আর বিভাগ (ভেদ) মাধ্যমিক অবস্থায় স্বল্পকালমাত্র স্থায়ী বলিয়া নৈমিত্তিক।

জগৎ—নাম ও রূপের সহিত প্রকাশিত, চেতনাচেতনরূপ, অচিন্ত্যরচনাত্মক ও জন্মাদিষড়্বিকারাত্মক। জগৎ—অব্যক্তরূপে নিত্য, ব্যক্তরূপে অনিত্য, কিন্তু সত্য—ব্রহ্মের সাক্ষাৎ-পরিণাম কিংবা বিবর্ত্ত নহে। বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলেন,—বেদান্ত শাস্ত্রে (২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদে) সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রের ন্যায় মহদাদি-ক্রমেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যবাদী সাংখ্য ও যোগিগণ বলেন—পুরুষার্থ-প্রযুক্তা

প্রকৃতি স্বয়ংই চুম্বকের সহিত লৌহের ন্যায় পুরুষের সহিত অর্থাৎ আত্মজীবের সহিত সংযুক্ত হয়; আর আমরা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ ঈশ্বর-কর্তৃক সাধিত হয়, ইহা স্বীকার করি।

শ্রীশঙ্কর ও শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু—১। বিজ্ঞানভিক্ষু শঙ্কর-কথিত সাধন-সম্পত্তিচতুষ্টয় লাভের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারের কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রথমব্রহ্মসূত্রের 'অথ'-শব্দ উচ্চারণমাত্রই মঙ্গলবাচক ও প্রকরণ-নিরূপণবাচক এবং 'অতঃ'-শব্দ ব্রহ্মবিচারের আনুষঙ্গিকরূপেই জীব ও জগতের নিরূপণ-বাচক—ইহা বলিয়াছেন।

২। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথিত প্রাদেশিক বাক্যকে মহাবাক্যরূপে স্বীকার না করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু আদি হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত সমগ্র ব্রহ্মসূত্রকে মহাবাক্য বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসমূহ—নির্ণয়-গ্রন্থ বা সিদ্ধান্তস্বরূপ, কোনটিই শিষ্যের পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ নহে।

৩। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর সশক্তিক হইলেও নির্গুণ, কিন্তু শ্রীশঙ্করের মতে সশক্তিক হইলে ব্রহ্মের আর নির্গুণতা থাকে না—ব্রহ্ম সগুণ ও মায়িক হইয়া পড়েন।

৪। শ্রীশঙ্করের মতবাদের সুতীব্রভাবে নিন্দা করিয়া ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্কর যেরূপ চরমে শঙ্করের আদর্শে বিলীন হইয়াছেন, তদ্রূপ বিজ্ঞানভিক্ষুও শঙ্কর-মতবাদকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া চরমে শঙ্করের আদর্শেরই গ্রাহক হইয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু চিন্মাত্র-স্বরূপ ব্রহ্মকে চরমতত্ত্বরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রীনারায়ণাদি ভগবদবতারগণকে 'লৌকিক ব্রহ্ম' বা 'উপাধিমাত্রপর' রূপে বর্ণন এবং ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ কল্পনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞানভিক্ষু ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্করের মতের ও শ্রীনিম্বার্কাচার্যের মতের কিছু কিছু অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের প্রথমসূত্রেই শঙ্কর মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কেহ কেহ বিজ্ঞান-ভিক্ষুকে সমন্বয়বাদী (Syneretist) বা চয়নবাদী (Eclectic) মনে করেন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাকে অদ্বৈত-বাদী ও বৈষ্ণব মতাবলম্বীও বলেন, আবার কেহ কেহ প্রচ্ছন্নসাংখ্যবাদীও বলিয়া থাকেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে কর্ম্ম-বিশিষ্ট জ্ঞানই মোক্ষের সাধন এবং সমুদ্রের সহিত নদ-নদীমিলনের ন্যায় অনন্যস্বরূপে আত্যন্তিক লয়ই মুক্তি।

শক্তিভাষ্য—কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে ব্রহ্মসূত্রের 'শক্তিভাষ্য-নামক একটি ভাষ্যে একপ্রকার
শাক্তবাদ 'সরূপাদ্বৈতবাদ' নামে প্রচারিত হইয়াছে। উক্ত মতে শক্তিই হইলেন—চিৎ ও অচিৎ (নিত্যসম্মিলিত),
পুরুষও প্রকৃতিস্বরূপ ব্রহ্ম। শক্তিই—ব্রহ্ম, চিন্মাত্র শিব—নিরুপাধিক চৈতন্য বা পুরুষ আর প্রকৃতি হইল—
অচিন্মাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষ—দুই হইলেও উভয়স্থিত কার্য্যজননীসত্তা এক, যেমন তুষ ও তণ্ডুল উভয়
মিশ্রণেই ধান্য। শক্তিরূপ ব্রহ্মের প্রথম পরিণামই বুদ্ধিতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্বস্থিত বীজভূতরূপাদি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত
সাকারব্রহ্মই নারায়ণ ইত্যাদি। অসংখ্য জীবও ব্যষ্টিবুদ্ধিতত্ত্বের প্রতিবিম্বিত হইয়াই উৎপন্ন। এই মত বিবর্ত্তবাদ
বা মায়াবাদকে শ্রুতিবিরোধী মত বলিয়া খণ্ডন করিলেও চরমে প্রচ্ছন্নভাবে নির্ব্বিশেষবাদের প্রভাবেই পতিত
হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে শ্রীমধ্ব-শ্রীনিম্বার্ক-প্রমুখ আচার্যগণ শক্তিকারণবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।
তাহা ছাড়া উক্ত শক্তিভাষ্যে শাক্ত সম্প্রদায়েরও পরম্পরাগত কোন প্রাচীন মতই প্রকৃতভাবে প্রকাশিত হয় নাই।
এজন্য ইহা একটি স্বতন্ত্র ও স্বকপোল কল্পিত অর্ব্বাচীন মত বলিয়া শাক্তদর্শনের গবেষকগণও মন্তব্য করিয়াছেন।

শ্রীরামনারায়ণ মিশ্রের 'সূক্ষ্মতমা' বৃত্তি—শ্রীপাদবলদেব বিদ্যাভূষণের পূর্ব্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনের
শ্রীরাধারমণঘেরার শিষ্যবংশ শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র ব্রহ্মসূত্রের সূক্ষ্মতমা-নাম্নী একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। বৃত্তিটি
সংক্ষিপ্ত হইলেও সম্পূর্ণ, অতিশয় সংক্ষিপ্ত বলিয়া উহার নাম সূক্ষ্মতমা। বৃত্তির প্রারম্ভে কেবলাদ্বৈবাদের
খণ্ডন দৃষ্ট হয়। উক্ত বৃত্তিকার 'ব্রহ্ম-শব্দ' সর্বত্র বিষ্ণুবাচকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে

শ্রীকৃষ্ণ বাচকও করিয়াছেন। বৃত্তিতে জীবের সহিত বিষ্ণুর ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আশঙ্কিত হইয়াছে। এ মতের বিষ্ণুর অংশবৎ-অংশই জীব; মুখ্য অংশ—অসম্ভব—এই কারণে জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও ঔপাধিক ভেদহেতু অংশই জীব, উক্ত বৃত্তিকারের মতে—জীব অণু নহে—বিভু, জ্ঞানস্বরূপ ও বিষ্ণ্বাত্মক, তিনি, অদ্বয় বলিয়াছেন, জীব বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, ভেদ- ঔপাধিক। জগৎ—কারণরূপ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, কার্য্য—বাচারম্ভন মাত্র (নামমাত্র বিকার অসত্য), কারণেরই সত্যত্ব। এইরূপ কতিপয় মতবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে হয়।

সমঞ্জসাবৃত্তি—শ্রীঅনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের 'সমঞ্জসা'-নামক একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। বৃত্তিটি দ্বৈতসিদ্ধান্তপর, কোনও কোনও সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভাষ্যের অনুসরণ দৃষ্ট হয়। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের কোন কথা স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। এই বৃত্তিতে জীব ও পরমেশ্বরের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ, ভক্তির নিত্য অভিধেয়ত্ব ও প্রয়োজনরূপে বৈকুণ্ঠধামে গতি প্রকাশিত হইয়াছে। অনূপনারায়ণ এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের বিদ্বদ্বিনোদিনীসূচিকা, শ্রীকৃষ্ণলীলাপর পঞ্চদশ স্বর্গাত্মক আমোদকাব্য ও শ্রীসীতাশতক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার লেখনীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীতুলসীদাস, শ্রীপ্রয়াগদাস প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। সিদ্ধান্তের দিক্ হইতে ইনি শ্রীচৈতন্যমতাবলম্বী নহেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার দুইএকজন পার্ষদের প্রতি ইহার ব্যক্তিগত সাধারণ শ্রদ্ধা থাকিলেও রামানন্দী সাধুগণের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি শ্রীসীতারাম উপাসনার প্রতিও নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সৎসম্প্রদায় বিচার নামক পঞ্চমপ্রকাশ

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ। শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥"

সাত্বত-সম্প্রদায়—পদ্মপুরাণোক্ত উক্ত বচনে জানা যায়;—সৎসম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসমূহ কখনই সিদ্ধিপ্রদ হয় না। এই হেতু সনাতন-ধর্ম্ম বর্ম্ম-পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছায় কলিকালে চারিটী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মূল আচার্য্যের আবির্ভাব হইবে। 'কলি' শব্দের অর্থ—'বিবাদ' বা 'তর্ক'। কলিকালে তর্ক-পন্থারই বাহুল্য দৃষ্ট হয় এবং শ্রৌতপন্থার নিতান্ত অনাদর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধবাদ, প্রকৃতি-লয়বাদ বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বা প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি-লয়বাদরূপ মায়াবাদ অবৈধরূপে 'শ্রৌতপন্থা' বলিয়া দাবী করিলেও উহা সূক্ষ্মবিচারে 'তর্কপন্থা' ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই তর্ক-পন্থার কবল হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিয়া শ্রৌতপন্থায় প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-চতুঃসন—এই চারিটী সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে ভুবন—পাবন সাত্বত-আচার্য্য-চতুষ্টয় উৎকল দেশে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উদিত হইবেন। শ্রীমন্মধ্বান্বয়ে পরিচিত হইলেও শ্রীগৌরসুন্দর এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের সেবা-প্রণালী অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের শুদ্ধভজন-প্রণালীই তাঁহার আশ্রিত জনে পুরুষোত্তমে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সম্প্রদায়ের পরিচয় ব্যতীত মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অনির্দ্দিষ্ট অভিমানে জীব সর্ব্বদাই চঞ্চলমতি। চঞ্চলমতি ব্যক্তি একা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করিবার পরিবর্ত্তে বহুশাখাবলম্বী অব্যবসায়ী। এইরূপ ব্যক্তি

*শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে যে সকল অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাঁহা পৃথক পুস্তকাগারে প্রকাশিত হইল।

অপস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যাবতীয় মনোধর্ম্মোত্থ মত সমভাবে সমর্থন করিতে গিয়া চিজ্জড়সমন্বয়বাদী ও কার্য্যতঃ মনঃকল্পিত সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িকতার মাহাত্ম্য শুনা গেলেও তাহা সাম্প্রদায়িকতার হেয়াংশের পরিচয় মাত্র। সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক মনে করেন; ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাঁহারা একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ফেলেন। গম্ভীরভাবে বিচার করিলে উদারতার নামে অসাম্প্রদায়িক মত অর্থাৎ যথেচ্ছাচারিতা বা আনুগত্য-রাহিত্যের পক্ষপাতিব্যক্তিগনকে স্থূলবুদ্ধি বলিয়াই স্থির করা যাইতে পারে। সৎসম্প্রদায়-স্বীকার জীবের একটী স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যাঁহারা সৎসম্প্রদায় স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা হয় নিজদিগকে 'পরম মুক্ত' নয় 'পরম বদ্ধ' স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু পরমমুক্তগনও লোকশিক্ষা-কল্পে আপনাদিগকে সৎ-সম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উদারতার নামে সৎসম্প্রদায় স্বীকারে বীতস্পৃহার আদর্শ বালকের শিক্ষকের শাসন বা পিতামাতার প্রদর্শিত পন্থা আপাততঃ দুঃখদায়ক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া আপাতসুখদায়িনী, পরিণামে অমঙ্গল-প্রসূতি স্বতন্ত্রতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার বরণ।

আদি-গুরু লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং চতুঃসন—এই চারিজনের অবলম্বনেই কলিকালে সৎ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকালে চারিজন শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মূল আচার্য্য এই চারিজন মূল প্রবর্ত্তকের সাত্বত মত বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম দেবের আশ্রয়ে সাম্প্রদায়িক আচার্য্য চতুষ্টয়ের চরম মীমাংসা শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিতজনই জগতে প্রচার করিয়াছেন। পুরীধামে এই চারি সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মঠ সমূহ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া কালে কালে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক-বৈভব জনসমাজে বিস্তার ও জীবসমূহকে বিষ্ণু-সেবারূপ নিত্যধর্ম্মে নিযুক্ত করিলেও শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহাদের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সারসিদ্ধান্ত আশ্রিত জনগণে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীরুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে, সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার শ্রীনিম্বার্ক-স্বামীকে, শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীরামানুজ-স্বামীকে এবং ব্রহ্মা শ্রীমধ্বস্বামীকে কলিকালে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। মূলাচার্য্যগণের কালবিচারে সর্ব্বপ্রথমে বিষ্ণুস্বামী, তৎপরে শ্রীনিম্বাদিত্য, তৎপরে শ্রীরামানুজ এবং তৎপরে শ্রীমধ্বের আবির্ভাবকাল পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ-নির্ব্বিশেষবাদিগণের আক্রমণে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত লুপ্তপ্রায় হইলে সঙ্কর্ষণ শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীলক্ষ্মণদেশিক জগতের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে সেই প্রাচীন মত প্রচার করেন। অনাদিকাল হইতে যে সাত্বত পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-মত সজ্জন সমাজে প্রচলিত ছিল, আচার্য্য শ্রীরামানুজ সেই মতই জগতে প্রচার করেন। তৎকৃত বেদান্তভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরম ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদ্বয়-ব্রহ্ম বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত। চিৎ ও অচিৎ তাঁহার বিশেষণ এবং শরীর। স্থূল ও সূক্ষ্ম-ভেদে চিৎ ও অচিৎ দ্বিবিধ। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম চিদচিৎ কার্য্যাবস্থায় স্থূল চিদচিৎরূপে পরিণত হয়। অদ্বয়-জ্ঞান ব্রহ্মই একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া তাঁহাতে কার্য্যের অনুকূল গুণসমূহ বর্ত্তমান। গুণসমূহকে গুণীর বিশেষণই বলিতে হইবে। অতএব চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী কারণরূপী ব্রহ্মের কার্য্যানুকূল গুণ বা বিশেষণ। শরীর, শরীরীর আশ্রিত, ভোগ্য, নিয়ম্য ও পরিচায়ক। চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী অদ্বয়-ব্রহ্মের আশ্রিত, ভোগ্য, নিয়ম্য এবং কার্য্যস্বরূপে কারণরূপী ব্রহ্মের পরিচায়ক; জীবাত্মার স্বরূপে দেব-মনুষ্যাদিগত কোন পার্থক্য নাই; আত্মাই স্বকর্ম্মফলানুসারে ভোগায়তন শরীর লাভ করিয়া আপনাকে তত্তৎপরিচয়ে পরিচিত করান। অতএব দেব-মনুষ্যাদি আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের পরিচায়ক মাত্র। জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি শরীরও একমাত্র আত্মাশ্রিত

আত্মপ্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে আত্মাশ্রিত, ইহা আত্মবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর-বিনাশদর্শনে বোধগম্য হয়। আত্মকৃত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মফলভোগের জন্যই যে শরীরের উদ্ভব ও অবস্থান, তাহাতেই শরীরের আত্মৈক প্রয়োজনত্ব সমর্থিত হয়। 'আত্মাই দেবতা, আত্মাই মনুষ্য ইত্যাদি' প্রয়োগ দর্শনেও জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীরগুলি আত্মারই প্রকার বা বিশেষণ। আত্মা বিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বের উপলব্ধি অভাব হয়। শরীর আত্মার নিয়ম্য ও ভোগ্য। কিন্তু আত্মার পরিচয়ও পূর্ণ নহে, কেননা আত্মা খণ্ড চেতন। খণ্ডচেতন অখণ্ডচেতনের পরিচায়ক। শরীর যেরূপ আত্মার পরিচায়ক, নিয়ম্য ও ভোগ্য, আত্মাও তদ্রূপ অখণ্ডচেতন পরমাত্মার পরিচায়ক, নিয়ম্য ও ভোগ্য। অতএব শরীর শব্দটীর পরমাত্মা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি। শরীর, আত্মা প্রভৃতি যাবতীয় শব্দ সমানাধিকরণ্যে পরব্রহ্মের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্মের সহিত শরীর ও আত্মার সমানাধিকরণ্যে প্রয়োগ সম্পূর্ণ একত্ব নিবন্ধন নহে। সমানাধিকরণ্য স্থলে এক বস্তুরই অভিন্ন দ্যোতক পদের বিন্যাস হইয়া থাকে। যেমন জ্যোতিষ্টোম মন্ত্রে "অরুণবর্ণা, একবর্ষবয়স্কা, পিঙ্গাক্ষী, গাভীর দ্বারা সোম ক্রয় করিতে হয়"—এই বাক্যে 'অরুণবর্ণা', 'একহায়ণী' ও পিঙ্গাক্ষী'—এই বিশেষণ-গুলি সোমক্রয়ের গাভীরই ভিন্ন ভিন্ন পরিচায়ক, তদ্রূপ চিৎ ও অচিৎ এক পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতক বা পরিচায়ক। যেরূপ শরীর ও আত্মা সমানাধিকরন্য, বিশেষন-বিশেষ্য ভাবযুক্ত হইয়াও নিয়ম্য-নিয়ামক, ভোক্তৃ-ভোগ্য বিশেষযুক্ত, তদ্রূপ আত্মার সহিত পরমাত্মারও পূর্ব্বোক্ত বিশেষ ভাব নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তে কেবল ভেদবাদ, কেবল অভেদবাদ ও ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজীয় মত সংক্ষেপ—আচার্য্য শ্রীরামানুজের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যাথাত্ম্য জ্ঞান-পূর্ব্বক (সম্বন্ধজ্ঞান) শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রীতিসহকারে পুরুষোত্তমের চরণযুগল ধ্যানার্চ্চন প্রণামাদিই—অভিধেয় এবং তৎপদ প্রাপ্তিই—প্রয়োজন। যথা শ্রীরামানুজকৃত বেদার্থসংগ্রহে—"জীব পরমাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমধর্ম্মেতি-কর্ত্তব্যতাকপরম-পুরুষচরন-যুগল-ধ্যানার্চ্চনপ্রণামাদিরত্যার্থপ্রিয়স্তৎপ্রাপ্তি ফলঃ ॥"

বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই ত্রিবিধ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। "চিৎ-শব্দে জীবাত্মা, 'অচিৎ'-শব্দে জড় ও 'ঈশ্বর'-শব্দে চিৎ ও অচিতের নিয়ামক পুরুষোত্তম নারায়ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

চিদ্বিষয়ে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্ত—চিৎ বা আত্মা দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-প্রাণ প্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ, স্বপ্রকাশ, আনন্দ-স্বরূপ, নিত্য, অণু, ঘটপটাদিগ্রাহি-চক্ষুর অগ্রাহ্য। ছেদ-ভেদাদির অযোগ্য প্রাকৃত অবসর-রহিত, নির্ব্বিকার, জ্ঞানাশ্রয়, পরমেশ্বরের নিয়ম্য, ভগবৎসঙ্কল্পসাপেক্ষ-সত্তাক 'শেষ' অর্থাৎ ঈশ্বর-ভোগ্য। আত্মা—(১) বদ্ধ অর্থাৎ সংসারী, (২) মুক্ত অর্থাৎ নিবৃত্তসংসার বা বদ্ধমুক্ত এবং (৩) নিত্য অর্থাৎ গরুড়াদি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ আত্মা প্রত্যেকেই অনন্ত। জীবাত্মার স্বরূপে প্রকৃতি-পরিণামবিশেষরূপ দেব-মনুষ্যাদি নানাবিধ ভেদ নাই। জীবাত্মা—চিদানন্দ-স্বরূপ। তাঁহার কর্ম্মকৃতে দেব-মনুষ্যাদি-ভেদ বিধ্বস্ত হইলে তাঁহাতে যে স্বরূপভেদ বর্ত্তমান থাকে, তাহা বাক্যের অগোচর; কিন্তু উহা জীবাত্মার স্বসংবেদ্য। মুক্তাবস্থায় সকল আত্মাই সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট।

জীবের অণুত্ব এবং জীব ও ঈশ্বরের অংশ-অংশিত্ব এই মতে স্বীকৃত হইয়াছে। "প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া যন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই এই অণুআত্মাকে (জীবাত্মাকে) চিত্তদ্বারা জানিতে হইবে।" এস্থানে সাক্ষাদ্ভাবেই জীবসম্বন্ধে 'অণু'শব্দ শ্রুত হইতেছে। 'উন্মান' অর্থে উদ্ধৃত করিয়া পরিমাণ করা; অণুসদৃশ বস্তুর তুলনায় জীবের তদনুরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা বুঝাইয়া থাকে। শ্রুতি যথা,—"কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, সেই শত ভাগের এক ভাগের সমান জীবকে জানিতে হইবে। আত্মা মহান্ হইলেও

আরার (চর্ম্মভেদক সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রবিশেষ) অগ্রভাগের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম বলিয়া অনুভূত। অতএব জীবাত্মা যে অণু, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রকাশ বা প্রভাদির ন্যায় জীব পরমাত্মার অংশ। প্রভা-রূপ প্রকাশধর্ম্ম যেরূপ অগ্নি, আদিত্য প্রভৃতির অংশ, বিশেষণ গো-ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট গো, অশ্ব যেরূপ শুক্ল-কৃষ্ণাদি বস্তুর অংশ কিম্বা দেহ যেমন দেহী অর্থাৎ দেহ-মানবাদির অংশ, ইহাও তদ্রূপ। এক বস্তুর একই দেশে অবস্থানই অংশত্ব। কোনও একটী বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত বস্তুর যে বিশেষণ, তাহাই তাহার অংশ। বিবেচকগণও বিশিষ্ট (বিশেষণযুক্ত) বস্তুতে 'এই অংশটী বিশেষণ আর এই অংশটী বিশেষ্য'—এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। 'বিশেষণ' ও বিশেষ্য' উভয়ের মধ্যে অংশাংশি ভাব থাকিলেও তাহাদের স্বভাব-বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার জীব ও পরমাত্মার এই উভয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব থাকিলেও অংশাংশিভাব ও স্বভাব-বৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইতেছে। এই জন্যই উক্ত হইয়া থাকে, 'জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেই প্রকার নহেন।' প্রভা হইতে প্রভাবান্ বস্তু যেরূপ অন্যথাভূত, সেইরূপ প্রভাস্থানীয় স্বাংশভূত জীব হইতে অংশী পরমাত্মাও অর্থান্তরভূত। এইরূপে জীব ও পরমাত্মা এই উভয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবাকৃত স্বভাব-বৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই সমস্ত ভেদ-নির্দ্দেশ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর যে অভেদ-নির্দ্দেশ, তাহাও পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতির অযোগ্য বিশেষণসমূহের বিশেষ্য পর্য্যন্তত্ব অবলম্বন করিয়াই মুখ্যরূপে উপপন্ন হয়।

অচিদ্ বিষয়ে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্ত—অচিৎ জ্ঞানশূন্য ও বিকারযোগী। (১) শুদ্ধসত্ত্ব, (২) মিশ্রসত্ত্ব ও (৩) সত্ত্বশূন্য ভেদে অচিৎ ত্রিবিধ। (১) রজস্তম অমিশ্র কেবল সত্ত্ব, নিত্য, জ্ঞানানন্দজনক, কর্ম্মব্যতীত কেবলমাত্র ভাগবানের ইচ্ছা-প্রভাবে বৈকুণ্ঠগত বিমান-গোপুর-মণ্ডপ-প্রাসাদাদিরূপে পরিণত, নিরবধিক তেজোরূপ, নিত্যমুক্তগণের দ্বারাও পরিচ্ছেদের অযোগ্য, অত্যদ্ভুত বস্তুই শুদ্ধসত্ত্ব অচিৎ। শুদ্ধসত্ত্ব অচিৎকে কেহ কেহ 'জড়' বলেন, কেহ কেহ 'অজড়'ও বলিয়া থাকেন। 'অজড়' বলিবার কারণ—উহা স্বপ্রকাশ ও সংসারি-লোকের ইন্দ্রিয়ের নিকট অপ্রকাশিত। (২) মিশ্রসত্ত্ব-অচিৎ—সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক, উহা বদ্ধ-চেতন সমূহের জ্ঞানানন্দাদির তিরোধায়ক ও বিপরীত-জ্ঞানজনক। (৩) 'সত্ত্বশূন্য অচিতের অপর নাম 'কাল'; প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তুনিচয়ের পরিণাম-হেতু, কাল-কাষ্ঠাদি-রূপে পরিণত, নিত্য, ঈশ্বরের ক্রীড়াপরিকর ও শরীরভূত। শুদ্ধসত্ত্ব-অচিৎ ও মিশ্রসত্ত্ব-অচিৎ পদার্থদ্বয় ঈশ্বর ও আত্মার (জীবাত্মার) ভোগ্য (বিষয়), ভোগোপকরণ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) ও ভোগস্থান (চতুর্দ্দশ ভুবনাদি) হইয়া থাকে।

ঈশ্বর-বিষয়ে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্ত—চিদচিদাত্মক জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ ও সংসার-নিবর্ত্তনের একমাত্র হেতুভূত, সমস্ত হেয়তা-শূন্য অনন্তকল্যাণাস্পদ বা অশেষ উপাদেয়তাযুক্ত, স্বেতর সমস্ত বস্তু বিলক্ষণস্বরূপ অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ বিশেষণ হইতে স্বরূপ বা বিশেষ্যাংশে যিনি বিলক্ষণ, অসমোর্দ্ধ-অতিশয়ীত-অসংখ্যকল্যাণগুণগ্রামবিশিষ্ট, যিনি সর্ব্বাত্মা, পরব্রহ্ম পরজ্যোতিঃ, পরতত্ত্ব, পরমাত্মা, সদাদি-শব্দভেদদ্বারা নিখিলবৈদান্তৈকপ্রতিপাদ্য, সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ অন্তর্যামি-স্বরূপ। হেয়তা-বিরোধী অনন্ত জ্ঞানানন্দৈকস্বরূপ জ্ঞানশক্ত্যাদি-কল্যাণগুণবিভূষিত, আর্ত্ত-জিজ্ঞাসু-অর্থার্থী-জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ পুরুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল, চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ, বিলক্ষণবিগ্রহযুক্ত, শ্রী-ভূ-লীলানায়ক শ্রীনারায়ণই—ঈশ্বর।

ঈশ্বরের স্বরূপ (১) 'পর', (২) 'ব্যূহ' (৩) 'বিভব' (৪) 'অন্তর্যামী' ও (৫) 'অর্চ্চাবতার' ভেদে পঞ্চ প্রকার। (১) 'পর'তত্ত্ব—'পর'শব্দে পরমেশ্বর নিত্য বর্ত্তমান আদি জ্যোতিঃরূপ পর-বাসুদেব। (২) 'ব্যূহ-তত্ত্ব—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারার্থ, সংসারী-সংরক্ষণার্থ ও উপাসকানুগ্রহার্থ সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধরূপে অবস্থিত। (৩) 'বিভব'তত্ত্ব—রামকৃষ্ণাদি অবতার। (৪) 'অন্তর্যামি'-তত্ত্ব—দুইপ্রকার,—(ক) দাসের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। (খ) 'বাসুদেব আমার প্রাণ-স্বরূপ'—এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচারবান্ পুরুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মীর

সহিত বর্ত্তমান পরমসুন্দর নারায়ণ। (৫) 'আর্চ্চা'-অবতার—দাসগণের সেবোন্মুখআত্মবৃত্তির অভিমত অপ্রাকৃত নাম-রূপ-বিশিষ্ট উপাস্যমূর্ত্তি। স্বেচ্ছায় সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও অশক্তিপ্রায়, পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বাম্য প্রায় বর্ত্তমান।

ঈশ্বর স্বভাবতঃই নির্দ্দোষ। স্থূল-সূক্ষ্মরূপ সমগ্র জগৎ তাঁহার শরীর হইলেও ঈশ্বরের কর্ম্ম-সম্বন্ধ-গন্ধ নাই। কর্ম্মসম্বন্ধ না থাকায় পুরুষার্থ-বিরোধী কোনরূপ ধর্ম্মও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা রাজ-শাসনের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা রাজার অনুগ্রহভাজন এবং যাঁহারা রাজশাসনের উল্লঙ্ঘনকারী, তাঁহারা, রাজার নিগ্রহ-ভাজন হইয়া থাকেন এবং সেই রাজার অনুগ্রহ ও নিগ্রহের ফলে তাঁহারা সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের শাসক রাজা শরীরধারী হইয়াও সেই অনুগ্রহনিগ্রহকৃত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন না। (শ্রীভাষ্য ১।২।১৪)

পরিণাম-বাদ—স্থূল সূক্ষ্ম চিদচিৎ—ব্রহ্মের শরীর (শ্রীভাষ্য ১।১।১ ও ২।১।১৫)। সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়কালে উহা ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শরীররূপে বনলীন বিহঙ্গের ন্যায় নামরূপ বিভাগশূন্য হইয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে অবস্থান করে (শ্রীভাষ্য ১।৪।২৭)। সৃষ্টিকালে ঐগুলি নাম-রূপাদি দ্বারা বিভক্ত হইয়া স্থূলরূপে পরিণত হয়। ঊর্ণনাভি যেরূপ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া স্বশরীর হইতে তন্তু বিস্তারপূর্ব্বক গৃহনির্ম্মাণাদি করে, পরমব্রহ্মও সেইরূপ স্বীয় চিদচিৎ শরীরকে বিকসিত ও সঙ্কুচিত করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের উপাদানত্ব অর্থাৎ জগৎও জীবরূপে পরিণতি দ্বারা তাঁহার স্বভাবের বৈপরীত্য হয় না; ইহা ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্যেরই পরিচয়। (শ্রীভাষ্য ১।৪।২৭)

উপাসনা—"ভক্তিই নিরতিশয়প্রিয় ও একমাত্র প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল বস্তুতে বিতৃষ্ণাজনক জ্ঞানবিশেষ। সেই ভক্তিযুক্ত আত্মাদ্বারাই ভগবান্ বরণীয় এবং ভক্তগণের লভ্য হ'ন। পূর্ব্বকথিত নিরন্তর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগই এইপ্রকার পরমভক্তিরূপ জ্ঞান বিশেষের উৎপাদক। ভগবান পরাশর 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' শ্লোকে ঐরূপ বলিয়াছেন। এই সিদ্ধি-পথ কর্ম্মানুগৃহীত, যথোচিত-ক্রম-পরিগত-ভক্ত্যেকলভ্য এবং ভগবান্ বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দি, ভারুচি প্রভৃতি শিষ্টগণ এই অনিন্দ্য পন্থারই অনুমোদন করেন, পুরাতন বেদ-বেদান্তব্যাখ্যা এবং সুন্দররূপে প্রকাশিত (সুস্পষ্ট) অর্থ-বিশিষ্ট শ্রুতি সমূহের ইহাই নির্দ্দিষ্ট পন্থা।

উপাসনা পঞ্চবিধ,—(১) অভিগমন (দেবতা-স্থান-মার্গাদি সম্মার্জ্জন-লেপনাদি, (২) উপাদান (গন্ধ পুষ্পাদি পূজা-সাধন-সম্পাদন), (৩) ইজ্যা (বিষ্ণুপূজা), (৪) স্বাধ্যায় (অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্রজপ, বৈষ্ণবসূক্ত-স্তোত্রাদি পাঠ. তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাস), (৫) ভগবদনুসন্ধান।

প্রয়োজন—রামানুজ-মতে পরব্যোমাধিপতি লক্ষ্মীনাথ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা ইঁহারা দেখিতে পান না। সাধনাবস্থায় কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগদ্বারা ভগবানের তুষ্টিসাধন করিতে করিতে সাধ্যাবস্থা লাভ হয়। সাধ্যাবস্থায় জীবিতকালে বা জীবিতোত্তরকালে 'লক্ষ্মীনারায়ণই একমাত্র আমার যথা সর্ব্বস্ব'—এইরূপ জ্ঞানের সহিত ঐকান্তিক দাস্যরসাত্মক-ভাবে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা লাভ হয়। তাহাই শ্রীরামানুজ ও তদীয়গণের চরম প্রয়োজন। যতিরাজ শ্রীরামানুজ এই সকল বিষয় 'গদ্যত্রয়' নামক গ্রন্থে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের কতিপয় উপদেশ ('প্রপন্নামৃত' গ্রন্থে)—১। স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করিয়া তাঁহার সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে।

২। ইন্দ্রিয়কিঙ্কর হইয়া দিবানিশি যাপন করিবে না। পরমার্থ-শাস্ত্র-ব্যতীত ইতরশাস্ত্রসকল সামান্য-শাস্ত্র। তাহাতে কখনও নিরত হইয়া থাকিবে না।

৩। ভগবন্নামকীর্ত্তনে তোমাদের যে প্রীতি ছিল, সেই প্রীতি এখন ত্বদীয় ভক্তগণের নাম সংকীর্ত্তনে হউক।

৪। মহাভাগবতাশ্রয় ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ, ইহা জানিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে।

৫। প্রাজ্ঞ পুরুষ বিষয়াসক্তিক্রমে যেরূপ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু-কৈঙ্কর্য্য ও বৈষ্ণব-কৈঙ্কর্য্য পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য মাত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৬। বৈষ্ণবসেবায় উপায় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা উপেয় বুদ্ধি করিবে। বৈষ্ণব-সেবা করিয়া অন্য কোন ফল পাওয়া যায়, এরূপবুদ্ধিকে 'উপায়বুদ্ধি' বলে। অন্য বহু সুকৃতি-ফলে বৈষ্ণবসেবা কৃত হয়, এই বুদ্ধিকেই 'উপেয়বুদ্ধি' বলে।

৭। পুষ্প, চন্দন, তাম্বুল প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্যে কামপ্রবৃত্ত রুচিকার্য্য কখনই করিবে না। অর্থাৎ ভক্তি-প্রবৃত্ত রুচিকার্য্য কেবল ভগবন্নির্ম্মাল্যরূপ তত্তদ্দ্রব্যে করিবে। অন্য দেবতার কীর্ত্তন শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবে না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদিগের নামসংকীর্ত্তনকারী ভক্তপুরুষ দেখিয়া আনন্দলাভ না করাই তাহাদিগের মধ্যে একটী অপচার বা অপরাধ বলিয়া জানিবে।

৮। বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা, আলস্য অপ্রকাশ্য। সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না। বৈষ্ণব যদি 'আমি দাস' বলিয়া পূর্ব্বে প্রণাম করেন, তাঁহাকে অনাদর করিলে মহাপরাধ হয়।

৯। আমাকে (নিজেকে) বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবে না। প্রাকৃত লোকের দৈবাৎ সংস্পর্শ-মাত্র বস্ত্রের সহিত স্নাত হইয়া সহসা বৈষ্ণবচরণামৃত পান করিবে। সর্ব্বপাপহর পবিত্র হরিপ্রসাদে কদাচিদপি উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি করিবে না।

১০। দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে না। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ যদি বৈষ্ণবচিহ্ন সকল ধারণ করে, তথাপি তাহাদের সহিত সহবাস করিবে না।

১১। আপনাদিগকে যদি বৈষ্ণব তিরস্কার করেন, তাহা হইলে অপকার স্মরণ না করিয়া মৌন হইয়া বসিবেন।

১২। বৈষ্ণবদিগের আরাধন, ভগবানের উত্তম পূজা-বিধি, বিষ্ণু-অপমান অপেক্ষা বৈষ্ণব-উল্লঙ্ঘন গুরুতর, বৈষ্ণব-পদজল বিষ্ণুপদজল হইতে গুরুতর, তাহা জানিয়া অতন্দ্রিতরূপে বৈষ্ণবদিগের সমারাধনে যত্নবান হও।

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণ নিয়ত পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত। তাঁহাদের মতে পঞ্চ সংস্কার-বিহীন ব্যক্তি কখনও 'বৈষ্ণব' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শ্রীরামানুজ বলেন যে, পঞ্চ-সংস্কাররহিত ব্যক্তি যদি উচ্চব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিচিত থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে কুক্কুরভোজী চণ্ডালের ন্যায় অদৃশ্য ও অসম্ভাষ্য জ্ঞানে দূরে রাখিতে হইবে, আর পঞ্চ-সংস্কারযুক্ত বৈষ্ণব যদি অন্ত্যজকুলেও আবির্ভূত হ'ন, তিনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন। এ সম্প্রদায়ে তপ্তমুদ্রা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারন, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দাস্যসূচক নাম, নারায়ণ-মন্ত্র এবং শালগ্রামপূজা দীক্ষিত বৈষ্ণব মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ত্রিপুণ্ড্র ধারণ ও বিষ্ণুব্যতীত দেবতান্তরের পূজা শ্রীসম্প্রদায়ে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। ইঁহারা বলেন যে, ব্যাঘ্রের দ্বারা খাদ্যমান হইলেও বিষ্ণুভক্ত কোন দেবতান্তরের-আলয়ে গমন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিবেন না। ইঁহারা স্মার্ত্ত-বিচারকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীবৈষ্ণবকে প্রাকৃতবুদ্ধির ন্যায় ভীষণ অপরাধ অন্য কিছুই নাই। তাঁহারা গুরু বৈষ্ণবে জাতিসামান্য বুদ্ধিকে নিরয়হেতু বলিয়া জানেন। শ্রীবিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ে বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিগন একদণ্ডীর ন্যায় শিখা-সূত্রাদি পরিত্যাগ করেন না। বড়গলে ও তেঙ্গলে-ভেদে শ্রীসম্প্রদায়

দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বরবর মুনির সময় হইতে এই দ্বিবিধ ভেদ লক্ষিত হয়। বরবর মুনি তেঙ্গলই আচার্য্য ছিলেন। বিচার ও তিলক-ধারণাদি আচারভেদ-দ্বারা এই পার্থক্যদ্বয় স্থাপিত হইয়াছে। মর্কট-ন্যায় ও মার্জার-ন্যায় উভয়ের বিচারভেদ।

গুরুপরম্পরা—১ শ্রীবিষ্ণু, ২ পোইহে, ৩ পূদত্ত, ৪ পে-আলোয়ার, ৫ তিরুমড়িশ, ৬ শ্রীশঠারি, ৭ শ্রীমধুর কবি, ৮ শ্রীকুলশেখর, ৯ পেরিয়া আলোয়ার, ১০ শ্রীভক্তপদরেণু, ১১ তুরুপ্পান, ১২ তিরুমঙ্গই, ১৩ শ্রীশ্রীনাথমুনি; ১৪ শ্রীঈশ্বরমুনি, ১৫ শ্রীযামুনমুনি, ১৬ শ্রীমহাপূর্ণ, ১৭ শ্রীরামানুজাচার্য্য। মতান্তরে—১ শ্রীবিষ্ণু, ২ শ্রীলক্ষ্মী, ৩ শ্রীসেনেশ, ৪ শ্রীশঠকোপ, ৫ শ্রীনাথযোগী, ৬ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ, ৭ শ্রীরাম মিশ্র, ৮ শ্রীযামুনাচার্য্য; ৯ শ্রীমহাপূর্ণ, ১০ শ্রীরামানুজাচার্য্য। বার্ত্তিকপ্রকাশ-টীকায় শ্রীরামানুজাচার্য্য হইতে শ্রীরামানন্দ পর্য্যন্ত গুরুপরম্পরা :—
১ শ্রীরামানুজাচার্য্য, ২ গোবিন্দ, ৩ কূরেশ, ৪ পরাশর, ৫ নিগমান্তযোগী, ৬ লোকাচার্য্য, ৭ দেবাধিপাচার্য্য, ৮ শৈলেশ, ৯ বরবর মুনি, ১০ পুরুষোত্তম, ১১ গঙ্গাধর, ১২ সদাচার্য্য, ১৩ রামেশ্বর, ১৪ দ্বারানন্দ, ১৫ দেবানন্দ, ১৬ শ্যামানন্দ, ১৭ শ্রুতানন্দ, ১৮ নিত্যানন্দ, ১৯ পূর্ণানন্দ, ২০ শ্রিয়ানন্দ, ২১ হরিয়ানন্দ, ২২ রাঘবানন্দ, ২৩ রামানন্দ।

শ্রীমধ্বাচার্য্য—যখন প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদরূপ নাস্তিকতা জীবকূলকে জীবের নিত্যধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে পাতিত করিতেছিল। তখন ব্রহ্মাদি-দেবগণ অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে শ্রীহরির শরণাগত হইলেন। স্বয়ং ভগবানের এই সময় অবতরণকাল নহে, পরবর্ত্তিকালে তিনি স্বয়ংই অবতীর্ণ হইবেন, এরূপ বিচার এবং তাঁহার কৃপায় জগৎপ্রাণ বায়ুরই উপস্থিতকার্য্যে সামর্থ্য ও সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি দর্শন করিয়া শ্রীবিষ্ণু মুখ্যবায়ুকে তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপে জগতে অবতীর্ণ করাইলেন। ত্রেতাযুগে যিনি হনুমান, দ্বাপরে তিনিই ভীমসেন আবার কলিতে তিনিই শ্রীমধ্বাচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইলেন। "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি-পাবনাঃ।" এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্মসম্প্রদায় সর্ব্ব-প্রাচীন। ব্রহ্মাদিক্রমে আজ পর্য্যন্ত সেই সম্প্রদায় চলিতেছে। এই ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে শ্রীমধ্বাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধভক্তিপ্রচার তথা অপসিদ্ধান্ত-খণ্ডন করিয়া জগতের মনুষ্যগণকে সুপথে আনয়ন করেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন তাহা 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' নামে খ্যাত। ইহার নামান্তর স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ, স্বাভাবিক-ভেদবাদ, কেবলভেদবাদ, তত্ত্ববাদ।

শ্রীমধ্বাচার্য্য মায়াবাদের (শূন্যবাদের—অতত্ত্ববাদের) বিরুদ্ধে তত্ত্ববাদ প্রচার করায় তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায় নামে খ্যাত। এবং তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার বলিয়া সেই সম্প্রদায়ে পূজিত হ'ন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার রচিত গ্রন্থাবলী—(১) গীতাভাষ্য, (২) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, (২) অনুভাষ্য, (৪) অনু-ভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান, (৫) প্রমাণ লক্ষণ, (৬) কথালক্ষণ, (৭) উপাধি-খণ্ডন, (৮) মায়াবাদ-খণ্ডন, (৯) প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন, (১০) তত্ত্বসংখ্যান, (১১) তত্ত্ববিবেক, (১২) তত্ত্বোদ্যোত, (১৩) কর্ম্ম-নির্ণয়, (১৪) শ্রীমদ্বিষ্ণু-তত্ত্ববিনির্ণয়, (১৫) ঋগ্ভাষ্য (১৬) ঐতরেয়ভাষ্য, (১৭) বৃহদারণ্যকভাষ্য, (১৮) ছান্দোগ্যভাষ্য, (১৯) তৈত্তিরীয়ো-পনিষদ্ভাষ্য (২০) ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য, (২১) কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য, (২২) অথর্ব্বণোপনিষদ্ভাষ্য, (২৩) মাণ্ডু-ক্যোপনিষদ্ভাষ্য, (২৪) ষট্প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য, (২৫) তলবকারোপনিষদ্ভাষ্য, (২৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-তাৎপর্য্য-নির্ণয় (২৭) শ্রীমন্ন্যায়বিবরণ, (২৮) নরসিংহ-নখস্তোত্র, (২৯) যমক-ভারত, (৩০) দ্বাদশ স্তোত্র, (৩১) শ্রীকৃষ্ণা-মৃতমহার্ণব, (৩২) তন্ত্রসার-সংগ্রহ, (৩৩) সদাচার-স্মৃতি, (৩৪) শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য, (৩৫) শ্রীমন্-মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়, (৩৬) যতি-প্রণবকল্প, (৩৭) জয়ন্তী-নির্ণয়, (৩৮) শ্রীকৃষ্ণস্তুতি।

মতবাদ—'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র'-ভেদে দ্বিবিধতত্ত্ব—স্বতন্ত্রতত্ত্ব 'ঈশ্বর' হইতে পরতন্ত্র-তত্ত্বসমূহের নিত্য 'ভেদ'; জীবে ঈশ্বরে, জীবে জীবে, ঈশ্বরে জড়ে, জীবে জড়ে, জড়ে জড়ে,—এই পঞ্চ 'ভেদ' বা 'দ্বৈত' নিত্য, সত্য ও অনাদি।

শ্রীমধ্বমত-সংক্ষেপ—তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ে প্রচারিত নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকটিতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতসংক্ষেপ দৃষ্ট হয়—

শ্রীমধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ততো ভেদো জীবগণাঃ হরেরনুচরানীচোচ্চ ভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজ সুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনমক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে শ্রীবিষ্ণুই পরতত্ত্ব; জগৎ—সত্য; ঈশ্বর, জীব ও জড়ে তত্ত্বতঃ নিত্যভেদ, জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর; জীবগণের মধ্যে পরস্পর অধিকারের তারতম্য বর্ত্তমান; স্বরূপগত আনন্দের অনুভূতিই মুক্তি; অমলা ভক্তিই সেই মুক্তিরূপ প্রয়োজনের সাধন; শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই তিনটি প্রমাণ; শ্রীহরি অখিল-আম্নায়-বেদ্য অর্থাৎ সমস্ত বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রের গম্য।

ব্রহ্ম—বিষ্ণুই 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য (সূঃ ভাঃ ১।১।১); অন্যত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দের প্রয়োগ অসম্পূর্ণ ও উপচার মাত্র (ঐ ১।১।১২।১৭; যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিয়মন, জ্ঞান-অজ্ঞান, বন্ধ ও মোক্ষ হয়, তিনি 'ব্রহ্ম' (ঐ ১।১।৩); আনন্দপ্রচুর বলিয়া তিনি আনন্দময়, তিনি অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র-তত্ত্ব (ঐ ১।১।১৩-১৫); ঈশ্বর ও 'ব্রহ্ম' একই তত্ত্ব (ঐ ১।১।২২)। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র, উপাদান কারণ নহেন। (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৭)

জীব—পরতন্ত্রতত্ত্বমধ্যে 'চেতন'-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন, সত্য, অনন্ত ও অণুপরিমাণ; শ্রীহরির নিত্য অনুচর; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ বদ্ধজীব বিভিন্নাংশ বা প্রতিবিম্বাংশ। **জগৎ**—সৎ, জড় ও অস্বতন্ত্র; জগৎ—'সত্য' ও ব্রহ্ম হইতে স্বতঃ ভিন্ন'; জগৎ—সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানপূর্ব্বিকা সৃষ্টি, সুতরাং 'সত্য,' বিশ্ব—'সত্য', বিষ্ণুর বশবর্ত্তী ও ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্ত্তমান। **মায়া**—'মুখ্যা' মায়া শ্রীহরির 'শক্তি'; আর 'অমুখ্যা' মায়া—প্রকৃতি; মায়া—ত্রিগুণা।

কেবলভেদবাদে পঞ্চভেদ নিত্য; শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য (১) 'জীবেশ্বরে' ভেদ, (২) 'জীবে জীবে' পরস্পর ভেদ, (৩) 'ঈশ্বরে জড়ে' ভেদ, (৪) 'জীবে জড়ে' ভেদ ও (৫) 'জড়ে জড়ে' পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চভেদ স্বীকার করেন। এই 'পঞ্চভেদ' সর্ব্বাবস্থাতেই 'নিত্য'। মুক্তিতেও জীবেশ্বরে নিত্য ভেদ থাকিবে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কোথাও কোথাও 'ভেদাভেদবাদ' ও পরতত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তির প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি। ভেদাভেদৌ তদন্যত্রহ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ॥ কার্য্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনা। ইতি ভাঃ ১১।৭।৫১ ভাগবত-তাৎপর্য্য-ধৃত ব্রহ্মতর্ক-বাক্য।

পরমেশ্বরের শক্তিহেতুই জীবসমূহে ও চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও (তত্তদ্‌বিষয়গত) ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান; যেহেতু অন্যত্র (তত্তদ্‌বিষয়ে) ভেদ ও অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্তকারণ (ব্রহ্ম) ব্যতীত কার্য্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞাতব্য।

দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজস্বামী যুক্তিমল্লিকায় বলিয়াছেন,—তত্ত্ববাদিসিদ্ধান্ত মতে (১) অভিন্নাংশ বা স্বরূপাংশ, (২) বিভিন্নাংশ ও (৩) ভিন্নাভিন্নাংশ, এই তিন প্রকার অংশ কথিত হয়। (১) মৎস্যাদি অবতারগণ অভিন্নাংশ বা স্বরূপাংশ অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন; আর (২) জীব—ব্রহ্মগত সর্ব্বজ্ঞতাদি ধর্ম্মের অভাবহেতু ভিন্নাংশ; (ভিন্নাভিন্নাংশত্ব কেবলমাত্র পটতন্তু প্রভৃতি জড়বস্তুতেই থাকে। দাসকূট ও ব্যাসকূট দুইটী এই সম্প্রদায় মধ্যে দেখা যায়।

শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বমতের মধ্যে পার্থক্য—(১) শ্রীরামানুজ এক অদ্বয়তত্ত্ব স্বীকার করিয়া তাহা চিদচিদ্‌-বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রভেদে দ্বিবিধতত্ত্ব

স্বীকার করেন। স্বতন্ত্রতত্ত্ব-পরমেশ্বর হইতে পরতন্ত্রতত্ত্বসমূহের নিত্য ভেদ। দ্বৈত বা ভেদ—নিত্য; সত্য ও অনাদি।

(২) শ্রীরামানুজ-মতে জীব—বিশেষ্যস্বরূপ পরমাত্মার বিশেষণরূপ অংশ। জীব—শরীরী ব্রহ্মের শরীর; এজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদনির্দ্দেশ। জীব, পরিমাণে—অণু, সংখ্যায়—অসংখ্য ও অনন্ত, প্রকারে—বদ্ধ ও মুক্ত।

শ্রীমধ্বমতে জীব—পরতন্ত্রতত্ত্বমধ্যে চেতনস্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন, বিভিন্নাংশ বা প্রতিবিম্বাংশ, জীব—সত্য, অনন্ত ও অণু-পরিমাণ।

(৩) শ্রীরামানুজ-মতে শরীরী ব্রহ্মের স্থূল শরীর—জগৎ; সুতরাং সত্য; রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ অসত্য নহে।

শ্রীমধ্বমতে জগৎ—ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন। জগৎ—সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানপূর্ব্বিকা সৃষ্টি; সুতরাং সত্য। জগৎ—বিষ্ণুর বশবর্ত্তী এবং ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্ত্তমান।

(৪) শ্রীরামানুজমতে জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর; তখন 'ত্বং'-পদবাচ্য জীব ও 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মের অভিন্নতা। 'ত্বং'-শব্দের অর্থ জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা, এই পরমাত্মা ব্রহ্ম(তৎ) হইতে অভিন্ন। (শ্রীভাষ্য ১।১।১৩)। শ্রীমাধ্বচার্য্য 'তত্ত্বমসি' এই পাঠটিই স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন—স আত্মাতত্ত্বমসি = স আত্মা + অতত্ত্বমসি; অতএব 'ভেদ'। ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্বেতকেতুকে 'অতত্ত্বমসি,' ইহা দৃষ্টান্তের সহিত নয়বার বলিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদোপদেশ করা হইয়াছে। সামসংহিতায়ও 'অতত্ত্বমসি'-পাঠ পাওয়া যায়। সেই প্রমাণ শ্রীমধ্বাচার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। ন্যায়ামৃতে 'স আত্মাতত্ত্বমসি'র বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। ঐ মতাবলম্বী গৌড়পূর্ণানন্দ 'তস্য ত্বমসি' অর্থাৎ তাঁহার তুমি (তুমি পরমাত্মার দাস বা তদীয়) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাদিরাজস্বামী বলেন—উদ্দালক প্রথমে সদৃষ্টান্ত ভেদের প্রস্তাব করিয়া পুনরায় তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কিরূপে ঐক্য বলিতে পারেন? শ্রুতিমধ্যে 'অতত্ত্বমসি' এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে লক্ষণার আবশ্যক হয় না এবং ঐক্যের শঙ্কাও থাকে না। তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে অপারমার্থিক ঐক্য এবং পারমার্থিক ভেদই বলিয়া থাকে। 'তৎ'-পদে ব্রহ্মই বাচ্য এবং 'ত্বং'-পদে তুমিই বাচ্য—এইরূপ ব্যবস্থাই আমাদের অভীষ্ট। 'তত্ত্বমসি'-বাক্যে যদ্যপি ঐক্যোক্তি কথঞ্চিৎ প্রতীত হয়, তথাপি 'অতত্ত্বমসি' এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে উক্ত শ্রুতি ঐক্যার্থে পদক্ষেপই করিতে পারে না। অতএব কেবলাদ্বৈতবাদীর কথিত মহাবাক্যসমূহে মিথ্যাত্ব এবং ঐক্যসিদ্ধি না হইয়া ভেদ-সত্যত্ব এবং জগৎসত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে]

(৫) শ্রীরামানুজের মতে ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে—নাম ও রূপ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম-শরীররূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে; সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম সেই স্বীয় শরীর-স্থানীয় নাম-রূপাদি বিষয়গুলিকে পৃথগ্রূপে পরিণত করেন এবং স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন।

শ্রীমধ্বমতে ব্রহ্ম—নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন। কুম্ভকার ও কুম্ভের উপাদান মৃত্তিকা যেরূপ একই বস্তু হইতে পারে না, সেইরূপ জগতের স্রষ্টা ও জগতের উপাদান একই তত্ত্ব হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম স্রষ্টা বলিয়া নিমিত্তকারণ, আর মায়া বা প্রাকৃতি যাহা সূক্ষ্মরেণুময়ী বা তন্তুবায়ের তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মতমা, তাহাই জগতের উপাদানকারণ। সেই রেণু বা তন্তুবৎ সূক্ষ্মতম উপাদান নৈয়ায়িকগণের পরমাণু হইতেও অসংখ্য গুণে ক্ষুদ্রতম চূর্ণবৎ পদার্থ। সেই উপাদান হইতেই ভগবান্ বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন।

জগন্মিথ্যাত্ববাদী মায়াবাদী যে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলেন, তাহাতে 'মাথা নাই তা'র মাথা ব্যাথা,' এইরূপই এক নীতি স্বীকৃত হইয়া পড়ে। আর তত্ত্ববাদীর পক্ষে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সহিত জগতের অনাদি ও অত্যন্ত ভেদ থাকে না। কিন্তু শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার

করিলে অর্থাৎ চিন্তামণি ও অয়স্কান্তাদি মণির দ্বারা সর্ব্বার্থপ্রসব ও লৌহচালনাদির ন্যায়, সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সমাশ্রয় পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তির দ্বারাই জগৎ কার্য্যরূপে পরিণত হয়; স্বরূপব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্য-শক্তির দ্বারা পরিণাম হইয়া থাকে, তাহাতে স্বরূপের পরিণাম হয় না। মায়াখ্যপরিণামশক্তি দুই প্রকার—১ নিমিত্তাংশ-মায়া ও (২) উপাদানাংশ প্রধান, তন্মধ্যে কেবলা শক্তি—নিমিত্ত ও তদ্ব্যূহময়ী শক্তি উপাদান; —শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদের এই সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণত্বের সুবৈজ্ঞানিক সমন্বয় দৃষ্ট হয়। (পরমাত্ম সন্দর্ভ ৪৮-৫৫)।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী পূর্ব্বে সম্প্রদায়নির্ণয় নামক দ্বিতীয় প্রকাশে দেওয়া হইয়াছে (২৭ পৃঃ)। শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের ধামছত্র:—ধর্ম্মশালা—অবন্তীকাপুরী। ধাম—বদরিকাশ্রম। সুখবিলাস—নৈমিষারণ্য। ক্ষেত্র—অঙ্গপাত। পরিক্রমা—লৌহগড়। দেবী—মঙ্গলা। তীর্থ—অলকানন্দা। ইষ্ট—সাবিত্রী। উপাস্য—ব্রহ্ম। গায়ত্রী—বিষ্ণু। মন্ত্র—বিষ্ণুহংস। দ্বার—মুখ। আচার্য্য—ত্রিকাল। শাখা—অদ্বৈত। গোত্র—অচ্যুত। বর্ণ—শুক্ল। আহার—হরিনাম। ঋষি পরমহংস। ভিক্ষা—নিরাম। দেবতা—নারায়ণ। পার্ষদ—নন্দ। বেদ—অথর্ব্ব। সম্প্রদায়—ব্রহ্ম। মুক্তি—সালোক্য। কুঙ্গামী—উড়ুপী। আখড়া—বলভদ্রী।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী প্রচারিত সিদ্ধান্ত—শ্রীবিষ্ণুস্বামী অদ্বয়জ্ঞান বা অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। পরবর্ত্তিকালে অদ্বয়জ্ঞান-বিরোধী বিরুদ্ধমতবাদ প্রচারিত হইলে সাত্বত আচার্য্যগণ শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তকে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' এবং মায়াবাদিগণের বিরুদ্ধমতবাদকে 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বা 'বিদ্ধাদ্বৈতবাদ' বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত মতে বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য্য জগৎ—ইহারা সাকল্যে 'বস্তু' পদবাচ্য; কেহই বস্তু হইতে পৃথক্ নহে—"বস্তুনোহংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব নঃ ততঃ পৃথগিতি।"

জীববিষয়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত—জীব যে বস্তুর অংশ, তদ্বিষয়ে আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী ব্রহ্মসূত্র হইতে প্রমাণ দিতেছেন—"অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪২) অর্থাৎ বেদ কোথায়ও জীবকে 'ব্রহ্ম' কোথায়ও 'অজ্ঞ', কোথায়ও 'চিদ্রূপ' কোথায়ও 'দাস', কোথায়ও 'অণু' বলিতেছেন; এইরূপ নানাপ্রকার বলায় স্থির হইতেছে যে, জীবই ব্রহ্মের অংশ। তৎপরবর্ত্তী কয়েকটী সূত্র উদ্ধার করিয়া সর্ব্বজ্ঞ-সূত্রকার বলিতেছেন যে, তদধিকরণস্থ পরবর্ত্তী সূত্র সমূহ হইতেও অতি স্পষ্টভাবে ব্রহ্মের অংশই যে জীব, ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সূত্র যথা—"মন্ত্রবর্ণাৎ" (২।৩।৪৩) "অপি স্মর্য্যতে" (২।৩।৪৪), প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" (২।৩।৪৫) ইত্যাদি। "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি" (বৃঃ আঃ ২।১।২০ ও ৪।৩।১), "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৩) প্রভৃতি শ্রুতি মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা ১৫।৭)। যেরূপ অগ্নির অংশ বিস্ফুলিঙ্গসমূহ 'দাহক' বলিয়া 'অগ্নি' নামে উক্ত হয়। তদ্রূপ জীবও 'ব্রহ্ম' নামে উক্ত হয়। যেরূপ অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উভয়কে দাহক বলিয়া উভয়কে 'অগ্নি' বলা গেলেও অগ্নিকুণ্ড হইতেই যেরূপ সর্ব্বতোভাবে শীতাদি-আর্ত্তি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জীব অংশী-অংশসূত্রে সমজাতীয় হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে অর্থাৎ জীব 'পরব্রহ্ম' নহে।

জগৎ বিষয়ে বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত—আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী জগৎকে বস্তুর কার্য্য বলেন। ব্রহ্মময়ায়ী এবং ব্রহ্মরূপ এই জগৎ সত্য। সুবর্ণ যেরূপ, তন্নির্ম্মিত কুণ্ডলাদিও তদ্রূপই হইয়া থাকে। পটরূপ কার্য্যের কারণরূপ তন্তু সূক্ষ্ম, রক্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ হইলে তদনুসারে কার্য্যরূপ পটও সূক্ষ্ম, রক্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ হয়।

অতএব সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম যখন সত্য ও নিত্য, তখন কার্য্যরূপ এই জগৎও সত্য ও নিত্য। যদি বল যে, জগৎকে কিরূপে সত্য ও নিত্য বলা যায়? যখন জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় রহিয়াছে, তখন জগৎকে আমরা সত্য ও নিত্য না বলিয়া বিবর্ত্তমাত্র বলিব। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, বস্তুর তাৎকালিক অদর্শনে তাহার অবিদ্যমানতা সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। যেমন অতিশয় দূরে বিদ্যমান থাকে বলিয়া আকাশে উড্ডীয়মান শ্যেনপক্ষী, কিম্বা গন্ধর্ব্ব-নগর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, অতিশয় সমীপত্ব বশতঃ চক্ষুঃ স্থিত কজ্জল দৃষ্টিগোচর হয় না, অতিশয় সূক্ষ্মত্ব হেতু 'পরমাণু', ব্যবহিত বা অন্তরালে স্থিত বলিয়া 'রাজমহিষী', অভিভূত অর্থাৎ লুক্কায়িত বলিয়া, দিবাভাগে 'তারকাদি' দৃষ্ট হয় না, সমজাতীয় বস্তুর একত্র সঙ্গম-হেতু সরোবরে পতিত বারিবিন্দুর পৃথগ্দর্শন বা তন্নিরূপণ সম্ভবপর হয় না, অতিশয় অস্পষ্টভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়া দধিতে ঘৃতের বিদ্যমানতা দৃষ্টির বিষয় হয় না, লবণসিক্ত জলে লবণের অধিষ্ঠান নয়নেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু দৃষ্টির বিষয় না হইলেও ঐসকল বস্তুর বিদ্যমানতার বিষয়ে কাহারও মনে (অপরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও সিদ্ধ বলিয়া) কখন সন্দেহের কারণ উদিত হয় না। যদি অদর্শনের ছল অবলম্বন করিয়া কোন বস্তুর অবিদ্যমানতা সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ধের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তকারী ব্যক্তি নিজকে 'অবিদ্যমান' বলিয়া প্রমাণিত করুন। অতএব মৃত্তিকারূপ কারণে যেরূপ ঘটাদি কার্য্য বিদ্যমান থাকে বলিয়াই মৃত্তিকা হইতে ঘটাদির উৎপত্তি সম্ভব হয়, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বেই জগদ্রূপ কার্য্য সর্ব্বকারণ ব্রহ্মবস্তুতে বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্ম যখন পরিণাম প্রাপ্ত হন, তখন জগৎ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭।২৬।১ মন্ত্রে যে ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব শক্তিদ্বয়ের বিষয় উক্ত হইয়াছে, স্বতন্ত্রেচ্ছ শক্তিমান্ ভগবান্ যখন সেই আবির্ভাব শক্তির ব্যবহার করেন, তখন পদার্থ দৃষ্ট হয়, আর যখন সেই তিরোভাব শক্তির ব্যবহার করেন, তখন আর পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; যদি বল যে, ব্রহ্ম নিমিত্তকারণই হউন, উপাদান কারণ বলিলে বস্তু বা ব্রহ্মের জগদ্রূপ কার্য্যের পরিণাম দ্বারা তাঁহার বিকার দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়; তদুত্তরে—পরিণাম দ্বিবিধ; (১) বিকৃত পরিণাম বা বিকার, আর (২) অবিকৃত পরিণাম বা কারণের কার্য্যরূপ পরিগ্রহণ। পূর্ব্বস্বরূপের পরিবর্ত্তনের পর পূর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্তি অসম্ভব হইলে উহা 'বিকার' নামে অভিহিত হয়। যেরূপ দুগ্ধের দধিত্ব প্রাপ্তি, দধিরূপ পরিণাম প্রাপ্তি হইলে দুগ্ধের স্বীয় স্বরূপের অন্যথা হয়। কিন্তু পরিণাম প্রাপ্তির প্রাক্কালে, পরিণাম প্রাপ্তির সময়ে ও পরিণাম প্রাপ্তির পরে কোন প্রকার অন্যথা-ভাব-বিবর্জ্জিত যে পরিণাম অর্থাৎ কারণের কার্য্যরূপ পরিগ্রহণ, সেই পরিণাম অবিকৃত পরিণাম। ব্রহ্মের জগদ্রূপ পরিণাম প্রাপ্তি এই প্রকার। ব্রহ্ম স্বীয় বহুভবন সামর্থ্য বা ইচ্ছাশক্তিযোগে জগদ্রূপ অবিকৃত পরিণাম প্রাপ্ত হন। জগদ্রূপ পরিণাম প্রাপ্তির পূর্ব্বে, সময়ে এবং পরে ব্রহ্ম সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই থাকেন। সুবর্ণাদি যাবতীয় তৈজস পদার্থ কটক, কুণ্ডল, হারাদিতে পরিণত হইলেও পুনরায় সুবর্ণাদিরূপ কারণাবস্থা লাভ করিতে পারে। কটক, কুণ্ডল, হারাদি সুবর্ণাদির কেবল অবস্থান্তর মাত্র। এইরূপ অবস্থান্তর বিকার বা ভেদ নহে। উপাদান-কারণ-ব্রহ্মের জগদ্রূপ অবস্থাও এইরূপ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি মাত্র। অতএব জগৎ বস্তুর কার্য্য বলায় বস্তুতে কোন প্রকার বিকারদোষ আরোপিত হইতে পারে না।

ঈশ্বর-বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত—"হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ তথা,—'স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ। স্বাবির্ভূতঃ পরমানন্দঃ স্বাবির্ভূতঃ সুখদুঃখভূঃ ॥" (শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত সর্ব্বজ্ঞ সূক্ত)। হ্লাদিনী এবং সম্বিৎশক্তি (সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি) দ্বারা আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই ঈশ্বর। অবিদ্যা-সংবৃতত্ব ও সংক্লেশসমূহের আকর-স্বরূপতাই বদ্ধজীবের লক্ষণ। অংশী ঈশ্বরের সহিত অংশস্বরূপ শুদ্ধ জীবের যে সেব্য-সেবকভাবে অবস্থানরূপ অদ্বয়জ্ঞানাবস্থা সেই

শুদ্ধজ্ঞান হইতে বিচ্যুতি এবং উপাধিবশতঃ জড়ের ভেদগত-সত্তা-দর্শনে আপনাকে অবিদ্যাদ্বারা আবৃত ও সংক্লেশের আকরস্বরূপ দ্বিতীয় জ্ঞানই বদ্ধজীবাভিমান। ঈশ্বর মায়াধীশ; জীব মায়াবশ; ঈশ্বর স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ, জীবও অংশীর অংশসূত্রে স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ হইয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ অত্যন্ত দুঃখের ভূমিকায় আরূঢ়। বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-মতে ঈশ্বর নিত্যমুক্ত; তিনি কোন উপাধি-বশ্যতা প্রাপ্ত হন না। তিনি অপ্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বকর্ম্মফল-প্রদাতা, সমস্ত কল্যাণগুণনিলয় ও সচ্চিদানন্দ বস্তু। ইহাই শ্রুতির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু বলিয়া শ্রীবিষ্ণুস্বামী আচার্য্যের মত।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রের আনুগত্যে নৃপঞ্চাস্যের উপাসক। তিনি ভগবানের দেহ সচ্চিদানন্দ বলিয়া তাঁহার ভাষ্য মধ্যে বর্ণন করিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামী যে ভগবন্নামাশ্রিত ছিলেন, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ উপাসনা, উপাসক, উপাস্যের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, যথা—তৎকৃত ভাষ্যে—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

আদি বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে শ্রুতির মধ্যে "নৃসিংহতাপনী" এবং পঞ্চরাত্র ও পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত শ্রীবিষ্ণুপুরাণেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আদিবিষ্ণুস্বামীর রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞসূক্তেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তন আচার্য্যগণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য এবং নৃসিংহ-পরিচর্য্যা প্রভৃতি স্মৃতিনিবদ্ধ গ্রন্থ প্রনয়ন করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-প্রথা এবং সন্ন্যাসাশ্রমেও শিখা-সূত্র-সংরক্ষণ ও উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

বর্ত্তমানকালে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় একরূপ লুপ্তপ্রায়। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞসূক্তের প্রচারও অতি বিরল। শ্রীবল্লভাচার্য্য আপনাকে বিষ্ণুস্বামি-মতানুসারী বলিয়া প্রচার করিলেও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর প্রকৃত সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার প্রচারিত মতের স্থানে স্থানে পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

গুরু পরম্পরা—শ্রীনারায়ণ, সঙ্কর্ষণ, পুরারি (শ্রীরুদ্র), নারদ, ব্যাস, আদি বিষ্ণুস্বামী (ত্রিদণ্ডিহংস), তৎপরে ৭০০ আচার্য্য; শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী (২য়, ইনিও আত্ত্রিদণ্ডি), বিল্বমঙ্গল, দেবমঙ্গল, শ্রীপ্রভু বিষ্ণুস্বামী (৩য়), শ্রীগোবিন্দাচার্য্য, বল্লভদীক্ষিত, যজ্ঞনারায়ণ ভট্ট, গদাধর সোমযাজী, গণপতি ভট্ট, বালংভট্ট লক্ষণভট্ট ও বল্লভাচার্য্য।

ধামছত্রাদি—ধর্ম্মশালা—বিষ্ণুকাঞ্চী। ক্ষেত্র—মার্কণ্ড। বিলাস—ইন্দ্রদ্যুম্ন। মুক্তি—সাযুজ্য। উপাস্য—শ্রীকমলা সহ শ্রীজগন্নাথ। মন্ত্র—শ্রীতুলসী। শাখা—ত্রিপুরারি। আচার্য্য—বামদেব। দ্বার—নয়ন। ধাম—পুরুষোত্তম। আহার—শ্রীহরিনাম। পার্ষদ—সুনন্দ। বেদ—যজুঃ। বর্ণ—শুক্ল। গোত্র—অচ্যুত ইত্যাদি। দ্বারত্রয়—শ্রীকর্ম্মচন্দ্রজী, শ্রীকালুনয়নজী ও শ্রীবনখণ্ডীজী।

পঞ্চসংস্কার—উর্দ্ধপুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্য-সূচক নাম, শ্রীতুলসীমালা কণ্ঠে ধারণ, বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ ও ভগবদর্চ্চন। দীক্ষিত

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সদাচারাদি—১। কণ্ঠে তুলসীমালা ও ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য, চতুর্থাশ্রমিগণের পক্ষেও শিখা-সূত্রাদি সংরক্ষণীয়, চতুর্থাশ্রমিগণ কাষায় বস্ত্রধারণ করিবেন; দীক্ষাকালে পঞ্চসংস্কার অবশ্য গ্রহণীয়, ২। চারি আশ্রমীর পক্ষেই কায়মনোবাক্যে জীবহিংসা পরিবর্জ্জনীয়, বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজনই প্রত্যেকের পক্ষে বিধি; ৩। অন্যদেবতা পূজা, অন্যদেবতার নৈবেদ্য-ভক্ষণ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ; ৪। জন্মাষ্টমী, একাদশী, ব্যাসপূজা প্রভৃতি ব্রত যথাবিধি পালনীয়; ৫। বিদ্ধাএকাদশী বা জন্মাষ্টমী সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়; ৬। গৃহস্থ বৈষ্ণবের বিষ্ণু-নৈবেদ্যের দ্বারা বৈষ্ণব-বিধানে শ্রাদ্ধ করণীয়, প্রেতশ্রাদ্ধাদিকরণে মহান প্রত্যবায়।

শ্রীনিম্বাদিত্য-প্রচারিত সিদ্ধান্ত—আচার্য্য নিম্বাদিত্য চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচারর করেন। শ্রীনিম্বাদিত্য শ্রুতিকেই স্বতঃ প্রমাণ শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুত্যনুগত অন্যান্য শাস্ত্র ও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত। চতুঃসন শ্রীনারদ গোস্বামীকে ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌত পারম্পর্য্যে শ্রীনারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য জগতে প্রচার করেন। ছান্দোগ্যের সপ্তম প্রপাঠকে শ্রীনারদ গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্ সনৎকুমারের উপদেশে একায়ন শাখার উল্লেখ (৭।১।২), পুরাণাদির পঞ্চম বেদত্ব (৭।১।৪), বিষ্ণুর সর্ব্বকর্তৃত্ব (৭।১৫।১), শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা রূপ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য (৭।১৯-২০), ভগবৎ-প্রেমার অসমোর্দ্ধত্ব (৭।২৩।১), নিত্য ভগবদ্ধামের মাহাত্ম্য (৭।২৪।২১), ভগবানের অন্যনিরপেক্ষত্ব (৭।২৪।২), পরম মুক্তগনের নিত্য-ভগবৎপরিকরত্ব ও ভগবানের সহিত চিদ্বিলাস ধামে নিত্য-বিলাস (৭।২৫।২), ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব-শক্তিমত্তা (৭।২৬।১), বৈষ্ণবের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব (৭।২৬,২) ভগবৎ-প্রসাদের মাহাত্ম্য (৭।২৬।২) প্রভৃতি সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে প্রচলিত দশশ্লোকী যাহা শ্রীনিম্বার্কের রচিত বলিয়া কথিত হয়, তন্মধ্য হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা যায়.—

সর্ব্বংহি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্নতং ত্রিরূপতাপি-শ্রুতিসূত্র-সাধিতা।

সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। বেদবিদ্গণের সিদ্ধান্ত এই যে, 'ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তু হইতে অসদ্বস্তুর উদয় হইতে পারে না'। বস্তুবিজ্ঞানই নিখিল বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে জানা যায়। কোন স্থানে অদ্বৈত বাক্য, কোন স্থানে দ্বৈত বাক্য, এবং কোন স্থানে উভয়-নিষ্ঠবাক্য প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কেবলাদৈতবাদ স্থান পায় না। শ্রুতি ও সূত্র-বিচারে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয়ই সিদ্ধ হওয়াই দ্বৈতাদ্বৈত্তাদিই শাস্ত্রতাৎপর্য্যরূপে গ্রহণীয়।

জীব—সম্বন্ধে শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্তঃ—"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিত-বাদিত্বমধীয়ত একে" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪২), এই সুত্রের নিম্বার্ক-ভাষ্যে জীব পরমাত্মার ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; ভাষ্য যথা—"অংশাংশি-ভাবাজ্জীব পরমাত্মনো র্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি, পরমাত্মনো জীবোহংশঃ" জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবি'' ত্যাদিভেদব্যপদেশাৎ ; "তত্ত্বমসী" ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ। অপি চ আথর্বনিকঃ "ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মকিতবা''—ইতি ব্রহ্মণে। হি কিতবাদিত্বমধীয়তে।" অর্থাৎ সূত্রকার জীব পরমাত্মার অংশাংশী ভাব বা ভেদাভেদ ভাব প্রদর্শন করিতেছেন,—জীব পরমাত্মার অংশ, কারণ 'জ্ঞ' ও 'অজ্ঞ' – 'ঈশ্বর' ও 'জীব'—উভয়ই অজ এবং নিত্য—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, আবার তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। অথর্ব্ব শাখিগণ দাশ এবং ধূর্ত্তগণকেও 'ব্রহ্ম' বলিয়া উক্তি করেন, অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ বা অংশাংশিভাবসম্বন্ধ। দশশ্লোকী হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা যায়.—জীব—জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ, অহংপদবাচ্যত্বহেতু—জ্ঞানস্বরূপ, আর চৈতন্যধর্ম্মবশতঃ—জ্ঞাতা স্বরূপ। সূর্য্য যেমন স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হইয়াও জগৎ-প্রকাশক-স্বরূপ, হইয়াছেন, তদ্রূপ চৈতন্য ধর্ম বিশিষ্ট জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মযুক্ত। জীব অনু-চৈতন্য পরমেশ্বরের অধীন। জীব সংখ্যায় অনন্ত। প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করেন, অনুত্ব প্রযুক্ত জীব মায়িক শরীরের যোগ-বিয়োগ-যোগ্য। জীব যখন মায়া-কবলিত থাকেন, তখন লিঙ্গ ও স্থূল শরীরে যুক্ত, মুক্ত মুক্তাবস্থায় জীব তাহা হইতে বিয়োগ লাভ করেন। সেই জীব ত্রিবিধ (১) মুক্ত, (২) বদ্ধমুক্ত ও (৩) বদ্ধ। যাঁহারা শ্রীহরির পদাশ্রিত, তাঁহারা 'মুক্ত', যাঁহারা পূর্ব্বে মায়াবদ্ধ থাকিয়া সাধু-গুরু-কৃপায় ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন ও করিবেন, তাঁহারা 'বদ্ধমুক্ত', আর যাঁহারা ভগবদ বহির্ম্মুখতা স্বীকার-পূর্ব্বক মায়াভোগ করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা বদ্ধ। মুক্ত, বদ্ধমুক্তও, বদ্ধজীবগণ আবার অবস্থাভেদে বহুপ্রকার।

(১) মুক্তগণ পার্ষদ ও পার্ষদানুগত ইত্যাদি অবস্থায় বিবিধ। (২) বদ্ধমুক্তগণ পার্ষদ ও সাধক-ভেদে বিবিধ। (৩ বদ্ধগণ বিষয়ী, বিবেকী ও মুমুক্ষুভেদে বিবিধ। মায়া অনাদি, ভগবদ্বহির্ম্মুখতা প্রযুক্তই জীবের মায়াবদ্ধ; সুতরাং একমাত্র ভগবৎপ্রসাদেই জীব অনাদি মায়া হইতে মুক্ত হন—অন্য উপায়ে অসম্ভব।

জড়-সম্বন্ধে শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্ত—জড় বা অচেতন পদার্থ দ্বিবিধ—কাল ও মায়া। তন্মধ্যে কাল অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত ভেদে দুই প্রকার। অপ্রাকৃত কাল মায়া প্রকৃতির অতীত চিৎস্বরূপ। ভগবদিচ্ছাতেই কালের ক্রিয়া। সুতরাং কাল স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ ক্রিয়াহীন, প্রকৃতির অতীত অবস্থায় চিদ্দ্রব্যবিশেষ নিত্য বর্ত্তমান; প্রকৃতির অন্তর্গত অবস্থায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানান্তর্ভূত জড়দ্রব্যবিশেষ। বস্তুতঃ চিৎকালের মায়িক বিকার দর্শনই মায়িক কাল। ছায়া-ধর্ম্মবিশিষ্টা মায়াপ্রকৃতি চিদ্বিকারমাত্র। তাহা প্রধান ও অবিদ্যা-ভেদে এবং নিমিত্ত ও উপাদান-ভেদে নানা পদবাচ্য। বেদে "অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাং" এই মন্ত্রদ্বারা মায়ার ত্রিগুণত্ব ভেদাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াতত্ত্ব চিত্তত্ত্বের সম হইলেও অর্থাৎ ছায়ারূপী বস্তুতে আদর্শের সমতা থাকিলেও তদিতরত্ব-ভেদ দৃষ্ট হয়। সমস্ত জড়জগৎ এবং বদ্ধ-জীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ অচেতন তত্ত্ব।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্ত—ভগবত্তত্ত্ব নির্দ্দোষ; মোহ, তন্দ্রা, ভ্রমাদি অষ্টাদশ দোষ ভগবৎস্বরূপে নাই। অশেষকল্যাণরাশি ভগবৎস্বরূপে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, সেই ভগবত্তত্ত্ব কৃষ্ণস্বরূপে পরম-ব্রহ্ম। তিনি সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মূল; গোলোক-চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ ও অন্যান্য চতুর্ব্যূহগণ তাঁহার অঙ্গ বলিয়া তিনি মূল অঙ্গী; তিনি স্বরূপশক্তি বৃষভানুজার সহিত এবং বৃষভানুজার কায়-ব্যূহস্বরূপ সহস্র সহস্র সখীগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিসেবিত হইয়া জীবের নিত্যারাধ্য। তিনি নিত্য অপ্রাকৃত বিগ্রহবান্; তিনি প্রাকৃত-করাদি রহিত বলিয়া প্রাকৃত চক্ষুর নিকট 'নিরাকার', আবার অপ্রাকৃত করাদিবিশিষ্ট বলিয়া অপ্রাকৃত চক্ষুর নিকট 'সাকার'। তিনি স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অবিচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন এবং ব্রহ্মা-শিবাদি-দেবগণদ্বারা নিত্য বন্দিত।

উপাসনা—অনন্যভাবে একমাত্র ব্রহ্মা-শিবাদিবন্দিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা কর্ত্তব্য; বিষ্ণু ব্যতীত ইতর দেবতা-উপাসনায় নিন্দা ও নরক-পাত শ্রুত হয়। উপাসনা বা ভক্তি দুই প্রকার—(১) সাধনরূপী অপরাভক্তি এবং (২) প্রেমলক্ষণা উত্তমাভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি প্রেয়াজনের দ্বারা প্রেম-লক্ষণা উত্তমাভক্তির উদয় হয়।

"শ্রীনিম্বাদিত্য হইতে নিমায়েৎ সম্প্রদায় প্রচলিত হইয়াছে। কেহ কেহ নিমানন্দি-সম্প্রদায়কে নিমায়েৎ সম্প্রদায়ের নামান্তর মনে করিয়া গোলমাল করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষয় তাহা নহে।"

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়—গুরুপরম্পরা—১। শ্রীহংস, ২। শ্রীচতুঃসন, ৩। শ্রীনারদ, ৪। শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য। চতুঃসন-সম্প্রদায়, হংস-সম্প্রদায় বা প্রচলিত আখ্যায় 'নিমায়েৎ' বা 'নিয়মানন্দী' নামে কথিত হ'ন।

পরবর্ত্তী গুরুপরম্পরা:—৫। শ্রীনিবাসাচার্য্য, ৬। বিশ্বাচার্য্য, ৭। পুরুষোত্তমাচার্য্য, ৮। বিলাসাচার্য্য, ৯। স্বরূপাচার্য্য, ১০। মাধবাচার্য্য, ১১। বলভদ্র, ১২। পদ্মনাভাচার্য্য, ১৩। শ্যামাচার্য্য, ১৪। গোপালাচার্য্য, ১৫। কৃপাচার্য্য, ১৬। দেবাচার্য্য, ১৭। সুন্দর ভট্ট, ১৮। পদ্মনাভ. ১৯। উপেন্দ্র, ২০। রামচন্দ্র, ২১। বামন ভট্ট, ২২। কৃষ্ণভট্ট, ২৩। পদ্মাকর ভট্ট, ২৪। শ্রবণ ভট্ট, ২৫। ভূরি ভট্ট, ২৬। মাধব ভট্ট, ২৭। শ্যাম ভট্ট, ২৮। গোপাল ভট্ট, ২৯। বলভদ্র ভট্ট, ৩০। গোপীনাথ ভট্ট, ৩১। কেশব ভট্ট, ৩২। গাঙ্গল্য ভট্ট, ৩৩। কেশব কাশ্মিরী, ৩৪। শ্রীভট্টজী, ৩৫। শ্রীহরিব্যাস দেবজী, ৩৬। পরশুরাম, ৩৭। হরিবংশ, ৩৮। নারায়ণ, ৩৯। বৃন্দাবন, ৪০। গোবিন্দ

দেবজী, ৪১। গোবিন্দ শরণ, ৪২। সর্ব্বেশ্বর শরণ, ৪৩। নিম্বার্ক শরণ, ৪৪। ব্রজরাজ শরণ, ৪৫। গোপেশ্বর শরণ, ৪৬। ঘনশ্যাম শরণ, ৪৭। বালকৃষ্ণ দেবজী।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচর শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যপাদগণ সর্ব্ববেদান্তসার সর্ব্বসিদ্ধান্ত রত্নাঢ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-রসামৃতসিন্ধুর অতল-গর্ভ হইতে যে 'অতর্ক্য-সহস্রশক্তি' অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব এবং তৎ-শক্তিবৈচিত্রী ও তৎপরিণত বস্তুসমূহের সম্বন্ধজ্ঞাপক সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত-সন্মণি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নামে পরিচিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সর্ব্ববৈদিকসৎফল শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার শ্রীব্যাসের কৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ অপরের পক্ষে মনীষা-দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। এজন্য শ্রীব্যাসদেব নিজকৃত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ নিজেই করিয়াছেন এবং তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত করিয়াছেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। এই শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় দৃষ্ট হয়।

শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীবপাদাদি গোস্বামিবৃন্দ হইতে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত ভাষ্য, টীকা, বিবৃতি, সন্দর্ভ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অনুব্যাখ্যানাদি-রূপেই বিপুল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিস্তার করিয়াছেন। কেহই স্বকপোল-কল্পিত স্বতন্ত্র ভাষ্যাদি রচনা করিবার প্রয়াস করেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবান্ ত্রিধা আবির্ভূত, সর্ব্ববেদান্তসার যে অদ্বিতীয় বস্তু, শ্রীমদ্ভাগবত সেই অদ্বিতীয়বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ অদ্বয়তত্ত্বই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত কেবল দ্বৈত বা ভেদবাদ প্রতিপাদক শাস্ত্র নহে। দ্বিতীয় অর্থাৎ মায়া হইতেই ভয়, অদ্বিতীয় পরতত্ত্বই ভয় বা সংসারনিবর্ত্তক। নির্ব্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদীর অভেদবাদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। শ্রীভগবদ্-বিগ্রহের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলা ও ধামের নিত্যত্ব; ভগবদ্বিগ্রহের স্বরূপভূততা, শ্রীবিগ্রহের পূর্ণস্বরূপভূততা; অতর্ক্যসহস্রশক্তি পরতত্ত্বের স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি-বৈচিত্রীর স্বাভাবিকত্ব ও নিত্যত্ব; ভগবদ্গুণের স্বরূপভূততা ও নিত্যতা; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের স্বয়ংরূপত্ব বা পরাৎপরত্ব, মুক্তপুরুষগণের ভগবদ্ভজনের নিত্যত্ব অর্থাৎ মুক্তির পরেও ভক্তি ও ভক্তের নিত্যত্ব; শ্রীনাম ও নামীর অভিন্নত্ব; মুক্তি অপেক্ষাও বিমুক্তিরূপ প্রেমার উৎকর্ষ প্রভৃতি সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি কেবলাদ্বৈত-বাদের মধ্যে নাই; কিন্তু বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ-সকল সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট সূর্য্যালোকের ন্যায় সম্প্রকাশিত রহিয়াছে।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতিতে আবির্ভূত (ভাঃ ১।২।১১) যে অদ্বিতীয় বস্তু বা সম্বন্ধিতত্ত্ব, শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৩।২২) তন্নিষ্ঠ; অদ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশরূপ যে কেবলভক্তিযোগ বা অদ্বিতীয় অভিধেয় (কারণ, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তির অপেক্ষাযুক্ত), শ্রীমদ্ভাগবত তন্নিষ্ঠ; পরতত্ত্বের সুখ ও তচ্ছক্তি জীবের সুখের ঐক্যতানযুক্ত যে কেবল-প্রেম বা অদ্বিতীয় প্রয়োজন, শ্রীমদ্ভাগবত (১২।১৩।১২) তন্নিষ্ঠ।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অদ্বয়তত্ত্ববাদ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-তত্ত্বের অদ্বিতীয়া স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির বৈচিত্রী স্বীকার করিয়া অতি সুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জীব ও প্রকৃতিকে অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের ন্যায় 'তত্ত্ব' বলিয়া আখ্যা দিলে একাধিক তত্ত্ব-স্বীকারে অদ্বৈতহানি-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহাদিগকে শ্রৌত-সিদ্ধান্তানুযায়ী 'শক্তি' বলিয়া স্বীকার করিলে তত্ত্বের অখণ্ডতা এবং অদ্বয়তত্ত্বের সম্যক স্ফূর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শক্তিত্ব-স্বীকারমূলেই পরতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। পরতত্ত্বকে নিঃশক্তিক বা নির্ব্বিশেষ বলিলে সর্ব্বশক্তিমানের পূর্ণতার হানি হয়। এজন্য শ্রীজীবপাদ সশক্তিক পরতত্ত্বকেই

'পরব্রহ্ম' বলেন।

যিনি স্বয়ং বৃহৎ ও যাঁহাতে অপরকে বৃহৎ করিবার স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি আছে, তিনিই 'ব্রহ্ম'। অদ্বয়তত্ত্বের
সচ্চিদানন্দতা-হেতু শক্তিও অদ্বিতীয়া, সচ্চিদানন্দাত্মিকা। সেই শক্তিরই ত্রিবিধ বৈচিত্র্য—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী।
শক্তির ক্রিয়ায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব। ব্রহ্মের শক্তি-সমূহের দুই-প্রকারের স্থিতি—(১) কেবলমাত্র শক্তিরূপে অমূর্ত্ত
ও (২) শক্তি-অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। শ্রীভগবদ্ধাম ও শ্রীভগবৎ-পরিকরসমূহ স্বরূপশক্তির বৃত্তি। অমূর্ত্ত-শক্তিরূপে
শক্তিসমূহ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সহিত একাত্মতা-প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন; মূর্ত্ত-অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাঁহারা শ্রীভগবৎ-
পরিকরাদিরূপে প্রকট থাকেন। পরতত্ত্বের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী পরতত্ত্বে অবস্থান করেন। পরতত্ত্ব যখন
রসাস্বাদনের নিমিত্ত সেই হ্লাদিনীশক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে তাঁহারই শক্ত্যংশ-স্বরূপ ভক্তগণের হৃদয়ে
সঞ্চার করেন, তগন সেই বৃত্তি কৃষ্ণ-প্রীতিরূপে বৈচিত্রী ধারণ-করিয়া পরমাস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করেন।
(প্রীতিসন্দর্ভ, ৬৫)। ভক্তি ভক্ত-কোটিতে প্রবিষ্ট, ভক্ত ও ভগবানেকে বিগলিত করিবার জন্য ভগবচ্ছক্তিবিশেষ
(ভক্তি সঃ ১৮০)। অতএব, কি সম্বন্ধি-তত্ত্ব, কি অভিধেয়-তত্ত্ব, কি প্রয়োজন-তত্ত্ব—সর্ব্বত্রই অদ্বিতীয়া, সচ্চিদা-
নন্দাত্মিকা স্বরূপ-শক্তির বৈচিত্রী ও বিলাস। শ্রীজীবপাদের মতে সম্বন্ধি-তত্ত্ব—এক অদ্বিতীয়। তিনি উপাসকের
প্রতীতি-ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতিতে আবির্ভূত অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব অর্থাৎ দ্বিতীয়-হীন একমাত্র স্বয়ং-
সিদ্ধ-তত্ত্ব। তিনি 'অদ্বয়' বলিয়া সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য অর্থাৎ পরতত্ত্বের দেহ-দেহী, প্রকাশ, বিলাস,
বৈভবের মধ্যে জড়ীয় ভেদ নাই; কারণ, তাহা স্বরূপ-শক্তির দ্বারা সংঘটিত; প্রকাশ-বিলাসাদির মধ্যে কেবল
শক্তি-প্রকাশের তারতম্যে লীলা-বৈচিত্র্য আছে। সেই অদ্বয়-তত্ত্বের প্রাপ্তির উপায় বা অভিধেয়ও এক অদ্বিতীয়।
তাহাই ভক্তকোটিতে প্রবিষ্ট স্বরূপশক্তির বৃত্তি 'ভক্তি'-নামে খ্যাত। সুতরাং, ভক্তিও ভগবচ্ছক্তি। 'ভক্তি-বিশেষ'ই
পরমাত্মানুশীলন বা 'যোগ' নামে কথিত। ভক্তি হইতে জ্ঞানকে পৃথক্ করিবার চেষ্টা করিলে অর্থাৎ "জ্ঞানং
যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্" (ভাঃ ১।৫।৩৫)—এই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত অবলম্বন না করিয়া জ্ঞানকে স্বতন্ত্র
অভিধেয় বলিয়া বিচার করিলে তাহাতে ক্লেশমাত্র সার হয় (ভাঃ ১।৫।১২, ১০।২।৩২-৩৩, ১০।১৪।৩)। পরতত্ত্ব
শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্রহ্ম-পরমাত্মার আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিও সেইরূপ জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগের আশ্রয় (ভাঃ ১।২।৬-২২,
২৮-২৯; ১।৫।১২, ৩২-৩৬)। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে প্রয়োজন-তত্ত্বও এক অদ্বিতীয়—'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্'
—কেবলপ্রীতি বা বিমুক্তিই প্রয়োজন। তদন্তর্গতই যোগীর কৈবল্য ও জ্ঞানীর মুক্তি। কৈবল্য ও মুক্তির জন্য
স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিলে তাহা 'কৈতব' বলিয়া নিন্দিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত কৈতবরহিত ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ
করিয়াছেন।

গৌড়ীয় দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তানুসারে শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না বলিয়াই শক্তি ও
শক্তিমান্ মিলিয়াই এক অদ্বিতীয় বস্তু বা তত্ত্ব। বস্তু—'বিশেষ্য', আর বস্তুশক্তি—'বিশেষণ'; বিশেষণযুক্ত
বিশেষ্যই বস্তু। প্রশ্ন হইতে পারে,—বিশেষ্য ও বিশেষণ মিলিয়াই যদি বস্তু হয়, বিশেষণকে বিশেষ্য হইতে,
শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে যদি পৃথক্ই না করা যায়, তাহা হইলে পৃথগ্‌ভাবে শক্তি স্বীকার করারই বা আবশ্যকতা
কি? এখানে শ্রীজীবপাদ বলেন,—বস্তু থাকাসত্ত্বেও মন্ত্র-মহৌষধাদির প্রভাবে শক্তিকে মাত্র স্তম্ভিত দেখা যায়;
হস্ত দগ্ধ না হইলেও অগ্নি দৃষ্ট হয়। সুতরাং অগ্নিও উহার দাহিকাশক্তিকে পৃথক্ নামে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত,
যদিও তথায় বস্তু বা তত্ত্ব দুইটি নহে। স্বাভাবিকী শক্তির বিচিত্রতার দ্বারা শক্তিমানের অদ্বয়ত্বের ব্যাঘাত হয় না।
এজন্য স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার 'ভেদ'; আবার ভিন্নরূপে চিন্তা করা
যায় না বলিয়া 'অভেদ'। অতএব, শক্তি ও শক্তিমানের 'ভেদাভেদ' স্বীকৃত এবং তাহা 'অচিন্ত্য' অর্থাৎ তর্কযুক্তির
অগম্য হইলেও শাস্ত্রগম্য বা শব্দমূলক। সর্ব্ববাদের মীমাংসা বা 'সর্ব্ব' (পরব্রহ্ম)-বিষয়ক সিদ্ধান্ত-গ্রন্থরূপ

'শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী'তে শ্রীজীবপাদ উক্ত 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্তের সবিস্তার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অচিন্ত্য—গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দার্শনিকগণের অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বা তচ্ছক্তির অলৌকিকত্ব-নিরূপণে 'অচিন্ত্য' এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়ার তত্ত্ব-নিরূপণে 'অনির্ব্বাচনীয়' শব্দের প্রয়োগ এক নহে। শ্রুতিতে সুস্পষ্ট-ভাষায় পরব্রহ্মের শক্তি মায়ার তত্ত্ব-নিরূপণ থাকা-সত্ত্বেও শ্রীশঙ্করাচার্য্য মায়াকে 'অনির্ব্বাচনীয়া' বলিয়াছেন; কারণ, মায়াকে স্পষ্টভাষায় যদি তিনি পরব্রহ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি হয় না; অথচ মায়াকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেও কার্য্য চলে না। এজন্য মায়ার স্বরূপ নির্ণয়ে তাহাকে 'অনির্ব্বাচনীয়' শব্দের আশ্রয় গ্রহন করিতে হইয়াছে। 'অনির্ব্বাচনীয় শব্দটী সন্দেহবাদীর পরিভাষা, ইহাতে বাস্তবতার সম্বন্ধ নাই, সন্দেহেরও অবাস্তবতার অবকাশ আছে। আর 'অচিন্ত্য' শব্দ চিদ-বাস্তব-সিদ্ধান্তকারিগণের পরিভাষা, ইহা পরিপূর্ণ বাস্তবতারই সূচক; কিন্তু সেই বাস্তবতা প্রাকৃত না হওয়ায় প্রাকৃত অভিজ্ঞানে 'অচিন্ত্য'। অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। শব্দপ্রমাণগম্য তত্ত্বের নির্দ্দেশক 'অচিন্ত্য' বিশেষণটি শ্রুতি, মহাভারত, গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে বহুল প্রচারিত। 'অচিন্ত্য'-শব্দের-তাৎপর্য্য—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ (২।১।২৭) এই ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা সমর্থিত। ইহা আচার্য্য শ্রীশঙ্করও উক্ত সূত্রের নিজকৃতভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে 'অচিন্ত্য' শব্দের অর্থ—'শব্দ-মূলক শ্রুতার্থাপত্তিজ্ঞান-গোচর।' (শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১।৩।১-২ আত্মপ্রকাশটীকা ও ভং সঃ ১৬ অনু)।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ স্বীয় সিদ্ধান্ত-সম্মত 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে'র প্রতিষ্ঠা অদ্বয়তত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্ব হেতুই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের (২।১।১১) প্রমাণানুসারে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু ভেদবাদে,ও অভেদবাদে অসংখ্য দোষ আছে। শক্তি ও শক্তিমানে কেবল-ভেদ ও কেবল-অভেদ উভয় সাধনই দুষ্কর বলিয়া এবং যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সাধনের সঙ্গতিও একমাত্র পরতত্ত্বের অবিচিন্ত্য-শক্তিমত্তা ও শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণ (অবরোহবাদ) ব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত 'অচিন্ত্য অর্থাৎ শব্দগম্য ভেদাভেদ' শ্রীজীবগোস্বামিপাদ অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে তথা ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির মতে যে ভেদাভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা তর্কমূলক; সুতরাং খণ্ডনযোগ্য ও পরস্পর সঙ্গতিহীন। আবার মায়াবাদিগণের যে কেবল-অভেদবাদ, তাহাতেও ভেদাংশ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র, তথায় মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করায় (অবশ্য সদসদনির্ব্বাচনীয়ত্বের অন্তরালে) মতবাদ আর 'অদ্বৈত' থাকে নাই। ব্রহ্মের 'উভয় লিঙ্গ' অর্থাৎ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্তা-স্বীকারেও অদ্বৈত-ব্রহ্ম দ্বিভাব-গ্রস্ত হইয়া গিয়াছেন এবং উহা শব্দপ্রমাণের দ্বারাও সমর্থিত নহে, উহা তর্কপর স্বকপোল-কল্পনা মাত্র। অন্যদিকে গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে; তাহাও বেদান্তসম্মত সিদ্ধান্ত নহে এবং তাহা তর্কপর। শ্রীরামানুজ শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ স্বীকার করেন; শ্রীমধ্ব তত্ত্বমধ্যে অত্যন্তভেদ স্বীকার করেন। অতএব উভয়েরই মতবাদ 'ভেদবাদ' বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কিন্তু, গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তে পরতত্ত্বের অচিন্ত্য-শক্তিত্ব এবং শক্ত ও শক্তিমানে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণগম্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। পরতত্ত্বের স্বরূপ হইতে তাঁহার স্বাভাবিক, শক্তিকে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না; আবার স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না; সুতরাং, ভেদ ও অভেদ উভয় প্রতীতিই চিন্তাগম্য নহে; উহা কেবল শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণগম্য। অতএব, শক্তি ও শক্তিমানে যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্ত, তাহা অচিন্ত্য অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ গম্য।

উপনিষদে, ব্রহ্মসূত্রে ও তাহার অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি শব্দ-প্রমাণের মধ্যে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-রূপ-সর্ব্বতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত গ্রথিত আছে। তাহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের প্রচারিত ও গৌড়ীয় গোস্বামিগণের প্রপঞ্চিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত। শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট

শাঙ্কর-ভাষ্য-শ্রবণ-লীলাকলে, শ্রীকাশীধামে কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর মতবাদ-খণ্ডন-কালে, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে লক্ষ্য করিয়া লোকশিক্ষা-দান-কল্পে ও শ্রীরায়রামানন্দ সংবাদে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ও বৈষ্ণবতোষণীতে, শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে এবং শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বিস্তৃতভাবে সন্দর্ভে ও সর্ব্বসম্বাদিনীতে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ' প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরণানুচর-মাত্রেই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ, শ্রীল কবিরাজগোস্বামী, শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীবলবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী।

শ্রীধরস্বামিপাদ মায়াবাদী ছিলেন না, তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন বা অদ্বয়জ্ঞানবাদী ছিলেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরস্বামিপাদকে 'স্বামী' বা 'জগদ্গুরু', "শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে 'ভাগবত' জানি" (চৈঃ চঃ অঃ ৭।১২৯) প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীধরস্বামিপাদের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার টীকায় বহুস্থানে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে স্বামিপাদকে বহু বচনে বিভূষিত করিয়া 'ভক্ত্যেকরক্ষক' বলিয়া প্রনাম করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদও সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া সন্দর্ভের সর্ব্বত্র শ্রীধরস্বামিপদের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন—'শ্রীধরস্বামি-চরণ পরমবৈষ্ণব'। তাঁহার টীকাতে তিনি শ্রীভগবানের বিগ্রহ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, ধাম ও পার্ষদগণের নিত্যত্ব এবং মুক্তির পরেও ভক্তির অনুবৃত্তির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের স্থানে-স্থানে যে কেবলাদ্বৈতবাদ-প্রতিম সিদ্ধান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, উহা কেবল তদানীন্তন মধ্যদেশব্যাপ্ত অদ্বৈতমতবাদিগণকে 'বড়িশামিষার্পন' ন্যায়-অবলম্বনে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিরা ভুলাইয়া আনিবার জন্য এবং শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ করাইয়া তাঁহার মহিমায় অবগাহন করাইবার উদ্দেশ্যে।

শঙ্করাচার্য্যের মতে মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য—'কারণ' এবং অবিদ্যাবচ্ছিন্ন

শ্রীবল্লভাচার্য্যও শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাহা নিরাস করিবার জন্য 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদে'র আবির্ভাব

চৈতন্য—'কার্য্য'। এই উভয়ের মিলনে 'কেবলাদ্বৈতবাদ'; 'শুদ্ধাদ্বৈত,-পদে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে।

(বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়)। 'শুদ্ধ'-শব্দটি 'অদ্বৈত' শব্দের বিশেষণ এবং

যাহা মায়া-সম্বন্ধরহিত, তাহা 'শুদ্ধ'। কার্য্য-কারণরূপ 'ব্রহ্ম' শুদ্ধ, মায়িক নহে।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু—প্রসিদ্ধ গোবিন্দভাষ্য প্রণেতা—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই,—'ঈশ্বর', 'জীব', 'প্রকৃতি', 'কাল' ও ও 'কর্ম্ম'—এইপাঁচটী মৌলিক তত্ত্ব। ইহাদের মধ্যে প্রথম তত্ত্বদ্বয় 'ঈশ্বর' ও 'জীব'—অজড় ও জ্ঞান-স্বরূপ; শেষোক্ত তত্ত্বত্রয় অর্থাৎ 'প্রকৃতি', 'কাল' ও 'কর্ম্ম'—জড় ও জ্ঞানহীন; দ্বিতীয়তঃ প্রথম তত্ত্বচতুষ্টয় অর্থাৎ 'ঈশ্বর', 'জীব', 'প্রকৃতি' ও 'কাল'—নিত্য বা অনাদি ও অনন্ত; শেষোক্ত তত্ত্ব 'কর্ম্ম'—অনিত্য অর্থাৎ অনাদি হইলেও অনন্ত নহে; তৃতীয়তঃ, প্রথম তত্ত্ব 'ঈশ্বর'—নিয়ন্তা, শেষোক্ত তত্ত্বচতুষ্টয় নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বচতুষ্টয়ের মধ্যে জীব—ভোক্তা প্রকৃতি—ভোগ্যা, কাল—ভোগের 'নিমিত্ত'-কারণ অর্থাৎ জীবের যে প্রকৃতি-উপভোগ, তাহা কালের মধ্যেই সংঘটিত হয়। জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পদার্থ-চতুষ্টয় ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া শক্তিমান্ ব্রহ্ম—অদ্বিতী বস্তু।

'ঈশ্বর'—স্বতন্ত্র, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, মুক্তিদাতা ও বিজ্ঞানস্বরূপ। ঈশ্বর বিভুচৈতন্য, নিত্যজ্ঞানাদি-গুণ-বিশিষ্ট ও অস্মদর্থবাচ্য। স্বতন্ত্র ও স্বরূপশক্তিমান্ এবং প্রকৃতি-প্রভৃতিতে অনুপ্রবেশ ও নিয়মনাদি-দ্বারা জগৎ রচনা করিয়া জীবের ভোগ ও মুক্তি বিধান করেন। ঈশ্বর এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইলেও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহিভাবে জ্ঞানবানের প্রতীতি-গোচর হন। ঈশ্বর 'অব্যক্ত' (প্রত্যক্) হইলেও ভক্তিগ্রাহ্য; তিনি

'একরস' হইলেও চিদানন্দস্বরূপ দান করেন। ব্রহ্ম—জ্ঞানৈকগম্য, অক্ষয়-অনন্ত-সুখস্বরূপ, নিত্য-জ্ঞানাদি-গুণযুক্ত। ব্রহ্মের শক্তি—স্বাভাবিক। ব্রহ্ম 'নিগু'ণ' হইলেও শঙ্করের মতানুযায়ী গুণহীন নহেন; পরন্তু প্রাকৃত-সত্ত্বাদি-গুণত্রয়-রহিত, স্বরূপানুবন্ধি অপ্রাকৃত গুণগণশালী। (শ্রীগোবিন্দভাষ্য ১,১,১)।

'জীব'—নিয়ামক ঈশ্বরের নিয়ম্য; অণুচৈতন্য। জীবাত্মা—বহু ও নানা অবস্থাসম্পন্ন। জীব—স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস। ঈশ্বর-বৈমুখ্যই-বন্ধনকারণ এবং তৎস্বরূপাবরণ ও তদ্গুণাবরণরূপ দ্বিবিধ বন্ধন মোচনপূর্ব্বক ঈশ্বরাসম্মুখ্যই স্বরূপসাক্ষাৎকার ঘটায়। জীব—ঈশ্বরের শক্তি, এবং ঈশ্বর—শক্তিমান্। ভোগবিষয়ে মুক্ত জীব ব্রহ্ম-সমান হইলেও স্বরূপতঃ ও সামর্থতঃ নিত্যই পৃথক্। জীবগণও আবার পরস্পর ভিন্ন। সাধন-তারতম্যে তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য আছে। মুক্তাবস্থাতেও জীব শ্রীহরির নিত্য-উপাসক। সুতরাং জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন, তাঁহার ন্যায় নিত্যচেতন ও তাঁহার দাস। (বেদান্তস্যমন্তক ৩য় কিরণ।

'প্রকৃতি'—সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণের সাম্যাবস্থাই 'প্রকৃতি'। উহা তমোমায়াদি-শব্দবাচ্য এবং ঈশ্বরের ঈক্ষণে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করে। প্রকৃতি স্বাতন্ত্র নহে; উহা নিত্যা, ঈশ্বরের আশ্রিতা ও বশ্যা। প্রকৃতি—ব্রহ্মেরই 'শক্তি'। সাংখ্যের মহৎ ও অহঙ্কারাদি-তত্ত্ব বলদেব স্বীকার করিয়াছেন। (বেদান্তস্যমন্তক ৪র্থ কিরণ)

'কাল'—ত্রৈগুণ্যশূন্য ও জড়, প্রকৃতিগুণ-ক্ষোভক ঈশ্বরের চেষ্টা-শক্তি-বিশেষই 'কাল'। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান; যুগপৎ, চির ও ক্ষিপ্র প্রভৃতি শব্দ-ব্যবহারের কারণ; ক্ষণাদি-পরার্দ্ধান্ত চক্রবৎ পরিবর্ত্তমান, প্রলয়-সর্গ-নিমিত্তভূত জড়দ্রব্যবিশেষের নাম—'কাল'। কাল—নিত্যও ঈশ্বরের অধীন। (বেদান্তস্যমন্তক ৫ম কিরণ)।

'কর্ম্ম'—জড়-পদার্থ; অদৃষ্টাদি-শব্দ-ব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর, ঈশ্বরের শক্তি এবং অনিত্য (বিনাশি)। (বেদান্তস্যমন্তক ৬ষ্ঠ কিরণ)।

'সম্বন্ধ'—শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য—এই 'সম্বন্ধ'। শঙ্করমতেও 'বাচ্য-বাচক'-ভাবই অঙ্গীকৃত; কিন্তু শঙ্কর 'ব্রহ্ম-দ্বৈবিধ্য' স্বীকার করিয়া সগুণ সোপাধিক ব্রহ্মকে 'বাচ্য' বলিয়াছেন এবং নির্গুণ নিরুপাধি ব্রহ্মকে 'জ্ঞেয়' বা 'লক্ষ্য' বলিয়াছেন। শ্রীবলদেবপ্রভু বলেন,—'ব্রহ্ম' শব্দের অবাচ্য নহে, যেহেতু 'ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' এই বৃহদারণ্যক-শ্রুতি-প্রমাণে জিজ্ঞাস্য পুরুষের উপনিষদ্‌বেদ্যত্ব স্থিরীকৃত হইতেছে। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' (তৈঃ ২।৪।১)—এই শ্রুতিতে যে 'অবাচ্যত্ব' বরিয়া মনে হয়, উহার সমাধান-কল্পে শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের 'সূক্ষ্মা' টীকায় (১।১।৫) বলিতেছেন যে, 'দেবদত্ত কাশী হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে' বলিলে, যেমন তাহার কাশীতে গমনপূর্ব্বক নিবৃত্তি বুঝায়, 'বাক্যসকল (যাঁহাকে) না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়' বলিলেও তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। 'যিনি বাক্যদ্বারা সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত হন না'—বলিলেও কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হন, বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম—শব্দবাচ্য।

'বিষয়'- নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্ত-গুণগণ সম্পন্ন, অচিন্ত্য, অনন্তশক্তি, সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম 'শ্রীকৃষ্ণ'ই শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য 'বিষয়'।

'প্রয়োজন'—অশেষ দোষ-বিনাশপূর্ব্বক পরতত্ত্ব-'শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার'ই 'প্রয়োজন'।

শ্রীবলদেবপ্রভু বলিয়াছেন,—ঈশ্বর ব্যাপক হইয়াও ভক্তিগ্রাহ্য; এক-রস হইয়াও স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দ বিতরণ করেন; সর্ব্বব্যাপী হইয়াও জীবের অন্তঃস্থ দেবতা; বৈষম্যহীন ন্যায়পরায়ণ হইয়াও ভক্তপক্ষপাতী; জগতের উপাদান-কারণ হইয়াও স্বয়ং পরিণামহীন ও পরিবর্ত্তনহীন; অংশহীন হইয়াও স্বাংশ। পরমেশ্বরে এইরূপ বহু আপাতঃ

বিরোধী গুণ ও শক্তির সমাহার দৃষ্ট হয়। পরব্রহ্মের গুণ ও শক্তি পরব্রহ্ম হইতে 'ভিন্ন' বা পৃথক্ নহে, 'অভিন্ন'।
অভিন্ন হইলেও বোধ-সৌকর্য্যার্থ তাহাদিগকে লোকাচার-বশতঃ ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহাই লোকাচার-
সম্মত 'ভেদ' বা 'বিশেষ'। ব্রহ্ম এবং তাঁহার গুণ ও শক্তির মধ্যে 'ভেদ' নাই, 'বিশেষ' আছে। 'বিশেষ'—ভেদের
প্রতিনিধি অর্থাৎ প্রকৃত ভেদের সৃষ্টি না করিয়াও আপাতঃ ভেদের প্রতীতি করায়। পরব্রহ্ম যুগপৎ সৎ
ও সত্ত্বাবান্, জ্ঞান ও জ্ঞাতা, আনন্দ ও আনন্দময় অর্থাৎ ব্রহ্মই ধর্ম্মী, ধর্ম্ম, শক্তিমান্ ও শক্তি। পরমেশ্বর—সজাতীয়,
বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদরহিত। তিনি ও তাঁহার শক্তি-ভিন্ন যখন বস্তুন্তরই নাই, তখন তাঁহাতে 'স্বজাতীয়' ও
'বিজাতীয়' ভেদ থাকিতেই পারে না; আর তাঁহার শ্রীবিগ্রহের প্রত্যেক অবয়বই যখন জ্ঞানানন্দময়, তখন তাঁহাতে
'স্বগত'-ভেদও অসম্ভব। তাঁহাতে কোন ভেদ না থাকিলেও ভিন্নবস্তুর বোধক শব্দের ন্যায় জ্ঞান, আনন্দ, হস্ত
ও পদ প্রভৃতি ভিন্ন-শব্দের ব্যবহার 'অচিন্ত্য 'বিশেষ'-স্বভাবের বলেই জানিতে হইবে।

ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তি—(১) পরা, (২) অপরা ও (৩) অবিদ্যা। পরাশক্তি—'বিষ্ণু'-'শক্তি' বা
'স্বরূপ'-'শক্তি'; 'ক্ষেত্রজ্ঞ' (জীব) শক্তি, ও 'মায়া' (বা অবিদ্যা) শক্তি। ব্রহ্ম পরাখ্য-শক্তিমদ্রূপে জগতের 'নিমিত্ত'-
কারণ এবং জীবশক্তি ও মায়াশক্তির শক্তিমদ্রূপে জগতের 'উপাদান'-কারণ হন। অতএব উভয় কারণ হন।
অপরাশক্তি হইতে 'জীবে'র ও অবিদ্যাশক্তি হইতে 'জগতে'র উৎপত্তি হয়।" নিমিত্তকারণরূপে ব্রহ্ম
'কূটস্থ'-নিত্য অর্থাৎ অপরিণামময় ও অপরিবর্ত্তনীয়। 'উপাদান'-কারণরূপে ব্রহ্ম 'পরিণামি'-নিত্য অর্থাৎ জগদ্রূপে
নিত্য। কিন্তু পরিণত হইয়াও তিনি অবিকৃত ও অপরিবর্ত্তিতই থাকেন (বেদান্তস্যমন্তক ২।১।১০)। আবার
পরব্রহ্মের পরাশক্তির ত্রিবিধ বৃত্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। সম্বিৎপ্রধানা বৃত্তি—'বাগ্দেবী' এবং হ্লাদপ্রধানা
বৃত্তি—'লক্ষ্মী', বিষ্ণুর অনপায়িনী নিজশক্তি, জীবকোটি নহেন (ঐ ২।২১)।

শ্রীবল্লভাচার্য্য—শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্থাপন
করেন। পরে শ্রীমাধবেন্দ্র-যতির নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া 'পূর্ণানন্দ' সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের
মতে মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য—'কারণ' এবং অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য—'কার্য্য'। এই উভয়ের মিলনে 'কেবলাদ্বৈতবাদ';
তাহা নিরাস করিবার জন্য 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদে'র আবির্ভাব। 'শুদ্ধ' এই শব্দটি 'অদ্বৈত' শব্দের বিশেষণ এবং 'শুদ্ধাদ্বৈত'-
পদে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে। যাহা মায়া-সম্বন্ধরহিত, তাহা 'শুদ্ধ'। কার্য্য-কারণরূপ 'ব্রহ্ম' শুদ্ধ, মায়িক
নহে। "মম মায়া" অর্থাৎ 'আমারই মায়া',—এই ভগবদুক্তি হইতে মায়াকে 'ভগবচ্ছক্তি' বলিয়া জানা যায়।
শক্তি শক্তিমানের সহিত 'অভিন্ন' বলিয়া শঙ্করের 'কেবলাদ্বৈতবাদে'র ন্যায় 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদে' মায়াসম্বন্ধ নাই।
'অধ্যাস'ই মায়িক, জীব মায়িক নহে। ব্রহ্ম স্বীয় বহুভবন-সামর্থ্যযোগে জীব-জগদ্রূপে অবিকৃতভাবে পরিণত
হন। ব্রহ্ম কারণাবস্থায় যদ্রূপ, কার্য্যাবস্থায়ও তদ্রূপ; কোনও অবস্থাতেই ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের অন্যথা
হয় না। কার্য্যের কারণসহ—জগতের ব্রহ্ম-সহ ঐক্য—অভেদত্ব, শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।
কার্য্যকারণরূপ শুদ্ধব্রহ্মের অভেদত্বই—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ (শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত অণুভাষ্যম্ ২।১।১৪)।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদে শ্রীকৃষ্ণ 'পরব্রহ্ম' শব্দবাচ্য, তিনি পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্। 'অপাণিপাদঃ' শ্রুতি তাঁহার
প্রাকৃত পাণি-পাদ নিষেধ করিয়া সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে'
ইত্যাদি শ্রুতি পরব্রহ্মকে অপ্রাকৃত-ধর্ম্মাধার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। পরব্রহ্ম সাকার, তিনি প্রাকৃত গুণ ও
আকারাদি-রহিত, তিনি নানাবিরুদ্ধ শক্তি সমূহের আশ্রয়, বিশুদ্ধ-স্বরূপাত্মক, সর্ব্বধর্ম্মবিভূষিত, বাৎসল্যাদি
সমগ্র উত্তমগুণসমূহের সমুদ্র। কিন্তু ধর্ম্ম ও গুণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মে দ্বৈতের গন্ধ পর্য্যন্তও স্পর্শ করিতে
পারে না; কারণ, পরব্রহ্মের গুণ অথবা ধর্ম্ম কেবল স্বরূপাত্মক; যেমন সূর্য্যের তেজঃ সূর্য্যের স্বরূপের সহিত

অপৃথক ('প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ' ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৮)। ব্রহ্ম—অচিন্ত্যশক্তি; যাহা পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা ব্রহ্মসম্বন্ধে 'সর্ব্বতোভাবে' সম্ভব। অতএব ব্রহ্ম নিরবয়ব, অথচ কর্ত্তা ও উপাদান এবং নির্ব্বিকার (বল্লভাচার্য্যকৃত 'সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধঃ' ১৬৫-৬৭)।

পরব্রহ্মের বহিঃক্রীড়াপ্রবৃত্তি তাঁহার জাগতিক অবস্থা এবং অন্তঃক্রীড়ানিরতিই তাঁহার জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা। যখন তাঁহাতে বাহ্যরমণের ইচ্ছা উদ্ভূত হয়, তখন তাঁহার ধর্ম্মগুলির তিরোভাবাদি বিবিধ তারতম্য-দ্বারা এই জগৎ আবির্ভূত হয়। প্রথমে যে রূপের দ্বারা ভগবান্ স্বীয় ধর্ম্মগুলিকে স্বীয় স্বরূপের সহিত পৃথক করেন, তাহাই শ্রুতিসমূহে 'অক্ষর', 'ব্রহ্ম', প্রভৃতি শব্দে অভিহিত। শুদ্ধাদ্বৈত-জ্ঞানিগণের হৃদয়ে এই অক্ষরের স্ফূর্ত্তি প্রকাশমাত্র-রূপে হয়। কারণ, তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে একমাত্র জ্ঞানশক্তি ব্যতীত অন্য সমুদয়শক্তির তিরোভাব পরিদৃষ্ট হয়। এজন্য জ্ঞানিগণ এই অক্ষরকে 'নির্ধর্ম্মক' বলিয়া অভিহিত করেন।

ভগবানের বিশুদ্ধ সত্ত্ব, বিশুদ্ধ রজঃ ও বিশুদ্ধ তমঃ তিনটি গুণ আছে। কিন্তু প্রাকৃত ও ভগবদীয় গুণে প্রচুর পার্থক্য। যখন সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ এই প্রপঞ্চকে যথাবস্থিত রাখিবার কিম্বা ধারণ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ (অপ্রাকৃত) সত্ত্বকে বিগ্রহরূপ করিয়া লৌহগোলকান্তর্গত অগ্নির ন্যায় তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক 'বিষ্ণু'-নাম ধারণ করেন; বিশুদ্ধ (অপ্রাকৃত) রজোগুণের বিগ্রহে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং বিশুদ্ধ (অপ্রাকৃত) তমোগুণের বিগ্রহ রচনাপূর্ব্বক শিবরূপ পরিগ্রহ করেন। এই হেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর 'গুণাবতার' নামে অভিহিত হন। ইঁহাদিগকে প্রকৃতির গুণ স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্—সমুদয় অবতারের মূলস্বরূপ। তিনি সকলের সহিত পৃথক্, পুরুষোত্তম, নির্গুণ, আনন্দময়, সাকার ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূলস্বরূপ ভগবানেরর চারিটি স্বরূপ। প্রথম—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ পুরুষোত্তমস্বরূপ। দ্বিতীয় ও তৃতীয়—অক্ষর ব্রহ্ম, যাঁহার দুইপ্রকার স্ফূর্ত্তি হয় এবং চতুর্থ—অন্তর্য্যামিস্বরূপ। যেই-প্রকার অনুভবের স্ফূর্ত্তিতে গ্রাহকের আনন্দের মাত্রা অতিমাত্র বিশেষ হয়, সেই আনন্দানুভবই 'ভগবান্'। ধর্ম্মাত্মক আনন্দই ভগবানের আকার-রূপাদি; আর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী 'অভিন্ন'—একই বলিয়া ভগবান্ আনন্দমাত্র অর্থাৎ আনন্দানুভবমাত্র। তিনি—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। সেই আনন্দানুভব বেদে 'ব্রহ্ম', 'পর' প্রভৃতি শব্দে; স্মৃতিতে 'পরমাত্মাদি' শব্দে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে 'ভগবান্' শব্দে উক্ত হইয়াছেন। নিত্যবর্ত্তমান বলিয়া এবং অনুভবরূপ বলিয়া সেই আনন্দস্বরূপ ভগবান্ 'সচ্চিদানন্দ' বলিয়া অভিহিত হন।

আনন্দানুভব মাত্র ভগবান্ স্বীয় ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবসকল-দ্বারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা (অন্তর্যামী) এবং জীবাদিরূপ-সকল পরিগ্রহ করেন। এই হেতু লেশমাত্র দ্বৈতাপত্তি হয় না। জীব স্বজাতীয়, জড়বর্গ বিজাতীয় এবং অন্তর্যামী স্বগত। প্রকৃতি 'সদংশ' বলিয়া প্রকৃতি ও ভগবানে বিজাতীয় দ্বৈত নাই। জীব 'চিদংশ' বলিয়া জীব ও ভগবানে সজাতীয় দ্বৈত নাই এবং অন্তর্য্যামী 'সচ্চিদানন্দ' বলিয়া অন্তর্য্যামীও ভগবানে স্বগত দ্বৈত নাই; ইহাই 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'। যেই-প্রকার অনুভবের স্ফূর্ত্তিতে গ্রাহকে অনুভবের মাত্রা বিশেষ হয় এবং আনন্দ কিঞ্চিৎ তিরোহিতবৎ থাকে তদ্রূপ আনন্দানুভব 'অক্ষর 'ব্রহ্ম বলিয়া' অভিহিত হন। এই অক্ষর ব্রহ্মই সমুদয় প্রপঞ্চের (জগতের,) উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জগতের পিতৃ-মাতৃরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি উভয় আবির্ভূত হইয়াছেন। অক্ষর-ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দাত্মক; এই হেতু ইহা হইতে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব ও ব্যষ্টিজীব উদ্ভূত হয়। এই অক্ষর ব্রহ্মের যে দুই-প্রকার স্ফূর্ত্তি, তন্মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈত জ্ঞানিগণের জ্ঞানমাত্র স্ফূর্ত্তি এবং ভক্তগণের ব্যাপি বৈকুণ্ঠরূপ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। যাঁহাদের জ্ঞানমাত্র স্ফূর্ত্তি হয়, তাঁহাদের সেই স্ফূর্ত্তিটি নির্ব্বিশেষে তুল্য বলিয়াও কথিত হয়। কিন্তু তজ্জন্য অক্ষর ব্রহ্মরূপ বস্তুতে অবশ্য ভেদ হইয়া যায় না। যখন সেই ভগবান্ নাম-রূপের

পৃথক্করণ করিতে চা'ন, বিশ্ব ধারণ করিতে চা'ন, সকলকে স্বীয়-স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চা'ন, কিম্বা সমুদয়কে প্রকাশিত করিতে চা'ন, তখন ভগবান্ই পর-পুরুষ, অন্তর্য্যামী; কিংবা পরমাত্মরূপ পরিগ্রহ করেন। অথবা এই আনন্দানুভব যখন গ্রাহকের হৃদয়ে ধারকত্বাদি শক্তিসমূহ-সহ উদ্ভূত হ'ন, তখন ইনি 'পরমাত্মা' বলিয়া উক্ত হন; সমুদয়কে সঞ্জীবিত করেন (স্বীয় স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত করান) বলিয়া ইনি কোন কোন স্থলে 'জীব' বলিয়াও উক্ত হন। জ্ঞানমার্গীয় সাধন দ্বারা ব্রহ্মস্ফূর্তি, মর্য্যাদা মার্গীয় ভক্তিদ্বারা পরমাত্ম-স্ফূর্ত্তি এবং শুদ্ধপ্রেম-দ্বারা ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হয়।

জীব—ব্রহ্মসম্বন্ধী অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। জীব ব্রহ্মের 'অংশ' ও 'বহু'। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হয়, তেমন পরমাত্মা হইতে সর্ব্ব প্রাণাদি মহাভূত, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, সমস্ত জীব, সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী বহির্গত হ'ন। জীব-সৃষ্টিতে কতকগুলি সদ্বাসনাবিশিষ্ট, কতকগুলি অসদ্বাসনাবিশিষ্ট। ব্রহ্মের সদংশ হইতে জড়-সৃষ্টি; চিদংশ হইতে জীব-সৃষ্টি এবং আনন্দাংশ হইতে অন্তর্য্যামীর আবির্ভাব হয়। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপটি ব্রহ্মের অবিভক্ত স্বরূপ বলিয়া যদিও বস্তুতঃ 'জড়' ও 'জীব'—এই সমগ্র অবিভক্ত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মেরই সৃষ্টি, তথাপি 'আমি এক হইলেও বহু হই' এইরূপ বহুভবনেচ্ছায় স্বতন্ত্রেচ্ছ ভগবান্ সদ্রূপ জড়পদার্থ হইতে চিৎ ও আনন্দাংশের এবং চিদ্রূপ জীবপদার্থ হইতে সৎ ও আনন্দাংশের তিরোভাব করিয়া সৃষ্টি সম্পন্ন করেন বলিয়া সদ্রূপ জড়পদার্থে সদংশের ও চিদ্রূপ জীবে চিদংশের বিশেষ আবির্ভাব হয়। জীবের প্রাকট্য অতর্ক্যশক্তি ভগবানের স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশতঃই হয়। (অনুভাষ্যম্ ২।৩।৪৩-৪৪)।

শুদ্ধাদ্বৈত-মতে—জীব ব্রহ্মের 'অংশ'। কেবলাদ্বৈতবাদীর মতে—জীব ব্রহ্মের 'প্রতিবিম্ব', ব্রহ্মের 'আভাস' বা ব্রহ্মের ঔপাধিক 'ভেদ'মাত্র। জীব-সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ মতবাদকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রুতিতে বহুবচন-প্রয়োগে জীবের অসংখ্যত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্মের 'অংশ' বলিয়া জীব 'অণু'। শ্রুতির 'স চানন্ত্যায় কল্পতে' বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, জীবে ব্রহ্মের আনন্দাংশের আবির্ভাব হওয়ার পরে জীব ব্যাপকতা-প্রাপ্ত হয়। যখন আনন্দাত্মক ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া জীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও স্বরূপে স্বয়ং প্রবেশ করেন, তখন কাষ্ঠ যেরূপ অনলাত্মা হয়, সেইরূপ এই জীবও ব্রহ্মাত্মক হয়। তৎকালে জীবের প্রতি লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। (স্বপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধ ১।৮৩-৫১)।

কেবলাদ্বৈতবাদী জীবকে 'জ্ঞাতা' ও 'কর্ত্তাদি' বলিলে পাছে দ্বৈতাপত্তি হয়, এজন্য তাহা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলেন,—যেমন অগ্নি 'দাহক' বলিয়া অগ্ন্যংশ বিস্ফুলিঙ্গ-সকলও 'দাহক', তেমন ব্রহ্ম 'জ্ঞাতা' বলিয়া ব্রহ্মাংশ জীবও 'জ্ঞাতা'; তবে বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির ন্যায় সর্ব্বদাহকশক্তিসম্পন্ন নহে, তেমন জীবও ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতা-সম্পন্ন নহে। জীব 'কর্ত্তা' ইহা ব্রহ্মসূত্রের (২।৩।৩৩) 'কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ' সূত্রে উক্ত হইয়াছে। জীবকে কর্ত্তা না মানিলে জীবাধিকারে সমুদয় বৈদিক কর্ম্ম নিরর্থক ও বিফল হইয়া যায়। (অনুভাষ্যম্ ২।৩।৩৩)।

মায়া—মায়া পরব্রহ্মের 'শক্তি'। মায়ার দুইটী ভেদ—একটি 'ব্যামোহিকা'-শক্তি এবং অপরটি 'আচ্ছাদিকা' শক্তি। 'ব্যামোহিকা' মায়াশক্তি জীবকে মুগ্ধ করে, এবং 'আচ্ছাদিকা' মায়াশক্তি জগতের সত্যবস্তু-সদৃশ অসত্য বস্তুর রচনা করিয়া তদ্দ্বারা জগতের সত্যপদার্থকে আচ্ছাদন করে। তাহাতে সদ্বস্তুর যেটি প্রকৃত স্বরূপ, সেটি দৃষ্ট না হইয়া অন্যথা দৃষ্ট হয়। এইরূপ দর্শনই সত্যে মিথ্যা দর্শন বা বিষয়তা-দর্শন। এ-স্থলে বিষয় 'সত্য' কিন্তু বিষয়তা 'মিথ্যা'। এই মায়াজন্য 'বিষয়তা' হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা ভ্রমাত্মক এবং 'বিষয়'-জন্য যে জ্ঞান, তাহা যথার্থ অনুভূতি বা প্রমাণ। স্বপ্নসৃষ্টি, ঐন্দ্রজালিক-সৃষ্টি, রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ভ্রমাত্মক-সৃষ্টি—এই তিনটি একই ভাবের মায়াজন্য সৃষ্টি। কিন্তু জগদ্বর্ত্তী সমস্ত পদার্থ 'ব্রহ্মজন্য' সৃষ্টি। (শ্রীবল্লভাচার্য্য-কৃত 'সুবোধিনী' টীকা ভাঃ ২।৯।৩৩)।

শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের 'জগন্মিথ্যাত্ববাদ' সর্ব্বতোভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতে 'জগৎ'

ও 'সংসার' দুইটি পৃথগ্ বস্তু। ব্রহ্মের অবিকৃত পরিণামের স্বরূপই 'জগৎ' পদবাচ্য—উহা সত্য, নিত্য এবং প্রবাহবাদ্ গমনশীল। সংসার অবিদ্যাকৃত, অহং-মমতার আগার, জীবের জন্ম-মরণাদি দুঃখের আধার। জগদ্দর্শনে জীবেরা 'আমি ও আমার' বলিয়া যে প্রতীতি, তাহাই 'সংসার'। এই সংসার—অবিদ্যার কার্য্য, আর জগৎ—ভগবৎ-কার্য্য। (স্বঃ তঃ দীঃ নিঃ)।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-মতে 'পরিণাম' দুইপ্রকার—একপ্রকার পরিণাম, পরিণামের পরও পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্বরূপ লাভ হইতে পারে, যেমন, 'স্বর্ণকুণ্ডল'; আর একপ্রকার পরিণাম প্রাপ্তি হইলে আর পূর্ব্বস্বরূপ লাভ হয় না,—ইহাই 'বিকার' নামে কথিত, যেমন, 'দধি'। ইহা বিকার বা 'বিকৃত পরিণাম'। পরিণাম-প্রাপ্তির প্রাক্কালে, পরিণাম-প্রাপ্তির সময়ে ও পরিণাম-প্রাপ্তির পরে কোন প্রকার অন্যথা ভাব-বিবর্জ্জিত যে পরিণাম অর্থাৎ কারণের কার্য্যরূপ-পরিগ্রহণ, সেই পরিণামই 'অবিকৃত'-'পরিণাম'। ব্রহ্মের জগদ্রূপ পরিণাম-প্রাপ্তি এই প্রকারের (অনুভাষ্যম্)।

পুষ্টিমার্গ

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "পোষণং তদনুগ্রহঃ" (ভাঃ ২।১০।৪) অর্থাৎ নিজভক্তের প্রতি বা সাধক-ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ, তাহারই নাম—'পোষণ'। এই শুকবাক্য হইতে কৃষ্ণানুগ্রহরূপা 'পুষ্টি'ই পুষ্টিমার্গে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তিপথ—মর্য্যাদা ও পুষ্টি-ভেদে দ্বিবিধ। শাস্ত্রীয় অনুশাসন-অনুযায়ী যে বৈধী-ভক্তি, তাহাই মর্য্যাদা-মার্গ। আর, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের অনুগ্রহমাত্র-লাভৈকহেতুকা যে ভক্তি তাহাই 'পুষ্টিমার্গ'।

শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রুতির (কঠ ১।২।২২, মুণ্ডক ৩।২।৩) "নায়মাত্মা......যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" এই মন্ত্র হইতে পরব্রহ্মের দ্বারা যে জীব বৃত অর্থাৎ অনুগৃহীত হ'ন—তিনিই পুষ্টিমার্গের পথিক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত 'তত্ত্বার্থ-দীপ-নিবন্ধে'—"অনুগ্রহরূপো ভগবদ্ধর্ম্মঃ পুষ্টিঃ" অর্থাৎ ভগবানের অনুগ্রহরূপ যে ভগবদ্ধর্ম্ম তাহাই 'পুষ্টি'।

শ্রীবল্লভাচার্য্য বলেন, শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ সকল জীবের প্রভু হইলেও যাঁহাকে স্বীয়ত্বে বরণ করেন, তাঁহার (সেই জীবরূপা প্রকৃতির) বিবাহিত পতির ন্যায় ভর্ত্তা হইয়া বরণজ-স্নেহাতিশয্যে ভক্তের পোষ্য বা পাল্য হন অর্থাৎ পালক প্রভু ভক্তাধীন পাল্য হইয়া পড়েন। ভক্ত যেরূপ ভগবান্‌কে ধারণ করেন, শ্রীভগবান্ স্বয়ংও সেইরূপ ভক্তকে আপনার মধ্যে ধারণ করেন। অতএব পুষ্টিমার্গে শ্রীভগবানের অনুগ্রহই নিয়ামক; এজন্য পুষ্টিমার্গকে অনুগ্রহৈক-সাধ্য বলা হইয়াছে। মর্য্যাদা ও পুষ্টি-ভেদে বরণ দ্বিবিধ। কিন্তু মর্য্যাদা-মার্গে সাধনাদির অপেক্ষা আছে; পুষ্টিতে কৃপা ব্যতীত অন্যাপেক্ষা নাই। (অনুভাষ্যম ৪।৫।১৫)।

বিশেষানুগ্রহজন্যা যে ভক্তি, তাহাই 'পুষ্টি'-ভক্তি। ভগবানের স্বরূপাতিরিক্ত ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিতত্বই উহার লক্ষণ, অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপের সেবা বা সর্ব্বপ্রকারে সুখানুসন্ধান ব্যতীত পুষ্টি-ভক্তিতে অন্য কোন প্রকার ফল বা প্রয়োজন-লাভের বাসনা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে (ভাঃ ১১।১৪।১৪), শ্রীগোপীগণের উক্তিকে (১০।২১।৭, ১০।২৯।৩৯) যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাত্মক ফলাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই পুষ্টিভক্তির লক্ষণ। পুষ্টি-ভক্তি চতুর্ব্বিধা—(১) প্রবাহ-পুষ্টি, (২) মর্য্যাদা-পুষ্টি, (৩) পুষ্টি-পুষ্টি ও (৪) শুদ্ধ-পুষ্টি। (১) অহংতা-মমতাত্মক যে সংসার, তাহাই প্রবাহ। এই প্রবাহ বা স্রোতে বদ্ধজীব মাত্রই পতিত। এই সকল বদ্ধজীবের কেবল কর্ম্মে রুচি। সেই রুচি যখন ভগবদুপযোগি-ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হয়, তখন উহাকে 'প্রবাহ-পুষ্টি'-ভক্তি বলা যায়। লৌকিকী ক্রিয়াগুলি ভগবদুপযোগি-ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হইলে 'প্রবাহ-পুষ্টি'-ভক্তি হয়। (২) জীবের বিষয়-প্রবৃত্তি নিরাকরণ করিয়া শাস্ত্রানুশাসন বা মর্য্যাদা নিবৃত্ত মার্গীয় ধর্ম্মসমূহে প্রযোজনা করে। সেই শাস্ত্রানুশাসন বা মর্য্যাদা মিশ্রন হইতে যাঁহারা বিষয়াসক্তিকে সংযত করিয়া ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা 'মর্য্যাদা-পুষ্টি'-ভক্ত। ৩) ভগবদ্ভক্তির উপযোগি জ্ঞানলাভ করিয়া অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া যে ভগবানে ভক্তি, তাহাই পুষ্টি-পুষ্টি'-ভক্তি। (৪) কেবলপ্রেম-প্রধানা যে ভক্তি, তাহাই 'শুদ্ধপুষ্টি-ভক্তি। প্রেম-প্রধান

ভক্তগণ স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রেমাস্পদ ভগবানের কেবল পরিচর্য্যা, গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। এই ভক্তি অত্যন্ত দুর্ল্লভা ও সর্ব্বোৎকৃষ্টা। ('প্রমেয়রত্নার্ণবে' পুষ্টিবিবেকঃ)। শ্রীগৌড়ীয় রসিকগণের সিদ্ধান্ত সম্মত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পুষ্টি-পরাকাষ্ঠার অধিকতর উৎকর্ষ শ্রীপ্রীতি সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীবল্লভাচার্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ও তদনুগ ভক্তবৃন্দের কয়েকটি মিলন প্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছে। যখন শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীবল্লভ ভট্ট সকুটুম্ব আড়াইলে অবস্থান করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রয়াগে শুভাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার দর্শনে আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বহিরঙ্গজ্ঞানে তাঁহাকে বিশেষ গৌরব প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের মহাপ্রেমাবেশ দর্শন করিয়া সপার্ষদ তাঁহাকে আড়াইলে নৌকাযোগে লইয়া স্বহস্তে পাদপ্রক্ষালণ ও সবংশে পাদোদক পান করিয়া প্রভুকে নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করাইলেন। গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপের দ্বারা মহাপূজা করিলেন। সযত্নে ভিক্ষা করাইয়া স্বহস্তে প্রভুর পাদসেবন করিয়া বৈষ্ণব গৃহস্থের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ইহার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় রথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ বন্দন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু আলিঙ্গনাদি-দ্বারা তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বিবিধ প্রকার স্তব স্তুতি করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্যচ্ছলে নিজের স্বরূপ গোপন করিয়া নিজভক্তগণের মহিমা কীর্ত্তন করেন। সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা ভিক্ষা করাইলেন। একদিন স্বকৃত 'সুবোধিনী' টীকা শ্রবণ করাইতে প্রার্থনা করিলে ও শ্রীনামের অর্থ শুনাইতে চাহিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্য করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণনামের রূঢ়ার্থ—'শ্রীশ্যামসুন্দর যশোদা-নন্দন' এই অর্থ ব্যতীত অন্যার্থ অস্বীকার্য্য বলিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট ইহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট যাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তৎকৃত শ্রীনামের ব্যাখ্যা ও ভাষ্যশ্রবণ করাইতে চাহিলে তিনি উভয় শঙ্কটে পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট প্রতিদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিতেন। একদিন তিনি 'শ্রীকৃষ্ণনাম' পতির নাম উচ্চারন করা জীবরূপা প্রকৃতির কর্ত্তব্য কি? প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন "স্বামীর সন্তোষার্থে স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করাই পতিব্রতার ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নাম নিরন্তর গ্রহন করিবার আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সন্তোষার্থে সেই আজ্ঞা পালনার্থ জীবের সর্ব্বক্ষণ 'কৃষ্ণ'-নাম গ্রহণ করাই পরম ধর্ম্ম"। আর একদিন শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বৈষ্ণব সভায় স্বীয় পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব প্রখ্যাপন-মুখে বলিলেন 'শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন'। ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—'স্বামীকে যে না মানে, সে বেশ্যার মধ্যে গণ্য।" এই প্রকারে বার বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু আড়াইলে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন এখন এরূপ বিরূপ হইলেন কেন? নিশ্চয়ই আমার চিত্ত প্রতিষ্ঠাকাজ্ক্ষায় দূষিত হইয়াছে। তৎশোধন আবশ্যক। তৎপরদিন যাইয়া নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া কৃপা করিলেন। তখন আর একদিন ভিক্ষা দান করিলেন।

শ্রীবল্লভ ভট্ট পূর্ব্বে বাৎসল্যরসে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন এবং বালগোপাল মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গফলে তাঁহার মধুররসে শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রবৃত্তি হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট হইতে 'কিশোর-গোপাল মন্ত্র' গ্রহণ করেন।

শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর নিকট মধুররসে শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীবল্লভাচার্য্যকে বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান-দানপূর্ব্বক তাঁহার 'সুবোধিনী' টীকার সিদ্ধান্তবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীগৌড়ীয়গণের বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তিই যথাক্রমে শ্রীবল্লভাচার্য্য-কথিত 'মর্য্যাদামার্গ' ও 'পুষ্টিমার্গ' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ে 'চৌরাশী' সংখ্যাটি একটি বিশেষ তাৎপর্য্যজ্ঞাপক শুভ সংখ্যা; এজন্য তাঁহারা শ্রীবল্লভাচার্য্যের চৌরাশী সংখ্যক গ্রন্থ, চৌরাশী বৈঠক (পদাঙ্কপূতস্থান); চৌরাশী প্রকার ভক্তি' (একাশী প্রকার সগুণা-

ভক্তি ও তিন প্রকার নির্গুণা ভক্তি, যথা—প্রেম, আসক্তি ও ব্যসন ', চৌরাশী জন মুখ্য শ্রীবল্লভ শিষ্য এবং তাঁহাদে চৌরাশীটি বার্ত্তা কল্পনা করিয়াছেন।

তিনি ৬ দিন যতিধর্ম্ম আচরণ করেন, বহূদকাশ্রম গ্রহণ করিয়া ৮ দিন নদীতটে বাস করেন, হংসাশ্র গ্রহণ করিয়া ১৮ দিন কাশীতে বৈষ্ণব সমাজ-কর্ত্তৃক পূজিত হন, তাহার পর কাশীর হনুমান ঘাটে ৭ দিন পরমহংস-ভা অবস্থিত থাকেন, পরে চত্বারিংশৎ দিবসে গঙ্গায় নাভিমাত্র-জলে-অবস্থান-পূর্ব্বক নিমীলিত-নেত্রে শ্রীভগবা‌নকে ধ্যা করিতে করিতে মধ্যাহ্নে অন্তর্হিত হন।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—১। শ্রীবল্লভবেদের পূর্ব্বকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড উভয়কেই সংযুক্তভাবে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীজৈমিনি বেদের পূর্ব্বকাণ্ড স্বীকার করিয়া উত্তরকাণ্ড ত্যাগ করিয়াছেন শ্রীশঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বকাণ্ড ত্যাগ করিয়া উত্তরকাণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য বলেন, ইহাতে পূর্ণাঙ্গ বেদে অঙ্গকে ছিন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহার মতে বেদের উভয় কাণ্ডই পরস্পর সহযোগী এবং উত্তরোত্তর পূর্ব্ব পূর্ব্বের মীমাংসক, যেমন—শ্রুতির 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা'—এই মন্ত্র পাঠে যদি কেহ পরব্রহ্মকে হস্তপদাদিহী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তবে তাঁহার গীতার "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ"—বাক্যের দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। আবার যদি গীতার কোন বাক্যে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম সূত্রোক্ত সিদ্ধান্তাবলম্বনে উহা নিরাকরণ করিতে হইবে। যদি ব্রহ্মসূত্রের কোন সিদ্ধান্তে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের সমাধিভাষাদ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে। একই পরব্রহ্ম বেদের পূর্ব্বকাণ্ডে যজ্ঞরূপে আংশিক প্রকাশ, উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মরূপে আংশিক প্রতীতিমাত্র ও স্মৃতিতে পরমাত্মরূপে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বা শ্রীকৃষ্ণরূপে পূর্ণপ্রতীতি বর্ণিত হইয়াছেন। (১)

২। চিত্তপ্রসন্নতা দ্বারা কর্ম্মনিষ্ঠা, সর্ব্বজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা, ও কৃষ্ণপ্রসন্নতা দ্বারা ভক্তি-নিষ্ঠা পরীক্ষিত হয়।

৩। জগৎ ও সংসার—এক নহে। জগৎ (পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ)—ব্রহ্মের কার্য্য, আর সংসার (জন্মমরণ প্রবাহ)—জীবগত অবিদ্যারচিত। সংসারের উৎপত্তি ও লয় আছে, কিন্তু জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র হয় সংসারের শেষ আছে, কিন্তু জগতের শেষ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন আত্মরতীচ্ছু হইয়া জড়-জীবাত্মক প্রপঞ্চে তিরোহিত চিদানন্দাংশ প্রকট করান, তখন প্রপঞ্চ শ্রীকৃষ্ণে লীন হয়।

৪। পরব্রহ্ম- স্বরূপলক্ষণে সচ্চিদানন্দময়, সাকার, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র, ত্রিবিধভেদরহিত সর্ব্বাধার, মায়াধীশ, জগতের সমবায়ী ও নিমিত্তকারণ, সর্ব্ববিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়, যুক্তির অগোচর, আবির্ভাব ও তিরোভাব-শক্তিশালী, স্বেচ্ছায় প্রকাশশীল, পরমকাষ্ঠাপন্ন, পুরুষোত্তম-শব্দবাচ্য নিত্যলীল শ্রীকৃষ্ণ। এই পরব্রহ্মই বহুভবনেচ্ছায় সকল-কারণ-কারণভূত অক্ষরব্রহ্মরূপে এবং সর্ব্বনিয়মনাদি-কার্য্যসিদ্ধির জন্য সূর্য্যমণ্ডলে পৃথিবীতে ও অধিদেবতাদিতে মুখ্য অন্তর্য্যামিরূপে আবির্ভূত হন। অক্ষর ব্রহ্মের সদংশ হইতে জগৎ চিদংশ হইতে অনন্ত জীব ও আনন্দাংশ হইতে অন্তর্য্যামিস্বরূপ এবং স্বভাব, কাল ও কর্ম্ম প্রকাশিত হয়। অক্ষর ব্রহ্মই আনন্দময়ের পুচ্ছ, পরমাত্মা ইত্যাদিরূপে কথিত হ'ন। ইনিই জ্ঞানিগণের উপাস্য এবং জ্ঞানমার্গী মুক্তজীব এই অক্ষর-সাযুজ্য প্রাপ্ত হন।

৫। জ্ঞানমার্গের সাধ্য—অক্ষর-ব্রহ্মে লয়; ইহাকে মায়াবাদিগণ ভ্রান্তিবশতঃ ব্রহ্মানন্দ বলে। ভক্তি সাধ্য—স্বরূপানন্দ বা সাযুজ্য; ইহাতে জীবের জীবত্বের লয় হয় না। জীবে যে আনন্দ-ভাবটি গুপ্ত থাকে, তাহাই ব্যক্ত হয়; ইহাকেই ব্রহ্মভাব বা সাযুজ্য বলে। বল্লভাচার্য্যের মতে ভক্তিই—সাধন, সাযুজ্য বা ব্রহ্মভাব—সাধ্য।

৬। 'তত্ত্বমসি'-মন্ত্র,—তত্ত্বম্+অসি=তত্ত্ব ভাবস্তং ভবসি—এইরূপ অর্থ করেন। শ্রুতির খণ্ডিতাংশ—

মাত্র—মহাবাক্য নহে, পরন্তু "ঐতদাত্ম্যমিদং.......তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—এই সম্পূর্ণ বাক্যই "মহাবাক্য," এতদ্দ্বারা জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব, সত্যত্ব, এবং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব (সামান্য নহে) জ্ঞাপিত হইতেছে। "তত্ত্বমসি"-শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের গুণসাম্যজ্ঞাপক অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রধান গুণই আনন্দ—জীবে সেই আনন্দময়তা সুপ্ত আছে, যখন তাহা জীবে ব্যক্ত হয়, তখনই তাহাতে ব্রহ্মসাম্যতা প্রকাশিত হয়। জাগতিক অবস্থানে জীবে সেই আনন্দ-গুণটি তিরোহিত, কিন্তু জীব আনন্দহীন নহে, আনন্দ তাহাতে অনুস্যূত আছে, যেরূপ—বালকে পুংত্ব শিশুকালে অনুস্যূত থাকে বলিয়াই যৌবনে তাহা ব্যক্ত হয়।

৭। যিনি বৈদিক গৌণমুখ্য-জ্ঞানযুক্ত প্রেমের সহিত শ্রবণাদি ভক্তিদ্বারা হরির সেবা করেন, তিনি ভক্তিমার্গে **উত্তম**। যাঁহার জ্ঞানের সহিত ভক্তি আছে, কিন্তু প্রেম নাই—তিনি **মধ্যম**। যাঁহার শাস্ত্রার্থজ্ঞানাভাব অথচ প্রেমের সহিত ভজন করেন, তিনি অধম এবং যাঁহার প্রেম ও জ্ঞান, উভয়ই নাই অথচ সেবা করেন, তাঁহার সেই ভক্তিপ্রয়াস পাপঘ্ন ও ধর্ম্মজনক হইলেও তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে। অতএব ভক্তির সহিত জ্ঞান ও প্রীতি অবস্থান করিবে। সুতরাং বল্লভাচার্য্যের মতে বৈরাগ্য, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও প্রেম **উত্তমা ভক্তির অঙ্গ।**

৮। প্রথমে বৈরাগ্য (বিষয়বিতৃষ্ণা), তৎপরে সাংখ্যজ্ঞান (নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক-পূর্ব্বক সর্ব্বপরিত্যাগ), তদনন্তর একান্তে অষ্টাঙ্গযোগ, তদনন্তর তপ (বিচারপূর্ব্বক আলোচনা বা একাগ্রভাবে স্থিতি), অনন্তর ভক্তি অর্থাৎ নিরন্তর ভাবনাদ্বারা পরমপ্রেম। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই পঞ্চপর্ব্বা বিদ্যাদ্বারা হরির সাক্ষাৎকার ও তাঁহাতে প্রবেশ লাভ করেন। ইহাই মর্য্যাদামার্গীয় সাধনসম্পত্তি এবং এই সাধনের মোক্ষই সাধ্য। যিনি মুক্ত হন, তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লয় অথবা ব্রহ্মভাব (জীবস্বরূপে তিরোহিত-আনন্দাংশের আবির্ভাব) প্রাপ্ত হ'ন। একমাত্র হরিসেবাতেই উক্ত সাযুজ্য বা ব্রহ্মভাব লাভ হয়। মুক্ত জীব একমাত্র আত্মাতেই আনন্দানুভব করেন। কিন্তু স্বতন্ত্রভক্ত অর্থাৎ পুষ্টি-মার্গীয় ভক্তগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে, অন্তঃকরণে ও স্বরূপে আনন্দানুভব করেন। এইজন্য এই প্রকার ভক্তের পক্ষে জীবন্মুক্তি অপেক্ষা ভগবৎকৃপার সহিত গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠ (সপ্রকাশতত্ত্বার্থ দীপনিবন্ধ ৪৫, ৪৬, ৫০, ৫১, সর্ব্বনির্ণয় প্রকরণ—২২৮—২৪৬)।

৯। যদি তপ ও বৈরাগ্যের সহিত শ্রবণাদি-ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহার ফলস্বরূপ জন্মান্তরে জ্ঞানলাভ হয় এবং যদি তপ, বৈরাগ্য ও যোগযুক্ত শ্রবণাদি অনুষ্ঠিত হয়, তবে প্রেমফল লাভ হয়। আর উক্ত পঞ্চাঙ্গ ব্যতীত কেবল শ্রবণকীর্ত্তনাদির যে পরমপুরুষার্থসাধকত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা ভগবানের মাহাত্ম্যই নিরূপিত হয়। (ঐ ১০৩)।

১০। সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের গুণালাপ, তাঁহার নামোচ্চারণ, আদরের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাধন। শঙ্খচক্রাদি চিহ্নধারণ, তিলকের দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, কণ্ঠে শ্রীতুলসীকাষ্ঠ-মালা ধারণ, অবিদ্ধা একাদশীব্রত, কৃষ্ণজন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত উদ্‌যাপন গৃহস্থগণের পক্ষেও বিশেষ কর্ত্তব্য। সমস্ত বর্ণিগণের পক্ষেই তীর্থপর্য্যটন শ্রেষ্ঠ। পাচটি অবস্থায় তীর্থপর্য্যটনের উপকারিতা আছে—(১) মানসিক অশান্তি, (২) শ্রীহরির অর্চ্চনে অযোগ্যতা, (৩) বিঘ্ন বা প্রতিকূল অবস্থার সম্ভাবনা, (৪) সাংসারিক কর্ত্তব্যের বাহুল্য, (৫) স্বপরের দ্বারা নির্য্যাতিত হইবার আশঙ্কা। এই সকল ব্যাপারে সাধক স্থিরচিত্তে হরিসেবা করিতে পারেন না, সুতরাং তীর্থপর্য্যটনে চিত্তশুদ্ধি ও হরিসেবার সুযোগ হইতে পারে। (ঐ ২৪৬, ২৪৭)।

১১। সর্ব্বাত্মদ্বারা গৃহ ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া একাত্মভাবে হরিভজন করাই শ্রেয়ঃ। যদি তাহা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। অহৈতুকভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা আদরের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও বৃত্তির জন্য ভাগবতপাঠ করিবে না। কোন ক্রমেই শ্রীমদ্ভাগবত পঠন-পাঠনকে জীবিকায় পরিণত করিবে না। (ঐ ২৫১-২৫৪)।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত; শিক্ষায়, দীক্ষায় শিক্ষিত, দীক্ষিত, নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য-গোস্বামি-পাদগণ ব্রহ্ম-সূত্রপ্রণেতা শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীব্যাসদেবের প্রকটিত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বতঃসিদ্ধভাষ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত হইলেই আদরণীয়। যে সকল ভাষ্য শ্রুতির সহিত সমন্বয়কারী শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত নহে, সেই সকল মত স্বকপোলকল্পনাবলে যতই বলিষ্ঠ ও দিগ্বিজয়ী হউক না কেন, উহাদিগকে অর্ব্বাচীন-ব্যক্তিগত-মতবাদ ব'লয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। শ্রীব্রহ্মসূত্র-মধ্যে স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবও যে স্থানে তাঁহার নিজ মত প্রকাশ করা অথবা অন্যান্য আচার্য্যগণের মতের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে যথাক্রমে নিজনাম ও অপরাপর আচার্য্যগণের নামোল্লেখ করিয়া তত্তৎ মতসমূহের প্রচার করিয়াছেন। অবশ্য তাহা বেদের অনুগত হইলে স্বীকার করিয়াছেন। আর যে স্থানে একমাত্র শ্রুতিসমূহেরই মীমাংসা করিয়াছেন, তথায় সূত্রসমূহের দ্বারাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য হইতে শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু-প্রমুখ ভাষ্যকারগণের মতবাদ কল্পনা-জগতে এক একটি পরস্পর প্রতিযোগী প্রতিভাময়ী চিন্তাধারারূপে উদ্ভূত হইয়াছিল। ভাগবত-গৌড়ীয়-দর্শনে সেরূপ কল্পনাপ্রতিভাময়ী চিন্তাধারার কোন প্রকার গন্ধ মাত্রও প্রকাশিত হয় নাই; উহাতে সনাতন শ্রৌত-সিদ্ধান্তের অব্যভিচারী অনুসরণ আছে। এই অনুসরণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তাহাই ইহার মৌলিকতা। ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন সেই শ্রৌত-মৌলিকতা-সম্পদ্ লইয়াই সমস্ত মতবাদাচার্য্যগণের মতকে সুসমন্বিত করিয়া শ্রীব্যাসদেবের হৃদ্গত-তাৎপর্য্যের পথে অভিগমন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে গতানুগতিক ভাষ্যকার-গণের সহিত এক পর্য্যায়ে গণনা না করিয়া শ্রীবেদব্যাসকৃত স্বতঃসিদ্ধভাষ্যের ব্যাখ্যাকারীরূপে গ্রহণ করাই সমীচিন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত শ্রীভাগবতামৃত, শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ, শ্রীক্রমসন্দর্ভ, শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তেরই অব্যভিচারী অনুসরণ ও অনুসন্ধানমূলক শ্রৌতভাষ্য। তাহাতে অন্যান্য মতবাদাচার্য্যের মতকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন না করিয়া শ্রীশঙ্করভাষ্য পর্য্যন্তও যাহা শ্রীমদভাগবত-সিদ্ধান্তের অনুকূল, তাহাও গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীশঙ্কর-রামানুজ-ভাষ্যাদির ন্যায় শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ ও শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী প্রভৃতি গৌড়ীয়াচার্য্যগ্রন্থমালা বিদ্বৎসমাজে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয় নাই। স্বল্পসংখ্যক গবেষকগণ যে প্রণালীতে ঐ সকল গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, সেই প্রণালী ঐ সকল সিদ্ধান্ত উপলব্ধির অর্গলস্বরূপ। ঐ জাতীয় পাঠককে গ্রন্থকারগণ শপথপ্রদান করিয়াছেন। সেই শপথ অমান্য করিয়া ঐ সকল গ্রন্থ যাহারা আলোচনার অভিনয় করিয়াছেন তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন।

তুলনামূলক-আলোচনা

আচার্য্যগণের মতবাদ বা সিদ্ধান্ত

শ্রীশঙ্করাচার্য্য—কেবলাদ্বৈত-বাদ নামান্তর বিবর্ত্তবাদ, মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষ-বস্ত্বৈক্যবাদ; ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব; জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত- (কারণে মিথ্যা-কার্য্য-প্রতীতি) মাত্র; ভ্রমসংঘটন-কারিণী অনির্ব্বাচ্য মায়ার দ্বারা ব্রহ্মে 'জগৎ'-ভ্রান্তি; 'জগৎ'—মিথ্যা, মরীচিকা, মায়ামাত্র। (শাঃ ভাঃ ১।১।১, ২।১।১৫, ৩।২।২৫-৩০)।

শ্রীভাস্করাচার্য্য—ঔপাধিক বা ঔপচারিক ভেদ-অভেদবাদ। [ব্রহ্ম কারণরূপে 'অভিন্ন', কার্য্যরূপে 'ভিন্ন'; কার্য্যরূপটি 'ঔপাধিক' (আদি ও অন্তের মধ্যে অল্পস্থায়ী অবস্থা); জীব, জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদই 'স্বাভাবিক', ভেদ 'ঔপাধিক' (সাময়িক)] (সূত্রভাষ্য ১।১।৪, ২।১।১৮, ২২; ৩।২।১১, ২৬-৩০; ৪।৪।৪)।

শ্রীরামানুজাচার্য্য—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ [স্থূল (সৃষ্টি-কালীন), চিৎ (জীব) ও অচিৎ-(জড়বর্গ), সূক্ষ্ম (প্রলয়কালীন), চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব অথবা নানাত্ব-(জীবজগৎ) বিশিষ্ট অদ্বৈত (অদ্বয়-ব্রহ্ম)] (শ্রীভাষ্য ১।১।১); শ্রীনিবাসাচার্য্য-কৃত 'যতীন্দ্রমতদীপিকা'—"চিদচিদ্বিশিষ্টাদ্বৈতং তত্ত্বম্ ।"

শ্রীমধ্বাচার্য্য—শুদ্ধদ্বৈতবাদ নামান্তর স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ, স্বাভাবিক ভেদবাদ, কেবল ভেদবাদ, তত্ত্ববাদ—'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র' ভেদে দ্বিবিধ তত্ত্ব—স্বতন্ত্রতত্ত্ব 'ঈশ্বর' হইতে পরতন্ত্র তত্ত্বসমূহের নিত্য 'ভেদ'; 'জীবে-ঈশ্বরে, জীবে-জীবে, ঈশ্বরে-জড়ে, জীবে-জড়ে, জড়ে-জড়ে'—এই পঞ্চ 'ভেদ' বা 'দ্বৈত' নিত্য, সত্য ও অনাদি]। (তত্ত্ববিবেক ১ম শ্লোক, মহাভারত-তাৎপর্য্যনির্ণয় ১।৭০-৭১; বিষ্ণুতত্ত্ব নির্ণয়ে পরমশ্রুতি)।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য—বাস্তব বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ [ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ ও ধর্ম্মতঃ ভিন্নাভিন্ন; এই 'ভেদ' ও 'অভেদ' সমভাবে সত্য (বাস্তব); নিত্য অবিরুদ্ধ ও স্বাভাবিক] (নিম্বার্কভাষ্য ১।১।৪, ২।৩।৪২, ৩।২।২৭-২৮)।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ [ঈশ্বরের শুদ্ধত্ব এবং ভগবত্তত্ত্বের ও ভজনকারিগণের শুদ্ধত্ব, নিত্যত্ব স্বীকার-পূর্ব্বক জীব, জগৎ ও মায়ার তদাশ্রয়স্বরূপে অদ্বয়ত্ব]। (ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬ ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য)।

শ্রীধরস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বা বাস্তববস্ত্বৈক্যবাদ [কেবলাদ্বৈতবাদের বা নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদের (মায়াবাদের) অশুদ্ধত্ব (মায়াশ্রয়ত্ব) শোধনপূর্ব্বক পরমার্থভূত (বাস্তব) বস্তুর সহিত তদংশভূত জীব, তৎকার্য্যভূত জগৎ ও তচ্ছক্তিস্বরূপ মায়ার অদ্বয়ত্ব] (ভাবার্থদীপিকা ১।১।২)।

শ্রীবল্লভাচার্য্য—শুদ্ধ-ব্রহ্মবাদ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ [কার্য্যের মিথ্যাত্বের আশ্রয়ে কার্য্যকারণের অভেদবাদ নিরসনপূর্ব্বক কার্য্যকারণরূপ শুদ্ধব্রহ্মের অভেদত্ব বা অদ্বয়ত্ব]। (অনুভাষ্য) ১।৪।২৮ শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য-কৃত 'ভাষ্যপ্রকাশ'-নামক 'অনুভাষ্য'-টীকা, উপক্রম ৪, উপসংহার ২, শ্রীবালকৃষ্ণভট্টবিরচিত 'প্রমেয়রত্নার্ণবে প্রপঞ্চবিবেক,।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ—(অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ অচিন্ত্য-শক্তিশালী স্বয়ংসিদ্ধ ত্রিবিধ-ভেদরহিত অদ্বয়তত্ত্বের (পরতত্ত্বের) শক্তি-বৈচিত্র্য ও শক্তিপরিণত বস্তুবৈচিত্র্যের সহিত পরতত্ত্বের অচিন্ত্য (শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণগম্য বা শব্দপ্রমাণগম্য) যুগপৎ 'ভেদ' ও 'অভেদ']। (ভগবৎসন্দর্ভ ৪-১৬ অনু; সর্ব্বসম্বাদিনী, বঃ সাঃ পঃ সং; ৩৬-৩৭ পৃঃ ও ১৪৯ পৃঃ)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ ["জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ।" 'ঈশ্বর' মায়াধীশ ও 'জীব' মায়াবশযোগ্য; সুতরাং ঈশ্বর ও জীবে 'ভেদ'; আবার জীব অদ্বয়পরতত্ত্বের 'শক্তি' বলিয়া তাঁহার সহিত 'অভেদ'; উভয়ের 'ভেদাভেদ'-সম্বন্ধ] চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮; আঃ ৫।৮৬-৮৯, মঃ ৬।১৬২-৬৩)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ ["ততো ভিন্নত্বেনাভিন্নত্বেনাপি ব্যপদিশ্যতে" ('সারার্থ-দর্শিনী,' ২।৯।৩৩; ১০।৮৭।৩২); "চিদ্রূপত্বেন শক্তিমত্ত্বেনৈক্যাৎ তয়োর্ভেদোঽপ্যল্পমাত্রঃ স্বল্পভেদো বর্ত্তত এব" (ঐ ১১। ২২।১০-১২; ঐ ১।২।১১); "ব্যষ্টিরূপেণ ভেদঃ সমষ্টিরূপেণাভেদঃ" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা মঃ ২০।১০৮)]

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ [পরতত্ত্বের দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী স্বাভাবিকী অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে রশ্মি পরমাণু-স্থানীয় জীব সূর্য্যস্থানীয় পরতত্ত্ব হইতে অপৃথক হইয়াও পৃথক্ ।] (শ্রীবলদেবকৃত তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা ৪৩ অনুচ্ছেদ)।

ইষ্ট

শ্রীশঙ্করাচার্য্য :—আত্মলিঙ্গ (শঙ্করাচার্য্য-কৃত 'নির্গুণ-মানসপূজা', ৯, ১৯ শ্লোক)।

শ্রীভাস্কর—সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণ "ব্রহ্ম" (দ্রঃ ভাঃ, ৩।২।১১, ৩।৩।১)।

শ্রীরামানুজাচার্য্য—শ্রীনিবাস বা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ (শ্রীভাষ্য, 'মঙ্গলাচরণ')।

শ্রীমধ্বাচার্য্য—শ্রীরমাপতি "ইষ্টো নো রমাপতিঃ" ('তত্ত্বোদ্যোত'), শ্রীবালগোপাল।

শ্রীনিম্বার্ক—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ (স্বকীয়) [বেদান্তকামধেনু ৪—৫ শ্লোক]।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী—শ্রীনৃপঞ্চাস্য (সঃ দঃ সং ২৬ অনু-ধৃত সাকার-সিদ্ধি)।

শ্রীধরস্বামী—শ্রীনৃহরি (ভাঃ দীঃ 'মঙ্গলাচরণ' ১ শ্লোক ; ঐ ১০।৮৭ অঃ মঙ্গলাচরণ, ঐ ১০।৮৭।২৩-২৪, ২৯-৩২-৩৭ ইত্যাদি)।

শ্রীবল্লভাচার্য্য—বালগোপাল, শ্রীযশোদোৎসঙ্গ-লালিত পরমতত্ত্ব 'শ্রীকৃষ্ণ' (অনুভাষ্য)।

শ্রীজীবপাদ—শ্রীরাধাদামোদর (শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোপীনাথ), 'অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিশালী নিত্যলীল নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীরাধামদনমোহন-শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোপীনাথ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীগোকুলানন্দ (শ্রীরাধাগোবিন্দ)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—শ্রীশ্যামসুন্দর (গোঃ ভাঃ ৪।৩ মঙ্গলাচরণ, সিদ্ধান্তরত্ন ১)

শাস্ত্র বা প্রমাণ

শ্রীশঙ্করাচার্য্য—শ্রুতি ও অনুভূতিই প্রমাণ (সূঃ ভাঃ ১।১।২), শ্রুতির অনুকূল তর্ক ও প্রমাণ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি—এই ছয়টি প্রমাণং তন্মধ্য শ্রুতিরূপ 'শব্দ'-প্রমাণই প্রবল (সূঃ ভাঃ) ১।১।২); প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি (দশোপনিষৎ), ব্রহ্মসূত্র, গীতা, ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম—এই প্রস্থানত্রয় ; তন্মধ্যে শ্রুতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

শ্রীভাস্কর—কেবল শাস্ত্রই প্রমাণ (সূঃ ভাঃ ১।১।২-৪); প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা।

শ্রীরামানুজ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ ; প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ; শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও সাত্বত পঞ্চরাত্রসমূহ।

শ্রীমধ্বাচার্য্য—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। প্রত্যক্ষ চারিপ্রকার—(১) ঈশ-প্রত্যক্ষ ; (২) লক্ষ্মী-প্রত্যক্ষ, (৩) ব্রহ্মাদি-যোগে প্রত্যক্ষ, ও (৪) মনুষ্যাদিপ্রত্যক্ষ ; আগম—(১) অপৌরুষেয়—বেদ, উপনিষৎ ইত্যাদি ও (২) পৌরুষেয়—ইতিহাস, পুরাণ, পঞ্চরাত্র। প্রমাণ-শাস্ত্র—বেদ, মহাভারত, মূল-রামায়ণ, পঞ্চরাত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা (মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।৩০—৩২ ; গীঃ ভাঃ, ২য় অঃ ; সূঃ ভাঃ ১।১।১)।

শ্রীনিম্বার্ক—শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। (বেঃ পাঃ সৌঃ ১।১।৪); প্রমাণ-শাস্ত্র—বেদ, শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীগীতা শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী—শব্দ প্রমাণ। প্রমাণ-শাস্ত্র শ্রুতি; ব্রহ্মসূত্র, শ্রীনৃসিংহপূর্ব্বতাপনী, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।

শ্রীধরস্বামী—শব্দ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ। প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীনৃসিংহপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি।

শ্রীবল্লভ—আপ্তবাক্য বা শব্দ প্রমাণ—(১) বেদ (ব্রাহ্মণ ও শ্রুতি), (২) ব্রহ্মসূত্র (৩) শ্রীগীতা, (৪) শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীবল্লভাচার্য্য এই চারি প্রস্থান স্বীকার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১) লোকভাষা, (২) পরমত-ভাষা ও (৩) সমাধি ভাষা ; সমাধিভাষাই প্রমাণমধ্যে গণ্য (তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধে শাস্ত্রার্থপ্রকরণ, ৭)।

শ্রীজীবপাদ—শব্দই মূলপ্রধান "শব্দ এব মূলং প্রমাণম্" (সর্ব্বসম্বাদিনী, ৫ পৃঃ); শব্দ-প্রমাণশিরোমণি

শ্রীমদ্ভাগবত (তত্ত্বসন্দর্ভ)। প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি, বেদান্তসূত্র, শ্রীগোপালতাপনী উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা, শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র, শ্রীমদ্ভাগবতানুগ-শাস্ত্রসমূহ, পুরাণ, ইতিহাস।

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ—ঐ চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৮৯-৯৮)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঐ, সর্ব্ববেদান্তসার নিখিলপ্রমাণচক্রবর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবত (মাধুর্য্যকাদম্বিনী ১।৩)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ। তন্মধ্যে শ্রুতিই মুখ্য প্রমাণ (প্রমেয়-) রত্নাবলী, ৯) ; প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ; শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম, শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাষ্যের নাম

শ্রীশঙ্কর—শারীরক-ভাষ্য (পৃথক্ বিশেষ নাম নাই)—'শঙ্করভাষ্য' নামে খ্যাত। (শরীরাধিষ্ঠিত জীব বা শরীর-ভবসুখদুঃখ—'শারীরক' (ভাঃ ৩।৩১।১৯) নামে অভিহিত তৎসম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্তসার সূত্রসমূহ শারীরকসূত্র বা শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্য)।

শ্রীভাস্কর—শারীরক-মীমাংসাভাষ্য পৃথক্ বিশেষ নাম নাই)—'ভাস্করভাষ্য' নামে খ্যাত।

শ্রীরামানুজ—শ্রীভাষ্য। **শ্রীমধ্বাচার্য্য**—(১) শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা সূত্র-ভাষ্য (সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ) ; (২) অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান (শ্লোকাকারে রচিত); (৩) অণুভাষ্য (শ্লোকাকারে অধিকরণ-তাৎপর্য্য)।

শ্রীনিম্বার্ক—বেদান্ত-পারিজাতসৌরভ। **শ্রীবিষ্ণুস্বামী**—সর্ব্বজ্ঞসূক্তি। **শ্রীধরস্বামী**—(নিজকৃত কোন ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য নাই)।

শ্রীবল্লভ—অণুভাষ্য। **শ্রীজীবপাদ**—বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও তদ্ভাষ্যভূত 'ক্রমসন্দর্ভ' ও 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ', 'সর্ব্বসম্বাদিনী'। **শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ**—শ্রীমদ্ভাগবত (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৯৮)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি—শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—শ্রীগোবিন্দভাষ্য।

'তত্ত্বমসি'র ব্যাখ্যা'

শ্রীশঙ্করাচার্য্য—জহদজহল্লক্ষণা-(যে লক্ষণায় কোন শব্দের মুখ্য অর্থের একটি অংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য-অংশ গ্রহণ করা হয়, উহাকেই জহদজহৎ স্বার্থা বলে) বলে, 'তৎ'পদার্থ (ঈশ্বর) ও 'ত্বম্'পদার্থ (জীব) নির্ব্বিশেষ নির্গুণ পরব্রহ্ম, 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদদ্বয়ের সমানাধিকরণ্যরূপ সম্বন্ধ ; অতএব জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য (শঙ্করাচার্য্য-কৃত 'তত্ত্বোপদেশ')।

শ্রীভাস্কর—ব্রহ্মাত্মত্বের উপদেশক (সুঃ ভাঃ ২।৩।২৯)। "তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যং স্বরূপাববোধকম্" (সুঃ ভাঃ ১।১।১)।

শ্রীরামানুজ—'ত্বম্' পদে জীব-শরীরক (জীব যাঁহার শরীর-স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম ; জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন 'ত্বম্' পদবাচ্য 'জীব' ও 'তৎ-পদবাচ্য ব্রহ্মের 'অভেদ' (শ্রীভাষ্য)।

শ্রীমধ্বাচার্য্য—"স আত্মাতত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।১৬)=স আত্মা+অতত্ত্বমসি। অতএব 'ভেদ'—"অতত্ত্বমসীতি ভেদস্য নবকৃত্বোঽভ্যাসাচ্চ। ভেদব্যপদেশাৎ।" "অতত্ত্বমসি পুত্রেতি য উক্তো গৌতমেন তু। নবকৃত্বঃ সদৃষ্টান্তং সর্ব্বভেদেন কেশবঃ॥" (মধ্ব-কৃত ছান্দোগ্য-ভাষ্য ৬।১৬) ; "তস্য ত্বমসি=তত্ত্বমসি", "অসিনা তত্ত্বমসিনা পর-জীব-প্রভেদিনা। বিদ্যারণ্যমহারণ্যমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ॥" (মধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রসিদ্ধ শ্লোক)।

শ্রীনিম্বার্ক—'তত্ত্বমসি'—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা-জ্ঞাপক, কিন্তু সাম্যজ্ঞাপক নহে, অতএব ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সমর্থক। (সুঃ ভাঃ ২।৩।৪২)।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী—কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই।

শ্রীধরস্বামী—'তৎ'-পদার্থ (বৃহচ্চৈতন্য) ও 'ত্বম্'-পদার্থ (অণুচৈতন্য)—এই উভয় পদের বৃহত্ত্ব ও অণুত্বরূপ বিরুদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া 'জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা'র দ্বারা কেবল চৈতন্যরূপ অর্থদ্বয়ের সমানাধিকরণ্যহেতু নির্গুণ ব্রহ্মেই 'তত্ত্বমসি'র পরিসমাপ্তি (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।২)।

শ্রীবল্লভ—অমাত্যে রাজপদ-প্রয়োগবৎ প্রজ্ঞা-দ্রষ্ট্রাদি ব্রহ্মগুণসারসম্পন্ন জীবে জড়বৈলক্ষণ্যকারী 'তত্ত্বমসি' বাক্য (অনুভাষ্য ২।৩।২৯); 'তত্ত্বমসি' শ্রুতির এই খণ্ডিতাংশ মাত্র মহাবাক্য নহে, পরন্তু "ঐতদাত্ম্যমিদং·······তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এই সম্পূর্ণ বাক্যই 'মহাবাক্য'; তদ্দ্বারা জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব, সত্যত্ব এবং জীব ব্রহ্মের অভিন্নত্ব (সাম্যত্ব নহে) জ্ঞাপিত হইতেছে।

শ্রীজীবপাদ—তদংশভূত চিদ্রূপত্বে সমানাকারতা (তত্ত্ব-সন্দর্ভ), 'ত্বম্'পদার্থ-দ্বারা লক্ষিত 'জীবাত্মার চিদ্ধর্ম্মযুক্ততা ও নিত্যতা এবং 'তৎ'পদার্থ-দ্বারা লক্ষিত 'পরমাত্ম'ারও তাদৃশত্ব অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপতা ও নিত্যতা 'তত্ত্বমসি' বাক্যে বোধিত। (তত্ত্বসন্দর্ভ ৫২ অনু)। "অত্ত্বমসীত্যাদি শাস্ত্রমপি তৎপ্রেমপরমেব জ্ঞেয়ম্। ত্বমেবামুক ইতিবৎ" (প্রীতি সন্দর্ভ ১ অনু)—'তুমি অমুক' এই উক্তির দ্বারা 'তুমি' পদের বাচ্যের সহিত সম্বন্ধ-সূচনার ন্যায় 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ' পদের বাচ্যের সহিত 'ত্বম্' পদের বাচ্যের প্রেমপর সম্বন্ধ সূচিত।

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ—'তত্ত্বমসি' বাক্য জীবের চিন্ময়-সত্তাবোধক ও বেদের 'প্রাদেশিক' বাক্য মহাবাক্য নহে—'প্রণবই' মহাবাক্য ; "প্রণব যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি। প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি ॥ **"তত্ত্বমসি" জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য।** 'প্রণব না মানি' তারে কহে মহাবাক্য ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৪-৭৫)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—'তত্ত্বমসি' জীব ও ব্রহ্মের 'ভিন্নাভিন্ন'ত্ব-নিদর্শক (সাঃ, দঃ ১০।৮৭।৩২); রাজার সম্বন্ধবশতঃ 'রাজপুরুষ' উক্তির ন্যায় 'ত্বং'পদার্থ-বাচ্য জীব 'তৎ'পদার্থবাচ্য পরমেশ্বরের সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ; কেহ কেহ 'তস্য' (তাঁহার) 'ত্বম্' (তুমি) ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস দ্বারা 'তত্ত্বম্' পদের বিশ্লেষ করেন,—রাজকীয়-পুরুষোঽপি রাজপুরুষ ইতি তৎ-পদার্থসম্বন্ধী ত্বম্পদার্থ ইতি 'তত্ত্বমসি' ইতি মহাবাক্যার্থং কেচিত্তু তস্য ত্বমিতি ষষ্ঠীতৎপুরুষেণাপি বদন্তি"। (সাঃ দঃ ১০।৮৭।৩২)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—ব্রহ্মসাম্যই 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের উপদেশ্য, ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ ভেদরাহিত্য নহে (সিঃ রঃ ৬।২২); ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদি-দ্বারা ভেদেই 'অভেদ'জ্ঞানবোধক ; ব্রহ্মাধীন বলিয়া 'ব্রহ্মাভিন্ন' এই অভেদবাদ ভক্তিরই প্রকারবিশেষ, ভূতশুদ্ধিবৎ 'ভক্তিযোগে'রই প্রকাশবিশেষ ; 'সচ্চিদানন্দাকারোঽস্মি' (গোঃ ভাঃ ৩.৩।৪৬ ; তত্ত্বসন্দর্ভ টীকা ৪৩ অনু)।

আচার্য্যগণের-সিদ্ধান্তগত ঐক্য, অনৈক্য ও বৈশিষ্ট্য

১। শ্রীশঙ্কর, শ্রীভাস্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীশ্রীধর, শ্রীবল্লভ ও শ্রীজীবগোস্বামিপাদ—এই আটজন আচার্য্যের যে-যে বৈদান্তিক সিদ্ধান্তে **মিল** আছে, তাহা এই :—(১) ব্রহ্ম—'নিত্য ও সত্য'; (২) ব্রহ্ম—'পরতত্ত্ব', (৩ ব্রহ্ম—'জগৎ-কারণ', (৪) শব্দই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ; (৫) ব্রহ্ম—সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ ; (৬) আনন্দই প্রয়োজন।

(২) অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্য হইতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতবাদের নিম্নলিখিত **পার্থক্য** দৃষ্ট হয়—(১) অনির্ব্বচনীয়া মায়াদ্বারা ব্রহ্মের ঔপাধিক ভাব (ঈশ্বর, জীব ও জগতের ব্যবহারিক সত্তা); (২) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই 'পারমার্থিক' সত্য, সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্ম 'ব্যবহারিক' সত্য ; (৩) 'পারমার্থিক ও 'ব্যবহারিক' এই দুইটি শব্দের দ্বারা নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ শ্রুতির সঙ্গতি সাধন, (৪) জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, সুতরাং 'মিথ্যা' (সত্যজ্ঞানের দ্বারা বাধিত); (৫) মায়োপহিত চৈতন্যই—ঈশ্বর এবং অবিদ্যোপহিত চৈতন্যই—জীব , ঈশ্বর

—সমষ্টি উপাধি, জীব—ব্যষ্টি উপাধি ; (৬) ঈশ্বর ও জীব উভয়ই প্রতিবিম্ব-স্থানীয় ; (৭) ব্রহ্ম কেবল সত্য, কেবল জ্ঞান, কেবল আনন্দ-স্বরূপ ; (৮) ঈশ্বর মায়াযোগে অবতার গ্রহণ করেন, (৯) জ্ঞানই 'সাধন' এবং ব্রহ্মস্বরূপ-উপলব্ধিই (চিন্মাত্র উপলব্ধি) সাধ্য।

৩। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্য হইতে **শ্রীরামানুজাচার্য্যের বৈশিষ্ট্য**—(১) স্থূল চেতন ও অচেতন এবং সূক্ষ্ম-চেতন ও অচেতন-বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব ; (২) ব্রহ্ম শরীরী ও বিশেষ্য, জীবজগৎ শরীর ও বিশেষণ ; (৩) জীব ব্রহ্মের গুণ বা বিশেষণরূপে ব্রহ্মের অংশ, (৪) শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ।

৪। শ্রীরামানুজের সহিত শ্রীনিম্বার্কের মতে যে-যে অংশে **মিল** আছে, তাহা এই—(১) উভয়ই ত্রিতত্ত্ব-বাদী, (২) উভয়ের মতেই ব্রহ্ম স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত হইয়াও 'স্বগতভেদ'-যুক্ত, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের স্বগতভেদ ; (৩) উভয়ের মতেই ব্রহ্ম জগতের 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান'-কারণ, (৪) উভয়ের মতেই জীব ও জগৎ ব্রহ্মের 'পরিণাম', (৫) উভয়ের মতেই ব্রহ্ম 'সগুণ' ও 'সবিশেষ' ; (৬) উভয়ের মতেই জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্ত্তা, ভোক্তা, নিত্য, অণু-পরিমাণ, সংখ্যায় বহু ও অনন্ত এবং প্রকার-ভেদে 'বদ্ধ' ও 'মুক্ত'; (৭) উভয়ের মতেই অচিৎ তিন প্রকার—'প্রাকৃত', 'অপ্রাকৃত' ও 'কাল', (৮) প্রকৃতি ব্রহ্মের 'অচিৎ'-শক্তি, প্রকৃতি হইতে জাত 'প্রাকৃত' অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-চরাচর। শ্রীনিম্বার্কের 'অপ্রাকৃত' ও শ্রীরামানুজের 'শুদ্ধসত্ত্ব' প্রায় এক। ইহা ব্রহ্ম ও মুক্তাত্মাগণের দিব্যদেহ ও ভগবদ্ধামস্থ দ্রব্যের উপাদান-কারণ। উভয়ের মতে কাল অংশবিহীন, নিত্য ও বিভু।

৫। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্য হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতবাদের পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য—(১) শ্রীমধ্বাচার্য্য কেবল-ভেদবাদী, তিনি 'জীবে ঈশ্বরে, জীবে জীবে, ঈশ্বরে জড়ে, জীবে জড়ে ও জড়ে জড়ে'—এই পঞ্চভেদ স্বীকার করেন, (২) ইনি ব্রহ্মকে 'নিমিত্ত-কারণ' মাত্র বলেন, 'উপাদান-কারণ' নহে। (৩) সহজ মুক্তি সম্বন্ধে ইহার মতে 'দেব ও গ্রহাদি মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া পুরুষশরীরকৃত সুখ-দুঃখাদি যেরূপ ভোগ করে, তদ্রূপ জীব আত্মবিম্বরূপ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

৬। অন্যান্য আচার্য্য হইতে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের বৈশিষ্ট্য—(১) শ্রীজীবপাদ পরব্রহ্মকে একমাত্র স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্বরূপে 'স্বজাতীত-বিজাতীয়-স্বগতভেদ'-রহিত এবং স্বরূপাখ্য-জীবাখ্য-মায়াখ্য-শক্তির আশ্রয়রূপে 'অদ্বয়তত্ত্ব বলেন ; এক অদ্বয়তত্ত্বই তাঁহার অদ্বিতীয়া অচিন্ত্যা স্বভাবিকী শক্তিবৈচিত্রীক্রমে স্বস্বরূপে (পূর্ণ-ভগবৎস্বরূপে), স্বরূপ-বৈভবে (গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি-ধামরূপে), জীব-(শুদ্ধজীব) রূপে ও প্রধান- (মায়াশক্তির উপাদানাংশ) রূপে চতুর্ব্বিধ অবস্থায় সর্ব্বদা অবস্থিত। (২) ব্রহ্মের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিতে তিনি স্বয়ংরূপ 'শ্রীকৃষ্ণ' ; জ্ঞানিগণের ব্রহ্মপ্রতীতি 'অসম্যক'; যোগিগণের পরমাত্ম-প্রতীতি 'আংশিক' ও ভাগবতগণের ভগবৎ-প্রতীতি 'পূর্ণ' ; পরতত্ত্বের পূর্ণতম আবির্ভাবই—শ্রীকৃষ্ণ। পরতত্ত্বের দ্বিবিধ আনন্দ—(ক) তাঁহার স্বরূপের আনন্দ ও (খ) স্বরূপশক্তির আনন্দ। স্বরূপশক্ত্যানন্দে অধিক বিলাস ও বৈচিত্র্য। (৩) ইনি পরমাত্মার শক্তিপরিণামবাদী, বস্তু-পরিণামবাদী নহেন ; জগৎ পরমাত্মার বহিরঙ্গা শক্তির পরিণাম। (৪) মায়িক ব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মার মায়াশক্তির পরিণতি, জীব পরমাত্মার জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তির পরিণতি, এবং চিন্ময় ভগবদ্ধামাদি ও তত্রত্য লীলাদি পরতত্ত্বের চিচ্ছক্তির (স্বরূপশক্তির) পরিণতি। (৫) জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশই জীবাত্মা ; জীব তটস্থাশক্তি অর্থাৎ জীব স্বরূপশক্তিও নহে, মায়াশক্তিও নহে, তন্মধ্যবর্ত্তী একটি শক্তিবিশেষ। (৬) ঈশ্বরের শক্তিই জগতের মুখ্য উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ এবং জীবমায়া গৌণ-নিমিত্তকারণ ও গুণমায়া (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি) গৌণ উপাদান-কারণ। (৭) শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ ও ভেদ। (৮) শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্যে শুদ্ধব্রহ্মবাদ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের নিম্নলিখিত প্রধান পার্থক্যসমূহ দৃষ্ট হয় ঃ—

(১) শ্রীশঙ্করাচার্য্য 'জীব' ও 'জগতে'র মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপন করেন। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই (কারণ) মায়িক উপাধি-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ (প্রতীয়মান) সত্য জীব ও জগদ্রূপ (কার্য্য) দ্বৈতভাবসৃষ্টি করে।

(১) শ্রীবল্লভাচার্য্য ব্রহ্মের (কারণের) ন্যায় জীব ও জগতের (কার্য্যের) নিত্য সত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া মায়িক উপাধিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহার মতে ব্রহ্মের (কারণের) অদ্বিতীয়ত্ব-স্থাপনের জন্য জীব ও জগতের (কার্য্যের) মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্মের মায়িক উপাধি-গ্রহণের (অশুদ্ধতার) কোনই প্রয়োজন নাই। মায়িক উপাধিরহিত শুদ্ধব্রহ্মই তাঁহারই ন্যায় নিত্য সত্য, জীব ও জগতে পরিণত হইয়া এক অদ্বিতীয় তত্ত্বরূপে অবস্থান করেন। জীব ও জগৎ ব্রহ্মই, তাহা দ্বিতীয় বস্তু নহে, সুতরাং অদ্বয়ত্বের কোনই ব্যাঘাত হয় না।

(২) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দই 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল সৎ বা সত্তা, কেবল চিৎ বা জ্ঞান ও কেবল আনন্দ। (২) শ্রীবল্লভাচার্য্য-মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের 'স্বরূপ' ও 'গুণ'; তাহা ব্রহ্মেরই অবিভাজ্য স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল সত্তা নহেন, তিনি সত্তাবান্, কেবল জ্ঞান নহেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ; কেবল আনন্দ নহেন, তিনি আনন্দময়।

(৩) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে জগতের কারণ 'ব্রহ্ম' নহে,; মায়া অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, মায়াই সেই অসৎ বা ব্যবহারিক জগতের জননী।

(৩) শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য সত্য জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; 'মায়া' নিত্য সদ্বস্তুর কারণ হইতে পারে না।

(৪) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে সমস্ত ভেদপ্রতীতিই মিথ্যা, জগতের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য পারমার্থিক 'সত্য'; জগৎ ও জীব 'মিথ্যা'।

(৪) শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতে ব্রহ্মের ইচ্ছাসঞ্জাত ভেদ-প্রতীতি মিথ্যা নহে। ঘট-পটাদি বা জগৎ ও জীব —ব্রহ্মের বহুভবন-ইচ্ছা হইতে ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। সুতরাং তাহাদের সত্তা রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ বিবর্ত্ত বা মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎ নিত্য, সত্য, সংসার ('আমি', 'আমার'-অভিমান)—যাহা অবিদ্যাকৃত, তাহা মিথ্যা।

(৫) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে 'আত্মা' এক অদ্বিতীয়। (৫) শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতে আত্মা বহু ও অনন্ত।

(৬) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মা 'এক', আত্মার বহুত্বের প্রতীতি মিথ্যা। (৬) শ্রীবল্লভ-মতে 'ব্রহ্ম' সেচ্ছায় জীবরূপে প্রকটিত হ'ন, সুতরাং অনন্ত জীব সমস্তই সত্য।

(৭) শ্রীশঙ্কর-মতে আত্মাই 'ব্রহ্ম' বলিয়া তাহা 'বিভু'। (৭) শ্রীবল্লভ-মতে আত্মা কখনও 'ব্রহ্ম' নহে, ইহা অণু, কখনও বিভু নহে; তবে যখন আত্মা ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা ব্রহ্মের বিভুত্বগুণ লাভ করে।

(৮) শ্রীশঙ্কর-মতে ব্রহ্ম সগুণ নহেন, নির্গুণ; সগুণ ব্রহ্ম বা শবল ব্রহ্ম বা ঈশ্বর মায়াকৃত, তাহা ব্যবহারিক সত্যমাত্র অর্থাৎ মিথ্যা; উপাসনার জন্য সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা, সুতরাং, তাহা নির্গুণ ব্রহ্মের গৌণ প্রতীতি।

(৮) শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। প্রাকৃত রক্ত-মাংসের শরীর বা প্রাকৃত গুণরহিত বলিয়া ব্রহ্ম 'নির্গুণ, নামে অভিহিত এবং অপ্রাকৃত কল্যাণগুণগ্রামবিশিষ্ট বলিয়া তিনি 'সগুণ' নামে কথিত। ব্রহ্ম—সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়। সুতরাং একাধারে সগুণতা নির্গু'ণতা ব্রহ্মে সম্ভব। 'অপাণিপাদঃ' শ্রুতি তাঁহার প্রাকৃত পাণিপাদ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত হস্তপদ ও গুণের বিষয় কীর্ত্তন করেন।

(৯) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম 'কেবলজ্ঞান', তিনি জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় নহেন।

(৯) শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম কেবল মাত্র 'জ্ঞান' নহেন, তিনি সমস্তই ; আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ, রসাত্মক, সদানন্দ।

(১০) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে জগতের সৃষ্টি ও লয় মায়াকৃত।

(১০) শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতে ব্রহ্মের আবির্ভাব-শক্তিদ্বারা জগতের 'সৃষ্টি' এবং তিরোভাব-শক্তিদ্বারা জগতের 'লয়'। আবির্ভাব-শক্তি ব্রহ্ম হইতে নিত্য সত্য জগৎকে প্রকাশিত করেন এবং তিরোভাবশক্তি নিত্যসত্য জগৎকে ব্রহ্মে লীন করিয়া অপ্রকাশিত রাখে।

(১১) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে 'মোক্ষ' অর্থে চিন্মাত্রোপলব্ধি অর্থাৎ নাম-রূপবিহীন কেবল-বিশুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাত্ব-জ্ঞানরূপ দ্বৈতভাব বা মায়িক উপাধি বিনষ্ট হয়, তাহাই মোক্ষের সাধক।

(১১) শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতে ব্রহ্মের সহিত সংযোগ বা সাযুজ্যই 'মোক্ষ'; তদ্দ্বারা নামরূপবিহীন চিন্মাত্রস্বরূপ হইয়া যাইতে হয় না ; তাহা পরব্রহ্মে 'গুণাতীত প্রবেশ', সাক্ষাদ্ ভগবদ্ভজনোপযোগী ভগবদ্বিভূত্যাত্মক দেহেন্দ্রিয়-প্রাণান্তঃকরণ-জীবাত্মকস্বরূপ-প্রাপ্তি এবং পূর্ণানন্দাত্মক পুরুষোত্তমের সহিত মনোবাক্যের অবিষয় আনন্দের উপলব্ধি ও তদ্রূপ আনন্দময়তা-প্রাপ্তি। জীবের ব্রহ্মে লয়ের দ্বারা জীবত্বের নাশ হয় না। জীবে আনন্দময় পুরুষোত্তমের প্রবেশ হইলে শ্রীপুরুষোত্তম রসাত্মক বলিয়া জীবও আনন্দাত্মক হন এবং অন্তঃসাক্ষাৎকার ও বহিঃসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হন।

(১২) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সাধন।

(১২) শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতে 'ভক্তি'ই শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তি 'সাধন'-রূপা ও 'সাধ্য'রূপা ভেদে দ্বিবিধা। সাধ্যরূপা ভক্তিই 'প্রেমলক্ষণা' বা 'নির্গুণা' ভক্তি। ভক্তিপথে ভগবানের কৃপাই মুখ্য। কৃপা বা অনুগ্রহকেই 'পোষণ' বা 'পুষ্টি' বলে। ভক্তি বা কৃপার পথই 'পুষ্টিমার্গ'। যেখানে প্রীতি, সেখানে পুষ্টি অর্থাৎ ভগবদনুগ্রহ।

(১৩) শ্রীশঙ্করাচার্য্য শব্দপ্রমাণরূপে বেদ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীগীতাকে স্বীকার করেন। (১৩) শ্রীবল্লভ বেদ, ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও মদ্ভাগবতের সমাধিভাষা (ইঁহার মতে শ্রীভাগবতের ত্রিবিধ ভাষা (১) লোকভাষায় যুদ্ধ-বিগ্রহ-স্থান-কাল-পাত্রাদির বিষয় বর্ণিত) ; (২) পরমত-ভাষায় অপরের মত বিবৃত হইয়াছে ; (৩) 'সমাধিভাষা'য় (স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবের সমাধিতে উপলব্ধি বা সাক্ষাদ্দর্শন ভাষা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা অভ্রান্ত) এবং এই চারি প্রমানের অবিরোধী পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতিকে স্বীকার করেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্য ও শ্রীনিম্বার্ক হইতে শ্রীগৌড়ীয়সিদ্ধান্ত ও ভজনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য :—

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের অনুব্যাখ্যারূপ শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতকে যথাক্রমে সিদ্ধান্ত ও ভজনের প্রমাণ-গ্রন্থরূপে শ্রীরাম-রায়ের হস্তে প্রদান করেন। (১) সেই ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীব্রহ্মকৃত-গোবিন্দস্তবে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। (২) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ভজনরহস্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীস্বরূপরামরায়ের সহিত শ্রীনীলাচলে নিত্য আস্বাদন করিতেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যকে কেহ কেহ শ্রীবিল্বমঙ্গলের অধস্তন বুলিয়া স্থাপন করিলেও শ্রীবল্লভাচার্য্যের ভজন-প্রণালীতে সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের লীলামাধুর্য্যাস্বাদনবৈশিষ্ট্য বা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (৩) 'অনয়ারাধিতো নূনং' শ্লোকোক্ত মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার সর্ব্বোৎকর্ষের কোন সিদ্ধান্ত বা ভজনের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (ভাঃ ২।১০।৪) "পোষণং তদনুগ্রহঃ"—এই ব্যাক্যানুসারে কৃষ্ণানুগ্রহরূপা ভক্তিই শ্রীবল্লভ প্রকাশিত পুষ্টি-ভক্তি। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়রসিকগণের সিদ্ধান্তসম্মত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পুষ্টি-পরাকাষ্ঠার অধিকতর উৎকর্ষ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে (১৭ অনুঃ) শ্রীজীবপাদ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে ; —"পোষণেহপি তদেব মুখ্যং

প্রয়োজনম্। **পোষণ-শব্দেন হ্যনুগ্রহ উচ্যতে, তস্য চ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স্বপ্রীতিদান এব।**" স্বপ্রীতিদান একমাত্র স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার-শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যময়ী লীলায় প্রকটিত হইয়াছিল। স্বয়ং স্বরূপশক্তি শ্রীহ্লাদিনী ব্যতীত তাঁহার নিজস্ব বৃত্তিকে অপর কেহ স্বতন্ত্রভাবে দান করিতে পারেন না। সেই হ্লাদিনী বা মহাভাব-মিলিত-তনু শ্রীমাধবই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাবতার। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের শক্তিসঞ্চারিত ভক্তিরসাচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদের প্রকাশিত উন্নতোজ্জ্বলরসময় ভজনই গৌড়ীয়রসিকগণের আরাধ্য। পুষ্টি-পরাকাষ্ঠা বা হ্লাদিনী শক্তির কৃপাবাহন-স্বরূপ গৌড়ীয়মহতের কৃপৈকলভ্য। রাগানুগা ভক্তি। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বলেন,—

"অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা, বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা, স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্॥" (নিম্বার্ক-দশশ্লোকী ৫ম শ্লোক)

এইস্থানে জীবের সমস্ত ইষ্টফলদাত্রী শ্রীরাধিকার মধ্যে বৈধভাবেরই প্রাচুর্য্য প্রকাশিত। কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরানে বাখানে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮৭-৮)। "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দ, প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥" (ভাঃ ১০।৩০।২৮)—প্রভৃতি উক্তিতে যে শ্রীগোবিন্দানন্দিনী শ্রীরাধার সেবা-বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রীনিম্বার্ক-প্রচারিত শ্রীরাধাতে নাই। নিম্বার্কের আরাধ্যা শ্রীরাধা সম্ভ্রমজ্ঞানে পূজ্যা ও জীবের কামপ্রদাত্রী বা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া সঙ্গিনী বিশেষ।

ষষ্ঠ-প্রকাশ

সর্ব্বদর্শন-সমন্বয় কারক গৌড়ীয়-দর্শন।

(শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামিঠাকুরের উপদিষ্ট)

শ্রীগুরুতত্ত্ব:—যিনি এক জগদ্গুরু-মতবাদ পরিহার করিয়া, আম্নায়-পারম্পর্য্যাগত মহান্ত-জগদ্গুরুবাদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া, যাবতীয় কুরূপ অপসারিত করত রূপের রাজ্য প্রদর্শন এবং বাক্যে, চিন্তায় ও আচরণে সেই রাজ্যের সেবায় মহাসুযোগ প্রদান করেন, তিনি ক্ষণবিধ্বংসী রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ জানাইয়াছেন,—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছাবশতঃ মহান্তগুরুরূপে কৃপা পূর্ব্বক জীবের নয়নপথের পথিক হন, আবার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন। প্রকট-অপ্রকটভেদে উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই শিষ্যের নিয়ামকরূপে অবস্থান করিয়া বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন, শোধন করেন। তিনি মূকে কবিত্ব-শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন, তিনি পতিতকে উদ্ধার করিতে পারেন। তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম। তিনি নিজেকে গৌড়ীয় বলিয়া অভিমান করেন। কোন একটী প্রাকৃত স্থূল-দেশের অধিবাসী বলিয়া নিজকে মনে করেন না। শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দদেব ও শ্রীরাধাগোপীনাথ—এই তিন ঠাকুর যে গৌড়ীয়াকে আত্মসাৎ করিয়াছেন; তিনি সেই গৌড়ীয়ের পরিচয়ে পরিচিত। তাঁহাদের চরিত্র অলৌকিক। নিজেকে দৈন্যভরে 'গৌড়ীয়ের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দান করেন। তাঁহারা—আত্মবিৎ—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ। মহান্ত জগদ্গুরুবাদের বিচারে শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত নিজ-জন, পতিত জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হ'ন। তাঁহারা কর্ম্মবাদী নহেন, লীলাময়ের লীলার পার্ষদ বা সঙ্গী।

কর্ম্ম ও লীলার মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ। কর্ম্মের ভূমিকা—জগৎ, কর্ম্মের আধার—সূক্ষ্ম বা স্থূল উপাধি।

কর্ম্ম—অনিত্য, লীলা—নিত্য। কর্ম্ম—অস্বতন্ত্র জীবের ত্রিতাপ ভোগ বা দণ্ড, আর লীলা—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাপ্রসূত আনন্দময় ক্রীড়া। লীলার ভূমিকা—চতুর্দ্দশব্রহ্মাণ্ডাতীত বিরজা-ব্রহ্মলোকেরও অতীত বৈকুণ্ঠ ও গোলোক। লীলা—লীলাময়ের লীলাশক্তির ইচ্ছায় জগতে প্রকাশিত হইয়াও অতীন্দ্রিয় অবিচিন্ত্য স্বভাব-বশতঃ প্রাকৃতের সহিত লিপ্ত বা প্রাকৃতের অধীন নয়, ইহাই গৌড়ীয়-দর্শনের কথা।

গৌড়ীয় শ্রীগুরুদেব কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী বা কোন প্রকার অন্যাভিলাষী কিম্বা মিছাভক্ত নহেন। তাঁহারা লীলাপুরুষোত্তমের লীলার সঙ্গী এবং শিষ্য সেই শ্রৌত-শ্রীগুরুপাদপদ্মের কিঙ্কর। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় 'শ্রুতি' বা 'শ্রৌত'-শব্দের যে রূঢ়িবৃত্তি গ্রহণ করেন, অধোক্ষজের সেবক বিদ্বৎ-সম্প্রদায় 'শ্রুতি' বা 'শ্রৌত'-শব্দের সেইরূপ সাধারণ রূঢ়িমাত্র গ্রহণ করেন না। শ্রৌত-শ্রীগুরু-মুখ হইতে অবিবিশ্রভাবে সেবা-স্নিগ্ধ-শিষ্যের বিশুদ্ধ-হৃদয়-খাতে যে বাস্তব-সত্যসুধা-সঞ্জীবনীধারা কর্ণাঞ্জলি-দ্বারে সঞ্চারিত হয়, তাহাই শ্রুতি। যে গুরুপাদপদ্ম হইতে সেবোন্মুখ স্নিগ্ধ শিষ্য সত্য লাভ করেন, সেই গুরুপাদপদ্ম যদি নিত্য ও শ্রৌত না হ'ন অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব যদি তাঁহার শ্রৌত শ্রীগুরুদেবের নিকট নিত্যসত্য শ্রবণ না করিয়া থাকেন এবং সেই গুরুদেব যদি তদ্রূপ শ্রৌত ও নিত্য না হন, তাহা হইলে সেইরূপ সাময়িক গুরু-শিষ্য-পরম্পরার অভিনয়ের মধ্যে কখনই শ্রুতি আপনাকে প্রকাশিত করেন না,—"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" 'পরাভক্তি' শব্দে অন্যাভিলাষরহিতা, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির আবরণনির্ম্মুক্তা, আনুকূল্যে-কৃষ্ণানুশীলনময়ী অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা শুদ্ধা ভক্তি। মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পূর্ব্বপুরুষ,—ইঁহারা লৌকিক গুরু হইলেও কালক্ষোভ্য হওয়ায় ইঁহাদের নিত্যত্ব নাই। পাঠশালার গুরুমহাশয়, বাস্তু-শিক্ষা দিবার গুরু, ইঁহারা গুরু নামে পরিচিত হইলেও ইঁহাদের 'গুরুত্ব' সার্ব্বকালিক বা নিত্য নয়। আবার উপায় ও উপেয়-ভেদবাদী জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি যে সকল গুরু স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও নিত্যত্ব নাই। ত্রিপুটী-বিনাশে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকে না, যোগসিদ্ধিতে কৈবল্য-লাভের পর গুরু-সেবার প্রয়োজন বোধ হয় না; সুতরাং সেইরূপ তাৎকালিক বা ক্ষণিক গুরু-স্বীকার-বাদে পরাভক্তি নাই। 'দেবতা' শব্দে—অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥" নিখিল শাস্ত্র যাঁ'কে সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণস্বরূপ' ব'লে কীর্ত্তন ক'রেছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করেন, তথাপি যিনি মহাপ্রভুর একান্ত প্রেষ্ঠ, আমি ভগবানের সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

আম্নায়ঃ—গৌড়ীয়-দর্শনে গুরুতত্ত্বের বিচার এরূপ। সুতরাং গৌড়ীয়গণ গুরুদেব ও কৃষ্ণে নিত্য-অভিন্ন-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে পরভক্তিযুক্ত। এই পরভক্তি-বৃত্তি যাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, তাঁহারই কর্ণে শ্রীগুরুমুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণী পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হয়। হরিসেবারহিত চেষ্টা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদির আবরণ-আবর্জ্জনার কর্ণ-মলে কর্ণপুট অবরুদ্ধ থাকিলে তাহাতে শ্রুতি সঞ্চারিত হইতে পারে না। সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবিষ্টমান পরব্যোমাবতীর্ণ নিত্য-শব্দ-পরম্পরাকে 'শ্রুতি' বলা যায়। ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত জীবকে বিষয়-দর্শন দোষে দুষ্ট জ্ঞানের পরিবর্ত্তে দোষাতীত আম্নায়কেই বোধের আকর জানিতে হইবে।

শব্দঃ—শব্দ দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। মহর্ষি পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ স্ফোটাত্মকরূপে শব্দের নিত্যত্ব এবং বর্ণাত্মকরূপে শব্দের অনিত্যত্ব বিচার করেন। পতঞ্জলীর মতও—পাণিনির অনুরূপ।

স্ফোটবাদ-বিচারঃ—পাণিনি স্ফোটকে জগন্নিদান নিত্য শব্দ এবং সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম বলিয়াছেন—"জগন্নিদানং স্ফোটাখ্যো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মৈবেতি।" ব্রহ্মকাণ্ডে—"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।

নিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ ॥" শ্রীহরি স্বয়ং ব্রহ্মকাণ্ডে বলিয়াছেন, শব্দতত্ত্ব অনাদিনিধন ও অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা হইতেই জগতের প্রক্রিয়া হইয়া থাকে। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, অর্থপ্রত্যয় সমুৎপাদন করে কে? ব্যস্ত (বিভক্ত বা পৃথক্কৃত) বর্ণ অথবা সমস্ত (সমুদায়) বর্ণ? মহর্ষি পাণিনি বলেন, ব্যস্তবর্ণ অথবা সমস্তবর্ণ কোনটাই অর্থ প্রতীতি-উৎপাদনে সমর্থ নহে। কেননা, ব্যস্তবর্ণ হইতে অর্থাৎ পৃথক্কৃত বর্ণ হইতে অর্থপ্রত্যয় সম্ভবপর হইতেই পারে না। যেমন 'ভক্ষণ'—এস্থানে 'ভ', 'ক', 'ষ', ও 'ণ' দ্বারা পৃথগ্রূপে ভক্ষণ-ক্রিয়া-বিষয়ক কিছুমাত্র অর্থ-প্রতীতি হয় না। আর বর্ণসকল যখন ক্ষণিক, তখন তা'দের সমূহও অসম্ভব। 'ভ" 'ক', 'ষ' এবং 'ণ'—এইবর্ণ-চতুষ্টয়ের নাদ একটীর পর আর একটী লয় প্রাপ্ত হ'য়ে যাওয়ায় উহাদের চারিটীর একত্র অবস্থান হইয়া কমলপত্র-শতবেধন্যায়-বিচারে অর্থবোধ-জন্মান অসম্ভব। আবার ব্যাস ও সমাস উভয়ের দ্বারা অন্য প্রকারও সাধিত হইতে পারে না। এ কারণে বর্ণসকলের স্ফোটবিচ্ছিন্ন স্বতঃ সিদ্ধ বাচকত্ব অনুপপন্ন হয়। সুতরাং যাহার বলে অর্থ-প্রতীতি সমুৎপন্ন হয়, তাহাকেই 'স্ফোট' বলে,—বর্ণ-সকলের বাচকত্ব অনুপপন্ন হওয়ায় যাহার বলে অর্থ-প্রতীতি সমুৎপাদিত হয়, তাহাকেই 'স্ফোট' বলে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, বর্ণাতিরিক্ত বর্ণাভিব্যঙ্গ অর্থ-প্রত্যয়-সমুদ্ভাবক নিত্যশব্দই 'স্ফোট'-পদবাচ্য। **বর্ণাভিব্যঙ্গ**—বর্ণের দ্বারা 'অভি' সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত বা স্ফুটিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'স্ফোট'। আর ইহা হইতে অর্থ স্ফুটিত হয় বলিয়া ইহাকে অর্থ-প্রত্যয়-সমুদ্ভাবক 'স্ফোট' বলা হয়। এইরূপে উভয় প্রকারে স্ফোট-শব্দার্থ নিরুক্ত হইয়াছে।

পতঞ্জলি, কৈয়ট প্রভৃতিও স্ফোটের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিকের ভট্টাচার্য্যগণও স্ফোটবাদের আলোচনা করিয়াছেন। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহকার স্ফোটবাদের যে আলোচনা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে, পাণিনিপ্রমুখ বৈয়াকরণ-স্ফোটবাদিগণ বলিয়াছেন, স্ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দের দ্বারা অর্থ বোধ হইত না। যেমন 'অ', 'গ', 'ন' ও 'ই' এই চারিটী বর্ণ স্বরূপ যে 'অগ্নি' শব্দ, তদ্দ্বারা বহ্নির বোধ হয়; কিন্তু ঐ বোধ কেবল চারিটী বর্ণের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। যদি এই চারিটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের দ্বারাই বহ্নির বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল অকার কিম্বা গকার উচ্চারণ করিলেও বহ্নির বোধ হয় না কেন? যদি কেহ বলেন, ঐ চারিটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারিত হইলে তাহা বহ্নি-বোধক না হইলেও ঐ চারিটী বর্ণ একত্রিত হইয়া বহ্নির বোধ জন্মাইয়া দেয়। এখানে স্ফোটবাদিগণ বলেন যে, এরূপ যুক্তি একটা বাল-কোলাহল মাত্র; কেননা, বর্ণসকল আশুবিনাশী। পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণসকল বিনষ্ট হইয়া যায়; কাজেই অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক; তাহাদের একত্র অবস্থানই সম্ভবপর হয় না। অতএব ঐ চারিটী বর্ণের দ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে, পরে স্ফুট স্ফোট দ্বারা বহ্নির বোধ হয়।

এস্থানে কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন, প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা অর্থবোধস্থলীয় দোষ ঘটে। আর সমুদয় বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে সেই দোষই উৎপন্ন হয়। কাজেই উভয়পক্ষেই যখন এরূপ দোষ জাগরূক রহিয়াছে, তখন স্ফোটবাদ-আবাহনের আবশ্যক কি?

স্ফোটবাদিগণ এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলেন,—যেমন একবারমাত্র পাঠের দ্বারাই স্বাধ্যায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা বা অভ্যাসের দ্বারাই পাঠ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়, তেমনি প্রথম-বর্ণ 'অ'কার দ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মাইলেও পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া স্ফোট বহ্নির বোধক হয়। কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হইলেই যে স্ফোট অর্থবোধক হইবে,

এরূপ নহে। যেমন, রত্নতত্ত্ব প্রথম প্রতীতিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু চরমে চিত্তে যথাবৎ অভিব্যক্ত হয়, তেমনি প্রথমে নাদ দ্বারা জীব আহিত হয়, পরে অন্ত্যধ্বনির সঙ্গে আবৃত্তির পরিপাক হইলে বুদ্ধিতে শব্দ অবধারিত হইয়া থাকে।

পতঞ্জলী বলেন :— (পাতঞ্জল সূঃ ৩।১৭) বর্ণসমূহ এককালে উৎপত্তিশীল না হওয়ায় অর্থ-প্রতিপাদনে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হইতে পারে না। তাহারা পদকে স্পর্শ না করিয়া, তাহাকে প্রকাশিত না করিয়াই (অর্থাৎ তাহার প্রকাশের পূর্ব্বেই) আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে, অতএব তাহারা প্রত্যেকে পদ-স্বরূপে গণ্য হয় না। পরন্তু তাহারা প্রত্যেকেই পদাত্মক এবং যাবতীয় অর্থ-প্রকাশক শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া সহকারী অন্যান্য বর্ণ-সমূহের সহিত বিভিন্নক্রমে সংযুক্ত ও বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্নার্থ-প্রতিপাদক হইলেও পূর্ব্ববর্ণ পরবর্ত্তী বর্ণের দ্বারা এবং পরবর্ত্তী বর্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ দ্বারা কোন নিয়তরূপে নিয়তার্থ-বিশেষেই স্থাপিত রহিয়াছে। এইরূপে ক্রমানুরোধে মিলিত বহুবর্ণ কোন বিশেষ-অর্থের সূচকরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন 'গ'কার, 'ঔ'কার এবং বিসর্গ বর্ণ প্রত্যেকে সর্ব্বার্থপ্রকাশ-শক্তিসম্পন্ন হইয়াই কোন নির্দ্দিষ্ট-ক্রমে সজ্জিত হইয়া 'গৌঃ' ইত্যাকার পদরূপে সাস্নাদিবিশিষ্ট (গলকম্বলাদিযুক্ত) প্রাণিবিশেষেরই প্রকাশক হইয়া থাকে। অতএব ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণের পর (বিনাশ হইলেও) অর্থপ্রকাশকরূপে নিয়ত ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণ-ক্রমসমূহ স্মৃতিবলে একত্র সংগৃহীত হইলে যে একটি বুদ্ধির প্রকাশ পায়, উহাই 'পদ' (স্ফোট) নামে অভিহিত এবং উহাই বাচ্যবস্তুর বাচকরূপে নিয়ত হইয়া থাকে।

স্ফোট বিচারে জৈমিনী— জৈমিনী শব্দের নিত্যত্ব-স্থাপনের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—"নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ'। (১।১।১৮)। শব্দের নিত্যত্ব স্বীকৃত কেন হইবে? জৈমিনী তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—শব্দকে 'নিত্য' বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে; কেন না, উচ্চারণের দ্বারা পূর্ব্বাবগত শব্দই পরের বোধ জন্মাইবার হেতুস্বরূপ হয়। শব্দ ত' পূর্ব্ব হইতেই আছে। শব্দ পূর্ব্বাবধি বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কোন একটী বিশেষ অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বক্তার বুদ্ধিতে প্রথমে তাহা দৃষ্ট হইলে তদ্ব্যঞ্জক ধ্বনি বক্তার দ্বারা উচ্চারিত হয়। পরে শ্রোতাও সেই ধ্বনি-দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া সেই স্ফোট হইতে শব্দের অর্থবোধ করেন। কাজেই 'স্ফোট'-শব্দটী ধ্বনি হইতে ব্যতিরিক্ত। উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে,—আলোক ও দৃষ্টিশক্তিসাহায্যে একটী বস্তু এখন আমার দর্শনের বিষয় হইয়াছে বলিয়া সেই বস্তুটীকে তৎকালেই যেমন আলোকের দ্বারা উৎপন্ন বস্তু বলা যাইবে না, তেমনি শব্দও উচ্চারণ-ক্রিয়া-সাহায্যে এখন বুদ্ধিতে আরূঢ় হইল বলিয়া শব্দকে উচ্চারণোৎপন্ন ধ্বনি বলা যাইবে না; উহা ধ্বনি-নিরপেক্ষ একটী সদ্বস্তু; কাজেই শব্দ—নিত্য।

সাংখ্যের বিচার— সাংখ্য বৈয়াকরণগণের স্ফোটবাদ নিরাস করিয়াছেন,—"প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ॥" (৫।৫৭) অর্থাৎ বর্ণসমূহ উচ্চারণের পর তৃতীয় ক্ষণেই বিনাশশীল বলিয়া তাহাদের মিলিতভাবে শব্দরূপে কোন অর্থ-প্রতিপাদনের সামর্থ্য না থাকায় পতঞ্জলি প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ শব্দকে বর্ণাত্মকরূপে স্বীকার করেন না। পরন্তু ঐ বর্ণসমূহের উচ্চারণ-প্রকাশিত 'স্ফোট' নামক কোন অতিরিক্ত পদার্থই—শব্দের স্বরূপ এবং উহাকেই তাঁহারা অর্থপ্রতিপাদকরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উক্ত মত-খণ্ডনের জন্য সাংখ্যকার এই সূত্রে বলিতেছেন যে,—তোমরা অর্থের প্রতীতিজনকরূপে যে স্ফোট-পদার্থের স্বীকার করিতেছ, উহা যদি স্বয়ং প্রতীত হয়, তবে সেই সকল বর্ণের উচ্চারণ হইতে অর্থের প্রতীতিও জন্মিতে পারে; মধ্যবর্ত্তী 'স্ফোট' নামক অতিরিক্ত পদার্থের কল্পনা আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে, যদি বল, স্ফোট-পদার্থ স্বয়ং প্রতীত না হইয়াই অর্থের প্রতীতিজনক হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, কোন বস্তু স্বয়ং অপ্রতীত

হইয়া অপরের প্রতীতি-জননে সমর্থ হয় না। অতএব প্রতীতি এবং অপ্রতীতি—উভয়কল্প-বিচারেই স্ফোটের সাধন অসম্ভবপর বলিয়া শব্দ স্ফোটাত্মক নহে।

আন্তরস্ফোট ও বহিঃস্ফোট—কোন কোন আচার্য্য আন্তর-স্ফোট ও বহিঃস্ফোট বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—"অনন্তর সেই নাদ হইতে অব্যক্তপ্রভব স্বতঃ হৃদয়ে প্রকাশমান ত্রিমাত্র অর্থাৎ কণ্ঠ-ওষ্ঠাদি দ্বারা উচ্চার্য্যমান অথবা 'ত্রিবৃৎ' শব্দে 'অ'কার, 'উ'কার ও 'ম'কারাত্মক ওঁকার উৎপন্ন হইল। এই ওঁকার—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবানের বোধদ্বার বা অবয়বস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রামাণানুসারে প্রণবাত্মক বর্ণ-সমূহের নিত্যত্ব প্রমাণিত হইতেছে। আকাশের নিত্যদ্রব্যত্বহেতু তদ্‌গুণস্বরূপ শব্দেরও নিত্যত্ব যুক্তিসিদ্ধ! বায়ুর প্রেরণ ও অপ্রেরণ-বশতঃই যখন শব্দের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তখন শব্দ—নিত্য পদার্থ। অন্তঃকরণে উপলভ্যমান এই নিত্যবর্ণই আন্তরস্ফোট। শব্দার্থ যদি অন্তরে উপলভ্যমান হয়, তাহা হইলে তাহা আন্তর-স্ফোটবাচ্য। সেখানে যে শব্দস্ফোট, তাহাই শব্দব্রহ্ম। এই আন্তর-স্ফোট—নিরংশ, বর্ণের সহিত অভিন্ন নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ও শব্দার্থময়। এই মতে প্রণব হইতেই নিখিল বেদের আবির্ভাব। অন্তরে উপলভ্যমানত্ব হেতু সেই প্রণব আন্তর-স্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত উদাহরণস্বরূপ। ইঁহারা বলেন, যাহারা জন্মাবধি অন্ধ, মূক, বধির, তাহাদের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অভাব থাকার দরুণ অন্তঃকরণে স্বতঃই শব্দার্থের পরামর্শ ঘটে এবং তাহাদের বাক্য ও শব্দার্থের বোধও জন্মিয়া থাকে, ইহাই আন্তরস্ফোট।

বৈয়াকরণগণ শাব্দবোধের প্রতি বহিঃস্ফোটকেই কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদিগের বিচারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণোচ্চারণে যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎ সংস্কার-সহকৃত যে চরম সংস্কার, সেই সংস্কারনিষ্ঠা-পদজন্য একপদার্থ-বোধজনকতাই 'পদস্ফোট'। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের উচ্চারণে যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎ-সংস্কারসহকৃত আবার যে চরম পদসংস্কার, তৎসংস্কারনিষ্ঠ-বাক্য জন্য একবাক্য-বোধকতাই বাক্যস্ফোট। অদ্বিতীয়, নিত্য, পদাভিব্যঙ্গ্য, বাক্যাভিব্যঙ্গ্য অখণ্ড এবং তাদৃশ অনেক পদঘটিত মহাবাক্যস্ফোটই—'জাতিস্ফোট'-পদবাচ্য। এই ব্যক্তিস্ফোটের সহিত জাতিস্ফোটই মহাবাক্য জন্য শব্দবোধের কারণ। ইহাই বৈয়াকরণ-গণের মত। তাঁহারা বলেন, পদব্যুৎপাদন-সময়ে স্ফোটদ্বারাই শব্দ-বোধ হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অর্থাপত্তি, উভয় প্রমাণের সম্ভাবনা আছে। যেমন 'গৌঃ' উচ্চারণ করিলে 'গ'কার, 'ঔ'কার ও বিসর্গ প্রতীত হয় না, গলকম্বলাদিবিশিষ্ট কোন পদার্থই প্রতীত হইয়া থাকে, ইহাই প্রত্যক্ষ। আর 'গো'কারাদি বর্ণসমূহ **ব্যস্তভাবে** ও **সমস্তভাবে** অর্থবোধজনক হয় না, ইহার কারণও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অর্থাৎ বৈয়াকরণগণ বলেন, একটি বর্ণ দ্বারাই অর্থ-প্রতীতি হইলে অপরাপর বর্ণোচ্চারণের ব্যর্থতা হয়। আর বর্ণ যখন উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়, তখন বর্ণসমূহেরও সমস্তজ্ঞান অসম্ভব। এইরূপে স্ফোটই অর্থাপত্তি **প্রমাণসিদ্ধ**।

আনুপূর্ব্বীরহিত সংস্কার-সমূহের প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণের ক্রমানুসারে পরস্পর আনুপূর্ব্বীরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট চরমবর্ণের জ্ঞানে শব্দ-বোধের জনকতাই স্ফোটত্ব। এইরূপ স্ফোট স্বীকার না করিয়া তত্তদ্‌বর্ণ-জ্ঞানের জন্য শাব্দবোধ-স্বীকারে 'রস' স্থানে সর বা 'নদী' স্থানে 'দীন' এরূপ প্রতিলোম-পাঠেও রেফ-স-কারাদি বর্ণ-জন্য সংস্কারের বিদ্যমানতা-হেতু 'সর' ও 'নদী' বস্তুদ্বয়ের শব্দ বোধ হইতে পারে। অনুলোম-সংস্কারবশে যাদৃশার্থবিশিষ্ট যে পদ ব্যুৎপাদিত হইবে, প্রতিলোমোচ্চারিত সে-সকল বর্ণ কখনই তাদৃশ পদের ব্যুৎপাদক হইতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অনুলোম ও প্রতিলোম-পদের কোন ভেদই থাকে না।

শ্রীল জীবগোস্বামী—গৌড়ীয়-দার্শনিকগুরু সর্ব্বসম্বাদিনীকার শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস করিয়া বর্ণরূপ 'বেদ'-শব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্থাপন করিয়াছেন—"দেবাত্মক যাবতীয়

শব্দই সমস্ত স্বার্থবিষয়ে প্রামাণ্য লাভ করায় ঐ শব্দ কিরূপে অর্থপ্রকাশক হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ, আপত্তি এই যে, বর্ণসমূহ শীঘ্র বিনাশশীল অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া অর্থ-প্রতিপাদনে তাহাদের শক্তি সম্ভবপর হয় না। অতএব কেহ কেহ শব্দস্থিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব অক্ষরসমূহের উচ্চারণজনিত সংস্কারের সহিত সংযুক্ত অন্ত্য অক্ষরই অর্থপ্রকাশক হয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণজনিত সংস্কার অপ্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়া কেবলমাত্র অর্থপ্রকাশরূপ কার্য্যদ্বারাই প্রতীতির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ যেরূপ ক্রমশঃ উচ্চারিত হয়, সেইরূপ তাহাদের উচ্চারণজনিত সংস্কারের কার্য্যস্বরূপ স্মরণও ক্রমশঃই হয়, পরন্তু এককালে হয় না। অতএব এককালে সমুদয়ের প্রতীতি না হওয়ায় তৎসহকৃত অন্ত্যবর্ণও অর্থপ্রতীতিজনক হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা 'স্ফোট'-নামক পদার্থবিশেষকেই অর্থ-প্রতীতিজনকরূপে বলিয়া থাকেন।

"বর্ণ-সমূহের অনেকত্বনিবন্ধন এক প্রতীতি অসম্ভব বলিয়া এক একটী বর্ণের যে প্রতীতি, উক্ত প্রতীতিসমূহ দ্বারা যে সংস্কার উপস্থাপিত হয়, উক্ত সংস্কাররূপ বীজযুক্ত এবং অন্ত্যবর্ণের প্রতীতিজনিত পরিপাকবিশিষ্ট পুরুষে এক প্রতীতির বিষয়রূপে উক্ত স্ফোট প্রতিভাসমান হইয়া থাকে।" অতএব স্ফোটস্বরূপ বলিয়া বেদ নিত্য, যেহেতু প্রতি বর্ণের উচ্চারণেই তাহার প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার-জ্ঞান বর্ত্তমান। বৈদান্তিকগণ বলেন,—"ভগবান্ উপবর্ষ বর্ণ-সমূহকেই শব্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন",—এই নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক "দ্বিগৌ" এই স্থলে এক শব্দেরই উচ্চারণ, পরন্তু দুইটী 'গৌ' শব্দের উচ্চারণ হয় নাই, যেহেতু একত্বরূপেই প্রত্যভিজ্ঞান হইয়াছে। অতএব বর্ণাত্মকরূপেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত বর্ণসমূহ পংক্তি-স্থিত পিপীলিকা-সমূহের ন্যায় ক্রমশঃ অনুগৃহীত অর্থবিশেষের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া নিজ ব্যবহারে ও এক একটী বর্ণোচ্চারণের অনন্তর সমস্তবর্ণের প্রতীতি-প্রকাশিনী বুদ্ধিতে অর্থবিশেষ সম্বন্ধরূপেই প্রতিভাসমান হইয়া নিয়মিতরূপে উক্ত অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। অতএব বর্ণবাদিগণের কল্পনার লাঘব হইয়া থাকে। স্ফোটবাদিগণের মতে অর্থ-প্রতীতিবিষয়ে দৃষ্টবর্ণসমূহের পরিহার-হেতু দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্ট-স্ফোটের উপাদানহেতু অদৃষ্ট-কল্পনারূপ দোষদ্বয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই বর্ণ সকলই একবার ক্রমশঃ উচ্চারিত হইয়া স্ফোটকে প্রকাশ করে, পুনরায় ঐ স্ফোট-পদার্থ অর্থকে প্রকাশ করে, এই কল্পনাপক্ষে কল্পনা-গৌরবরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপে বর্ণাত্মক বৈদিক শব্দসমূহেরই নিত্যত্ব এবং অর্থ-প্রতীতিজনকত্ব অঙ্গীকৃত হইল।

শাঙ্করভাষ্যে রত্নপ্রভা-টীকা, আনন্দগিরি, ভামতী, জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী প্রভৃতিতে স্ফোটবাদের অনেক আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অধ্যাপক-লীলায়, আচার্য্য-লীলায় যে অভূতপূর্ব্ব স্ফোটবাদের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই বিচার পরমার্থ-বিজ্ঞান-বিশ্বে আর ইতঃপূর্ব্বে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যায় সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাশ করিয়া যে বর্ণরূপ বেদশব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা, শ্রীমন্মহাপ্রভু অধ্যাপক-লীলায় যে স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণের অবতারণা, পাণিনীয় সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস করিয়া স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়ি-স্থাপনাভিপ্রায়েই হইয়াছিল। বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদ গৌড়ীয়-দর্শনের সার-শিক্ষা শ্রীনামভজনেই পরিস্ফুট হইয়াছে। শিক্ষাষ্টকে যে বিদ্যাবধূজীবন—শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-দুন্দুভি ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ণের উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গশাস্ত্রকে 'শিক্ষা' বলে। উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরবিজ্ঞান 'শিক্ষা',

বেদাঙ্গের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু শিক্ষাষ্টক সেরূপ বেদাঙ্গমাত্র নহেন। শিক্ষাষ্টকের অন্তর্গতই নিখিল সাঙ্গবেদ। শিক্ষাষ্টকে যে শিক্ষা, তাহাতে বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচার বেদের অঙ্গমাত্রে আবদ্ধ না থাকিয়া সাঙ্গবেদকে ক্রোড়ীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই শিক্ষাষ্টকে নামী হইতে অভিন্ন স্বরাট্ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ শ্রীনামচিন্তামণি **স্ফোটবাদের** কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

বৈয়াকরণগণ বা শাব্দিকগণ স্ফোটকে বর্ণাতিরিক্ত বা বর্ণ হইতে ভিন্ন বিচার করিয়া নানা-প্রকার সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের শ্রীনামের বিচারে সাধারণ স্ফোটবাদের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। সাধারণ স্ফোটবাদে বর্ণ ও বর্ণীতে ভেদ, কেননা, তাহাদের বর্ণ বা শব্দের বিচার প্রকৃতি বা ইতরব্যোমের অন্তর্গত; কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদের বিচারে কোন প্রকার মায়ার ব্যবধান নাই। সেখানে বর্ণ ও বর্ণীতে, শব্দ ও শব্দীতে, বাচ্য ও বাচকত্বে কোন ভেদ নাই। সেখানে বর্ণ সকলের বাচকত্ব অসম্ভাবিত নহে। কারণ, সেখানকার বর্ণ ও বর্ণী, শব্দ ও শব্দী, বাচ্য ও বাচক, উভয়েই পরব্যোমের বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদের কথা বলিয়াছিলেন,—"শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্। যেন বাগ্ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥ স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্॥ (ভাঃ ১১।৬।৪০-৪১) যে সময়ে আচ্ছাদনাদি হেতু শ্রবনেন্দ্রিয় বৃত্তিশূন্য হইয়া থাকে, সে সময় ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে ব্যতীত স্বাভাবিক জ্ঞানশালী, যে পুরুষ স্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত ওঁকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া থাকেন, তিনিই পরমাত্মা। ঐ স্ফোট দ্বারাই বৃহতী-সংজ্ঞক বাক্যের প্রকাশ হয় এবং ঐ স্ফোট স্বয়ং হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ স্ফোট নিজের কারণস্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাদ্-বাচক এবং উহাই যাবতীয় মন্ত্রসমূহের রহস্যও বেদ সমূহের সনাতন বীজস্বরূপ।

স্ফোটবাদের বিদ্বৎ-তাৎপর্য্য—স্ফোট—ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ বাচক। সাধারণ বিচারে 'স্ফোট' শব্দে—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ক্ষুদ্রত্বের পর পর বিচারে উন্নত দর্শনমাত্র। বৃহত্ত্ববোধক বিচার জ্ঞাপন করিবার জন্য 'ব্রহ্ম' বলা হইতেছে। ক্ষুদ্রতা পরিহার করিয়া 'ব্রহ্ম' শব্দের অবতারণায় **বৃহত্ত্ববাচক স্ফোটবাদের বিচার**। হৈরণ্যগর্ভগণ বলেন,—সেই বিচারটী পরমাত্মাতে আবদ্ধ। সেইরূপ বিষয়টা এরূপভাবে বিচারগ্রাহ্য নহে। 'নব' ও 'বন'শব্দের সাম্য-বিচারে শব্দার্থের বিচার হয়। 'নদী', 'দীন,' 'সর,' 'রস' প্রভৃতি শব্দের বিন্যাসের বৈপরীত্যহিসাবে উদ্দিষ্ট বস্তুর ভেদ লক্ষিত হয়। সেই সকল শব্দের ন্যায় 'ব্রহ্ম'-শব্দ নহে। মনোধর্ম্মচালিত হইয়া 'ব্রহ্ম'-শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গেলে শব্দের সত্যার্থ প্রকাশিত হয় না। গুরুপাদাশ্রিতের নিকট তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

ত্রিবিধ রূঢ়ি—স্ফোটের বিচার সমৃদ্ধ হইয়া রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। রূঢ়ি তিন প্রকার—অজ্ঞরূঢ়ি, সাধারণরূঢ়ি ও বিদ্বদ্রূঢ়ি অদ্বয়জ্ঞানকে লক্ষ্য করে, সাধারন রূঢ়ি ব্যবহারিক পরিভাষাগত বস্তুর ধারণায় বুদ্ধিবৃত্তিকে আবদ্ধ করে, অজ্ঞরূঢ়ি তাহা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণতা পোষণ করিয়া ব্যবহার জগতে রজস্তমোগুণেরও মর্য্যাদা স্থাপন করে—জীবের বিভিন্ন প্রতীতির জন্য এই সকল কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়ি পরব্রহ্ম-বস্তুকে লক্ষ্য করে। সেখানে স্ফোট কেবল বাচক মাত্র নহে, তাহাতে বাচ্যের বিচারও পরিস্ফুট, তখন আমরা জানি,—নাম ও নামী অভিন্ন।

শ্রৌতপন্থা ও স্ফোটের কদর্থ—যাহার প্রতিকূলে অপর কেহ তর্কবাদ অবলম্বন করিয়া তাহার বাস্তবতাকে প্রতিহত করিতে পারে না, তাহাই শ্রৌতপন্থা। স্থূলসূক্ষ্মাকারে যদি শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি চেতনের নিকট আবৃত হয়, তাহা হইলেই স্ফোটের কদর্থ হইয়া থাকে। তখন শব্দ ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অভিজ্ঞান উপস্থিত করে। শব্দ গীত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল বটে; কিন্তু চিদাকাশে বিচরণশীল বাস্তবকর্ণে প্রবেশ করিবার অবকাশ পাইল।

না। তাহাতে শব্দের বাস্তব বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইতে না পারায় পরিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ, বিকৃত ও বিবর্ত্তগ্রস্ত জ্ঞানে স্ফোটকে আবৃত করিয়া ফেলিল।

গৌড়ীয়াচার্য্য ও মহাপ্রভুর স্ফোটের বিচার—শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি গৌড়ীয়-দার্শনিক গুরুগণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে এইরূপ স্ফোটের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন,—মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক—স্ফোটবিচারেরই পরিস্ফুট বিজ্ঞান। মহাপ্রভু অতি অল্পাক্ষরে স্ফোটের বিচার বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।" হরি সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়। যাহাতে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয়, সেরূপ শব্দ দ্বারা লোককে আচ্ছন্ন হওয়ার উপদেশ মহাপ্রভু দেন নাই। বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দ বিষ্ণু-বাচক—পরব্রহ্ম-বাচক। প্রত্যেক শব্দে স্ফোট-ধর্ম্ম হইতে বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত। মহান্ত গুরুর দ্বারা কর্ণবেধসংস্কার হইলে—দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে স্ফোট-ধর্ম্মগত বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। রূঢ়িবৃত্তি শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ করে। অজ্ঞ ও সাধারণরূঢ়িতে বাচ্য-বাচক ও শব্দ-শব্দীতে ভেদ থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত-সাহজিকবাদ উপস্থিত হয়; কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িতে বাচ্য-বাচকে আবরণ না থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতার কোন স্থান নাই। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ষট্‌সন্দর্ভে, শ্রীল-রূপ-সনাতন প্রভু ভাগবতামৃত প্রভৃতিতে এবং গৌড়ীয়-দার্শনিকগণ সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

জড়াকার, চিদাকার ও শব্দার্চ্চা—যখন কোন একটা বস্তু আকারবিশিষ্ট না হয়, তখন আমাদের দর্শনের বিষয় হয় না। কেবল নিরাকারের ধারণা অবাস্তব দার্শনিকগণের আকাশের পশ্চাদ্‌ভূমিকার কল্পনা মাত্র। যে বস্তু কিছুক্ষণ স্থূল-সূক্ষ্ম আকার সংরক্ষণ করিয়া নিত্য চিদাকার সংরক্ষণ করিতে পারে না, সে বস্তু অবাস্তব কল্পনামাত্র, তাহা কখনও সচ্চিদানন্দ বস্তু নয়। গৌড়ীয়-দর্শনে যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর-বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, তাহা নিত্য চিদাকার-বিগ্রহ। তাহাই বাস্তব দার্শনিকগণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাহাই স্ফোটের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি দ্বারা গুরুপাদাশ্রিত বিদ্বজ্জনগণের শ্রুতিতে ও বাণীতে শব্দার্চ্চাকারে প্রকাশিত। গৌড়ীয়-দার্শনিক-গুরুগণের পাদত্রাণবাহিসূত্রে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে বলিতেছি, কালক্ষোভ্য কর্ম্মের কথার ন্যায় এ সকল কথা শ্রবণ করিতে নাই। গৌড়ীয়-দর্শনের গোড়ার কথা—'কর্ম্ম' ও 'লীলা'তে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। কর্ম্ম—বহির্ম্মুখ-জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লীলা—সেবোন্মুখ-চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ভোগ্য জড়ের ন্যায় বুঝে নিতে পারা যায়, লীলা এরূপ কোন কার্য্য প্রকাশ করে না। মনের দ্বারা জড়ের যে আকার ধারণা করিতে পারা যায়, তাহা বস্তুর বাস্তব আকারের সহিত ভেদ স্থাপন করে। কিন্তু শব্দ এই দুর্ভেদ্যদুর্গ দেহ ও মন ভেদ করিয়া চেতনের সন্ধিনী-ভূমিকায় প্রকাশিত হয়। বিদ্বদ্‌রূঢ়িরূপে সেই শব্দ সাক্ষাৎ বিগ্রহবান্ হরিরূপে গৌড়ীয়-দার্শনিকের দর্শনের বিষয় হয়।

শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই হরির কীর্ত্তন—সর্ব্বত্রই এই হরির গান আছে। যে-সকলকে ইংরেজী পরিভাষায় scripture বলা হয়—যাহাকে 'শাস্ত্র' বলা হয়—'বেদ', 'ভাগবত', 'পুরাণ' বলা হয়, সে-সকলের মধ্যেই হরির কথা বর্ণিত আছে,—"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।"

কৃষ্ণতত্ত্ব কর্ম্মান্তর্গত নহে—লীলার ভাষায় বেদাদিতে 'হরি' শব্দের অবতারণা। গীতার উদ্দিষ্ট কৃষ্ণতত্ত্ব বিদ্বদ্‌রূঢ়িগত বিচারে না বুঝিতে পারিয়া অনেকে তাহাতে স্বকপোল-কল্পনা বা মনোধর্ম্মের আবরণ আনিয়া ফেলিয়াছেন। গৌড়ীয়-দর্শন শাস্ত্রকে ঐরূপ মনোধর্ম্ম দ্বারা আচ্ছন্ন করিবার পক্ষপাতী নহেন, উহাতে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি হয় না। কৃষ্ণতত্ত্ব কর্ম্মান্তর্গত নহে। যাহা স্বরাট্—যাহা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—যাহা একমাত্র স্বেচ্ছাময়, তাহা কর্ম্মের অধীন হইতে পারে না। গৌড়ীয়-দর্শনে এই চরম সত্য কথা—পরম সত্যের স্বেচ্ছাময়ত্ব, লীলাময়ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন,—"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতর" ইত্যাদি (ভাঃ ১।১।১)। শ্রীমদ্ভাগবত এই গৌড়ীয়-

দর্শনের ভাষ্যগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে যে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কর্ম্মবাদগর্হণকারী কেবলাদ্বৈতবাদ-মাত্রাকে লক্ষ্য করে না। 'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে। যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং তচ্ছৃন্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ।।

গৌড়ীয়-দার্শনিকের বৈশিষ্ট্য—ভক্তির বিচার অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির জাগতিক ও অসম্যক্ বিচারের হাত হইতে কিছুতেই অবসর পাওয়া যায় না। গৌড়ীয়-দার্শনিক না হওয়া পর্য্যন্ত কুদার্শনিক-বিচারের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বাস্তব বিচারের পরিপূর্ণ পদবীতে উপনীত হওয়া যায় না। মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্ম নানা প্রকার ধর্ম্মের আবাহন করিয়াছে। সেই সকল ধর্ম্মের ধারণা ও কর্ত্তব্যতা হৃদয়ে সমারূঢ় থাকা কাল পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-দর্শনের অনাবিল সাম্রাজ্যে প্রবেশলাভ ঘটে না। সমস্ত জগৎ যে সকল কথায় ব্যস্ত রহিয়াছে, গৌড়ীয়-দার্শনিক সেই সকল কথার জন্য অধিক সময় দেন না,—"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ।।"

শব্দব্রহ্মের নিত্যারাধনাই কর্ত্তব্য—একমাত্র স্ফোটাকারে শব্দরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন যে অদ্বয়জ্ঞান—স্বতঃসিদ্ধ কথা, সদা তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। একবার নহে, দুইবার নহে, বিশ্রান্ত নহে, প্রতিহতভাবে নহে, নিত্যকাল, অবিশ্রান্ত, অপ্রতিহতভাবে সেই স্ফোট ব্রহ্মের—ভগবন্নামের আলোচনা করিতে হইবে—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নৃত্য করাইতে হইবে।

লীলা প্রবেশ—সেই শব্দ হৃদয়-কর্ণকে রসযুক্ত করে। অসাধুর সঙ্গে বা নিজে নিজে কিম্বা অন্যমনস্ক হইলে হৃদয়-কর্ণ রসযুক্ত হয় না। **স্বরূপোপলব্ধিক্রমে সেবোন্মুখ-কর্ণে সাধুর প্রসঙ্গযোগে হৃৎকর্ণ রসযুক্ত হয়।** সাধুর সঙ্গ আরম্ভ করিলেন যাঁহারা, তাঁহারা অন্য কার্য্যে সময় দিতে পারে না না, সর্ব্বচিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশকে আকর্ষণ করেন এবং নিজেও প্রকৃতির বাস্তববিষয় অপ্রাকৃত হৃষীকেশের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েন, ইহাই হইল—**লীলায় প্রবেশ।**

সাধুসঙ্গই মূল—মুক্তির পথে আবদ্ধ থাকিবার যে বিচার-প্রণালী, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া—কাল্পনিক মুক্তি—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া পরম মুক্তগণের উপাস্য লীলাপুরুষোত্তমের নাম-রূপ-গুণ-লীলায় প্রবেশ ঘটে সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে। তখন আর কর্ত্তৃসত্তাগত বিচারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় না।

জড়াভিজ্ঞান ও গুরুকৃষ্ণের কৃপাসঞ্চারিত অভিজ্ঞান—'শ্রদ্ধা' শব্দে—নির্ভরতা। জড়জগতের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান যাহা সত্য বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছে, তাহাতে নির্ভর করিয়া 'কর্ম্মবীর' বলিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের সেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান পরমুহূর্ত্তেই তাঁহাদিগকে ছলনা করে। phenomenaতে যদি শ্রদ্ধা করি, তাহা হইলে তাহাতে কেবল কর্ম্মালানে বদ্ধ হইব। যখনই আমাদের এইরূপ শ্রেয়ো বিচার হয়—"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ।।" তখনই শ্রুতিগত শব্দের বিদ্বদরূঢ়িবৃত্তি আমাদের অধিগত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা—চক্ষু-নাসা-দ্বারা—মানসিক পর্য্যালোচনা-দ্বারা শব্দের যে অর্থ-বিচার, তাহা অচিদ্বিলাস। ঐ সকল ইন্দ্রিয়-পরিচালনা—ভোগ মাত্র। বহির্জগতের অর্থ আমাদিগকে শ্রৌতপথ হইতে বিচলিত করে—বাস্তব সত্য হইতে ভ্রষ্ট করে; সে প্রণালীতে আমরা পরমেশ্বরের সন্ধান পাই না। ভূতাকাশের শব্দ স্ফোটাকার ধারণ করিয়াছে দেখিয়া সেই জিনিষটাকে যদি বলি 'ব্রহ্ম', তাহা হইলে সেইরূপ ধরণের analogy draw (সাদৃশ্য অনুমান) করিয়া সত্যবিষয়ের অভিজ্ঞান নাও হইতে পারে। কর্ম্মের বিচার কখনই সুষ্ঠু নহে। জ্ঞানও—খণ্ডজ্ঞান ও অখণ্ডজ্ঞান; সমগ্র জ্ঞান নহে। কর্ম্মত্যাগ না করিলে জ্ঞানে প্রবেশ হয় না; আবার জ্ঞানের দ্বারা অতন্নিরসনই হইতে পারে। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে জীবের সেবা-পথ আবিষ্কৃত হয়। অতন্নিরসনে 'তৎ' নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই তদ্বস্তু যখন আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, তখনই সেই স্ফোটাকার 'ওঁ তৎসৎ'-স্বরূপ আমাদের নির্ম্মল চেতনবৃত্তিতে প্রকাশিত হয়,—"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-এর

গুনকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" ভগবানের কৃপা হইলে তিনি শব্দরূপে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি রূপধৃক্, গুনময়, লীলাময়, পরিজন পরিবেষ্টিত; তাঁহার ধাম আছে, এই জগৎ তাঁহারই নাম-রূপ-গুন-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। সেই শ্রীহরিই কৃপা করিয়া—'তিনি কিরূপ আকারের হরি, কিরকম রং এর হরি,'—সকলই চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত করিয়া দেন।

গৌড়ীয় ও অগৌড়ীয় দর্শন; জড়বিশেষ, নির্ব্বিশেষ ও চিদ্‌বিশেষ—গৌড়ীয়-দর্শনে পূর্ণবস্তু দর্শন করা যায়, আর অগৌড়ীয়-দর্শনে বিকৃত, অসম্যক, আংশিক দর্শনের প্রচেষ্টা আছে। গৌড়ীয়-দর্শনে নিত্য-দর্শনীয় বস্তুকে আমরা ভোগ্য বলিয়া জানি না। ভোক্তা—কর্ত্তৃত্বাভিমানে ব্যস্ত। কর্ত্তৃত্বাভিমান লইয়া যে-সকল দর্শনের প্রচেষ্টা, তাহাতে ভগবদ্দর্শন হয় না। শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারে আমরা বিবর্ত্তবাদ ছাড়িয়া দিতে পারি। নির্ব্বিশেষ বিচারটা কিছু খারাপ নহে, কারণ, জড় বিশেষটা—পৌত্তলিকতা। জড়বিশেষ-রহিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু জড়বিশেষরহিত অবস্থাটাই শেষ বা চরম কথা নহে। জড়বিশেষকে অতিক্রম করিয়া নিত্য চিদ্‌বিশেষের রাজ্যে উপনীত হওয়াই—চেতনের স্বভাবে আগমন।

গৌড়ীয়দর্শনে সর্ব্ব-সমন্বয়—যাঁহারা 'সাকারবাদ', 'নিরাকারবাদ' বা 'নির্গুণবাদ' কথাগুলি লইয়া মারামারি করিতেছেন, তাঁহারা যদি গৌড়ীয়-দর্শনের সুসম্যক বিচার পরিদর্শন করেন, তাহা হইলে ঐরূপ একদেশ-দর্শিতা ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ হইতে নিরস্ত হইতে পারেন। গৌড়ীয়-দর্শন একদেশদর্শী জড়সাকারবাদীকে সমর্থন করেন না, কিম্বা একদেশদর্শী নির্গুণবাদীকেও প্রশ্রয় দেন না। গৌড়ীয়-দর্শনের সাকারবাদ জড়সাকারবাদ নহে, গৌড়ীয়-দর্শন জড়সাকারবাদ নিরাস করিয়া অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের নিরাকার আকার বা সূক্ষ্ম ভূতাকাশময় আকার কল্পনা করিয়া দ্বিতীয় প্রকার কপটতাময় জড়সাকারবাদরূপ বুৎপরস্ত বা পাপের আবাহন করেন না, কিম্বা অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্যকে মানবীয় মস্তিষ্কের বা মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া অপরাধময় আকার কল্পনা করিতে ধাবিত হন না, অথবা তথাকথিত নির্গুণবাদ আবাহনের নামে ত্রিগুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বতনু কল্যাণবারিধিকে মানবীয় অকল্যাণময় চিন্তাস্রোতের দ্বারা বিচার করিয়া পরমেশ্বরকে শূন্যবাদের যূপকাষ্ঠে বলি দিবার পাষণ্ডতাও করেন না। গৌড়ীয়-দর্শন চিদ্‌বিশেষ বা চিৎসাকারবাদ স্বীকার করেন। জড়সাকারবাদকে নিরাস করায় গৌড়ীয়-দর্শনে 'অতন্নিরসন' নামক নিরাকারবাদেরও সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু নিরাকারবাদের একদেশদর্শিতা ও হেয়তা নাই। গৌড়ীয়-দর্শন মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই প্রাকৃত গুনসমূহে পূর্ণচেতন পরমেশ্বরে আরোপ করেন না বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে শুদ্ধসত্ত্বতনু অখিল কল্যাণনিলয় বিচার করেন বলিয়া নির্গুণবাদেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য গৌড়ীয়-দর্শনেই সমন্বিত হইয়াছে।

শ্রবণানুগ্রহে দর্শন—স্ফোট কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে—কোন্ আকারকে লক্ষ্য করিতেছে? স্ফোট যখন স্ফুটিত, অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই অভিব্যক্তি বা স্ফোটের লক্ষীভূত নাম-রূপ-গুন-লীলার অভিজ্ঞানকে 'দর্শন' বলি। শ্রবণানুগ্রহে যখন সেই অভিজ্ঞানটা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে 'দর্শন' বলিতে পারি। সাধুর মুখে স্ফোটের নাম-রূপ-গুন-লীলা অর্থাৎ নামের নাম, নামের রূপ, নামের গুন, নামের লীলার কথা শ্রবণকারীই স্ফোটবাদের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।

জীবের কত কাল বদ্ধাভিমান?—জীবস্বরূপে জ্ঞানস্বরূপতা ও জ্ঞাতৃত্বস্বরূপতা—উভয়ই আছে। যে-কাল পর্য্যন্ত আনন্দধর্ম্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, ততদিনই বদ্ধজীবাভিমান থাকে। সাধুর সঙ্গক্রমে ভগবানের কথা

শ্রবণ করিবার সুযোগ হয়, তখনই জীব বুঝিতে পারে, তাহাতেও আনন্দ-ধর্ম্ম আছে। অপ্রাকৃত আনন্দানুসন্ধানে বিরত হইয়া জীব জ্ঞানপথে প্রধাবিত হয়,—"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

অক্ষজ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা—Emperic activity (অক্ষজ চেষ্টা) লইয়া বহির্জ্জগতের যে সমস্ত কথা আছে, তাহাকে ভূমিকা করিয়া অভিজ্ঞতার সিঁড়ি প্রস্তুত করিতে করিতে যদি রাবণের মত স্বর্গে উঠিতে থাকি, তাহা হইলে বাস্তব আনন্দলাভের সৌভাগ্য হইবে না—যে জিনিষটী আমাদের আত্মার অভীষ্ট, সেই জিনিসটী পাইব না। স্যার আইজাক নিউটনের মত মনীষী পর্য্যন্ত জাগতিক অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করা দূরে থাকুক, স্পর্শও করিতে পারি নাই, উহার তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।"

অভিজ্ঞতাবাদে অধোক্ষজ জ্ঞান অগম্য—বহির্জ্জগৎ দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সেই অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া কখনও অধোক্ষজ-জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। যখন আমরা জাগতিক যাবতীয় অভিজ্ঞতার অভিমান পরিত্যাগ করি; তখনই **অধোক্ষজজ্ঞান** জানিতে পারি। **বহু বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি—সমস্ত পৃথিবী দর্শন করিয়াছি—লোককে অন্য প্রকার বুঝাইয়া দিতে পারি—এরূপ বিচার লইয়া পূর্ণ জ্ঞান, শুদ্ধজ্ঞান বা মুক্তাবস্থার জ্ঞান আমরা কখনই পাইতে পারি না।**

খণ্ডিত বস্তুর জ্ঞান পূর্ণজ্ঞানের জনক নহে—ক্রমবিকশিত জ্ঞান বা খণ্ডিত বস্তুর জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের সমগ্রতা সম্পাদিত হয় না। আমাদের অনুচেতন বৃত্তির একমাত্র স্বভাব—শরণাগত হওয়া—বৃহচ্চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করা। বহির্জ্জগতের কথা সম্বল করিলে আমরা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারি না, তাহাতে স্থায়িভাব রতির উদয় হয় না। যিনি বহির্জ্জগতের কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, **যিনি অকিঞ্চন,** প্রাকৃত জগতের দৃশ্য যাঁহার অবলম্বনীয় হয় না, তিনিই শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারেন। জীবন্ত শাস্ত্র—জীবন্ত ভাগবতের নিকট আমরা শাস্ত্রোপদেশ—ভবদীয়বার্ত্তা বা হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে অধোক্ষজ পূর্ণজ্ঞান প্রত্যক্ষ করিতে পারি। খণ্ডজ্ঞান-সমূহ মায়াকে আশ্রয় করিয়া বিরাজিত, আর পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত সকলই মায়া—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥

পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত অন্যত্র মায়ার অবকাশ—ভগবৎপ্রতীতি বা অখণ্ড বস্তুর প্রতীতি ব্যতীত ইতর প্রতীতি যাহা কিছু হয়, তাহাই মায়া। **বহির্জ্জগতের অধ্যাপক শ্রেণীর নিকট হইতে শব্দের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ হয়, সে সকলই মায়াময়।** যদি গুরু অনাত্মবিৎ হন, তাহা হইলে তাঁহার বাক্য এবং মুখ-নিঃসৃত শাস্ত্রোপদেশও মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে না।

আরোহ-তর্কবিতর্কে বাস্তবসত্য অনধিগম্য—সায়নমাধব-কথিত ষোড়শ দর্শন বা পাশ্চত্য দার্শনিকগণের কথিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ সংগ্রহ করিয়া আমাদের অধোক্ষজ দর্শনের কথা জানা যাইবে না। পূর্ব্বোক্ত পন্থায় দার্শনিক সত্য অনুসন্ধান করিতে হইলে কেবল পরস্পরের তর্ক-বিতর্ক হইবে—বাস্তবসত্যের অনুসন্ধানের পথ সুগম হইবে না। যদি প্রত্যেক সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাস্তব বস্তুর অনুশীলন করা যায়—২৪ ঘণ্টা অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলেই দার্শনিক সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে।

সেবোন্মুখতাই মঙ্গল-লাভের একমাত্র যোগ্যতা—"আমার অধিকার হয় নাই—সংস্কৃতভাষায় অত্যুন্নত নহি—কর্ম্ম জ্ঞান-যোগ-তপস্যাদি নাই"—প্রভৃতি বিচার করিয়া হতাশ হওয়ার আবশ্যক নাই। জড়ের কোন প্রকার অভিজ্ঞতা চেতনকে দর্শন করিতে পারে না। চেতনের বৃত্তি দ্বারা—চেতনের চক্ষু দ্বারা চেতনের দর্শন হয়। এইজন্য গৌড়ীয় দর্শন বলেন,—"স্থানে স্থিতাঃ"। মানুষ যে যেখানে আছেন থাকুন, মানুষের মধ্যে চেতনের ধর্ম্মে যে

অদ্বয়জ্ঞানের কথা আছে, তাহা যদি চেতন-কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করেন—যদি তর্কপন্থা অবলম্বন না করেন—"**তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন**" শ্লোক বিচার করেন—যদি শ্রবণোন্মুখ কর্ণ প্রদান করেন—যদি শ্রবণার্থ সম্মুখীন হন, তাহা হইলেই প্রকৃত মঙ্গল হইবে। 'আমাদের academical career বেশী থাকা আবশ্যক' প্রভৃতি বিচার আরোহবাদীর।

অপ্রাকৃত ক্রমবিকাশ-সিদ্ধান্ত—পাশ্চত্যদেশে জড়দেহের ক্রমবিকাশবাদ জড়বিজ্ঞানকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। কিন্তু ভারতের অপ্রাকৃত ক্রমবিকাশবাদ আত্মার সেবা-বৃত্তির ক্রমবিকাশের সহিত সেব্য পরমাত্মার তত্তৎসেবা-যোগ্য নিত্য নাম-রূপ-গুন-লীলার অপ্রাকৃত বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে। আত্মার সেবাবৃত্তির সঙ্কোচাবস্থা, খর্ব্বাবস্থা মুকুলিতাবস্থা, বিকচিতাবস্থা ও পূর্ণপ্রস্ফুটিতাবস্থার সহিত পরমাত্মার তত্ত্বৎ নিত্য নাম-রূপাদির প্রাকট্য। বিষ্ণুর অবতার-বর্ণনায় মৎস্য, কূর্ম; বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি মানব-হৃদয়ের ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করে। বামন ক্ষুদ্র মানুষ—পূর্ণ পুরুষের আকার নহেন। বামনের পূর্ব্বে অর্দ্ধনর-অর্দ্ধ-পশুরাজমিলিত-তনু। ক্ষুদ্র-নরাবস্থার পর অসভ্য নরাবস্থা। তৎপরে সভ্য নরাবস্থা বা নীতিপুষ্ট নরমূর্ত্তি। তৎপরে পুরুষের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়ত্ব বা পূর্ণ জ্ঞানাবস্থা। বুদ্ধে অতিজ্ঞানাবস্থা। কল্কিতে প্রলয়াবস্থা।

প্রাকৃত নায়কপূজা নির্ব্বিশেষবাদ মূলে জাত—সনাতন দার্শনিকগণের অবতার-বিজ্ঞানের অনুকরণ আমরা আধ্যক্ষিকগণের নায়কপূজাতে লক্ষ্য করি। এই নায়কপূজা নির্ব্বিশেষবাদ হইতে উত্থিত হইয়াছে, ইহা একপ্রকার নাস্তিক্যবাদ। ২৪ জন ভগবদবতারের অনুকরণে ২৪ জন জিন বা তীর্থঙ্করের উপাসনা প্রভৃতি এই নায়কপূজার অন্তর্গত। বর্দ্ধমান জ্ঞাতিপুত্র, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি নায়কগণের উপাসনা বা জৈনগণের নির্গ্রন্থ-বিচার শ্রমণগণের বৈরাগ্য-বিচার প্রভৃতি—**অচিন্মাত্রবাদ** বা **শূন্যবাদের** বিচারে প্রতিষ্ঠিত। মায়াবাদিগণের নির্ব্বিশেষ-বিচারমূলে যে আচার্য্যোপাসনা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহাও নায়কপূজার অন্তর্গত নাস্তিক্যমতবাদ-বিশেষ। কর্ম্মিগণের পিতৃদেবার্চ্চন প্রভৃতি, প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের সাহিত্যিক পূজা প্রভৃতি নায়ক-পূজার অন্তর্গত। ঐরূপ কর্ম্মবাদে কর্ম্মফলবাধ্য নশ্বর দেহ-মনের ধর্ম্ম প্রবল থাকায় উহাতে ভগবদুপাসনা বা প্রকৃত আস্তিকতা কিছুই নাই। কর্ম্মিগণের ঐরূপ পিতৃদেবার্চ্চন বা নশ্বর-নায়ক পূজার প্রতিযোগীসূত্রে তত্তুল্য অন্যপ্রকার নায়ক পূজক অর্থাৎ আত্মজড়দেহপূজক চার্ব্বাক পিতৃদেবার্চ্চনকারী কর্ম্মিগণকে ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচর এবং তাহাদের বাগ্‌বৈখরীকে 'জর্ফ্ফরী', 'তুর্ফ্ফরী' প্রভৃতি শব্দে আখ্যাত করিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ ঐরূপ আধ্যক্ষিক বিচারের অগ্নিকুণ্ডে আরও ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ করিয়াছে। গৌড়ীয়-দর্শনে ভগবদবতারগণের পূজা সেইরূপ নায়ক-পূজার অন্তর্গত নহে। তাঁহারা কর্ম্মফলবাধ্য কোন নায়কের উপাসনা করেন না। এজন্য গৌড়ীয়-দর্শনে কর্ম্মফল-বাধ্য পিতৃদেবার্চ্চন নাই। চার্ব্বাক গৌড়ীয়-দর্শনকে আক্রমণ করিতে পারে না। চার্ব্বাকের দর্শন কর্ম্মীর হেয়তার গণ্ডি পর্য্যন্ত পৌঁছে। জ্ঞানীর দর্শনের সীমা অতন্নিরসন পর্য্যন্ত, তৎপরে সে নিরস্ত হইয়া যায়। কিন্তু গৌড়ীয়ের দর্শন—অধোক্ষজ দর্শন। কর্ম্মীর সৎকর্ম্ম-অসৎকর্ম্মের বিচার, জ্ঞানীর অতন্নিরসন; এমন কি অপ্রাকৃত রাজ্যের ঐশ্বর্য্য-বিচার পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া একমাত্র একচ্ছত্র নায়ক স্বরাটের সর্ব্বাঙ্গীন সেবাই গৌড়ীয়-দর্শনের উদ্দিষ্ট বিষয়।

মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণ:—মধ্যযুগে ভগবদ্‌বিশ্বাসের আলোচনায় আমরা কর্ম্ম, জ্ঞান ও বহির্ম্মুখ-যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা-বিচারে সায়নের লেখনীর মধ্যে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মাধ্ব নামক আনন্দতীর্থের বেদান্তের দ্বৈতপর বিচার এবং তদনুগ জয়তীর্থের ন্যায়সুধা, ব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত প্রভৃতি লক্ষ্য করি। ন্যায়সুধায় শ্রীজয়তীর্থ ও ন্যায়ামৃতে শ্রীব্যাসতীর্থ নির্ব্বিশেষবাদকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীল লক্ষ্মণদেশিকের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মায়াবাদীর জিহ্বাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া দেওয়ায় প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ মায়াবাদী, রামানুজাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন তার্কিক বলিয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিষ্ণুভক্তিকে আশ্রয় করিয়া যে সকল আচার্য্য জগতে মায়াবাদ নিরাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বই বিশেষরূপে প্রচারিত আছেন। নিম্বার্কের

নামে লিখিত বর্ত্তমান ভাষ্যে নির্ব্বিশেষ মতবাদের তাদৃশ স্পষ্ট খণ্ডন নাই। বিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞসূক্তে প্রাচীন শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার নবীন কেবলাদ্বৈতবাদিগণের চাতুর্য্যপূর্ণ কৌশলে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির নামে আরোপিত হইয়া নির্ব্বিশেষ মতবাদে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বোধায়ন ঋষির বিচার অবলম্বনে যামুনাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি, ঔড়ুলোমী প্রভৃতির বিচার অবলম্বন করিয়া নিম্বার্ক, ব্যাসের বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীমধ্ব, রুদ্রের বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্বামী জগতে বিষ্ণুভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর বিচারপ্রণালী নবীন কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদীর বিচারমুখে সায়ন-মাধব-লিখিত রসেশ্বর-দর্শনের মধ্যে কিঞ্চিৎ লিখিত আছে। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদের দার্শনিক সাহিত্যে তাহার বিবৃতি দেখা যায়। শ্রীনৃপঞ্চাস্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীপাদের আরাধ্য। প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর মত হইতে ইদানীন্তন শ্রীবল্লভাচার্য্যের প্রস্তাবিত শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত পার্থক্য লাভ করিয়াছে। ইদানীন্তন শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ, শ্রীব্রজনাথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য, 'প্রমেয়রত্নার্ণব' প্রভৃতি গ্রন্থে যে-সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন বা শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ স্বয়ং প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর পূর্ব্বাধস্তন শ্রীধর স্বামীর বিচারপ্রণালী হইতে পৃথক হইয়া মায়াবাদ নিরসনকল্পে যে অনুভাষ্যাদি লিখিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বজ্ঞ-মুনির প্রাচীন শুদ্ধাদ্বৈত মত সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। কেবলাদ্বৈত বিচারের কল্পনারম্ভকালে লক্ষ্মীধর ও শ্রীধর নামক দুই গুরুভ্রাতা নৃপঞ্চাস্যোপাসক প্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তন-স্যূত্রে শ্রীনাম-মহিমা বিস্তার করিয়াছেন। লক্ষ্মীধরের নামকৌমুদীতে এবং শ্রীরূপপাদের পদ্যাবলীধৃত শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীলক্ষ্মীধরস্বামিপাদের রচিত শ্লোকাবলীতে উক্ত বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়াধস্তনদ্বয়ের নামনিষ্ঠা প্রকটিত হইয়াছে। ভাগবতের আদিম শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার স্ব-সম্প্রদায় অর্থাৎ বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মত অতি মিত ও সারবাক্যে বলিয়াছেন। 'সংক্ষেপ শারীরকে'র বিচার শুদ্ধাদ্বৈতবাদ হইতে পার্থক্য লাভ করিয়া শঙ্করপ্রবর্ত্তিত নবীন কেবলাদ্বৈতবাদে বিকৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাভেদ; অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত:—ব্যাসরচিত সূত্রাবলম্বনে ব্যাখ্যাভেদে পরস্পরের মত এত পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে যে, বাস্তব বিচারটা যে কি, তাহা আর সাধারণের জানিবার উপায় নাই। এই জন্যই মহাভারত বলিয়াছেন,—"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব এইজন্য স্বয়ং সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সেই অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বমতের যথার্থ সমন্বয় হইয়াছে। স্বকপোল-কল্পিত নবীন ভাষ্য বা বিভিন্ন মতবাদযুক্ত ভাষ্যগুলি অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য-সূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকটনে নিরস্ততেজঃ হইয়াছে।

নিখিলমহাজন-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর:—সেই মদ্ভাগবতের মূর্ত্তলীলাময় বিগ্রহ এবং ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান কালের নিখিল মহাজনগণের শিরোমণিরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে গৌড়ীয়-দর্শন জগতে প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রকৃত অপ্রাকৃত সবিশেষ বেদান্ত ও শ্রুতির অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়।

তর্কপথ-বিপদসঙ্কুল:—তর্কপথ—ভীষণ বিপদসঙ্কুল। তর্কপন্থায় বহু বহু জন্ম কাটিয়া যাইবে—অভিজ্ঞতাবাদের পথে উত্তরোত্তর বিপন্ন করিবে। অভিজ্ঞতাবাদী হইয়া জ্ঞান সংগ্রহের চেষ্টা সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাঘাত করে।

হরিকথা শ্রবণকারীর কোনকালেই বিনাশ নাই:—হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে যদি কোন ব্যক্তি অপক্ক দশায় স্খলিত বা মৃতও হয়, তথাপি তাঁহার অমঙ্গল ঘটে না; আর হরিকথা পরিত্যাগ করিয়া যম-নিয়মাদি চেষ্টায় ধর্ম্মমেঘ সঞ্চারে সমাধি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইতে পারে না,—"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেৎ ততো যদি। যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং

স্বধর্ম্মতঃ ॥ (ভা ১।৫।১৭)। প্রাপঞ্চিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন পরিত্যাগ করিয়া আত্মবৃত্তি ভক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি প্রপঞ্চে থাকা-কালে দুর্ভাগ্য-ক্রমে ভজন পরিপাকের পূর্ব্বেই ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট বা মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তথাপি আংশিক স্বরূপোদ্বোধন-জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সেবা-বাঞ্ছা থাকায় তাহার কোন অমঙ্গল হয় না ; আর যাহারা হরিকথা শ্রবণ করে নাই বা যাহারা ভজনহীন—ঐরূপ ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য অনিত্য অজ্ঞানমিশ্র নিরবচ্ছিন্নানন্দবাধময় স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা কোন নিত্য প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না।

একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"হে উদ্ধব, তুমি একমাত্র কেবলাভক্তি আশ্রয় কর। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি আশ্রয়ে কখনও মঙ্গল লাভ হইবে না। যে ব্যক্তি আমার কথা শ্রবণ করে, তাঁহার কোন কালেই অমঙ্গল হয় না,"—"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥" (ভাঃ ১১।১৪।১৮)

যদিও আমার ভক্তকে সাধারণ ব্যক্তিগণের দর্শনে কোন কোন সময় অজিতেন্দ্রিয় হইয়া বিষয়ে আক্রম্যমাণ দেখা যায়, তথাপি পরম সমর্থা ভক্তির প্রভাবে তিনি কখনও বিষয় দ্বারা অভিভূত হন না।

ভগবদ্ভক্তসঙ্গ—গৃহব্রতধর্ম্মবিনাশক —ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ হইলে দেহী জীব দেহ-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হয়।—

"তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যম্ যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ"।

যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দসৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ (ভাঃ ৪।৯।১২)

হে পদ্মনাভ, আপনার শ্রীচরণ-কমলের সৌরভ-লুব্ধ-হৃদয় যে সকল ভক্ত জগতে বিরাজমান, তাঁহাদের সঙ্গে আপনার প্রসঙ্গ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগন অতিপ্রিয় মানব-শরীর এবং মানব-তনুর অনুগামী গৃহ, ধন, সুহৃৎ, পুত্র, ভার্য্যা, সমস্তই বিস্মৃত হইয়া থাকেন।

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের সহিত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির তুলনা হয় না ঃ—ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥ ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাঽবরুদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ (ভাঃ ১১।১২।১-২)

বাহ্য ও অন্তরের অশেষ আসক্তি-নিরসনকারী সাধুসঙ্গে আমাকে যেমন বশীভূত করে, কি যোগ, কি সাংখ্য, কি ধর্ম্ম, কি বেদাধ্যয়ন, কি তপস্যা, কি ইষ্টাপূর্ত্ত, কি দান, কি ব্রত, কি যজ্ঞ, কি বেদমন্ত্রপাঠ, কি তীর্থভ্রমণ, কি নিয়ম, কি যম—কিছুই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।

আরোহবাদীর চেষ্টা ও সাধনপ্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা ঃ—আমরা স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া—গুরুকুলে বাস করিয়া—অপর পক্ষকে নিরস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া—যোগাদি সাধনে রত হইয়া, কি লাভ করিতে পারি ? যোগাদি সাধনে সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই যদি কাম-ক্রোধ-রিপু আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে কিরূপে আমাদের অভীষ্ট লাভ হইবে। জঙ্গলে গিয়া ডাল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে, লাঠি কাটিতে কাটিতে যদি বাঘ আসিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর লাঠি-কাটা হইল না, বাঘ-মারাও হইল না, বাঘের হাতে মারা পড়িতে হইল। ডাক্তার ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যু হইলে ডাক্তার আসিয়া আর কি করিবে ? রেচক-পূরক-কুম্ভকাদি দ্বারা ধর্ম্মমেঘসমাধি সঞ্চারের পূর্ব্বেই যদি কাম-ক্রোধাদি-ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ যোগ-সমাধি আমাদের কি মঙ্গল করিবে ? যোগ-ব্রত-তপস্যাদি জগতে যত কিছু মত আছে, সেগুলি কোনটী সাধ্য বা উপেয় নহে—একথা ঐসকল পথের পথিকগণও স্বীকার করেন। আত্মবৃত্তি ভক্তি কিন্তু উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য—উভয়ই ; কাজেই ভক্তিপথে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকুই মঙ্গল, পূর্ণ অগ্রসর হইলে পূর্ণ মঙ্গল। অভক্তি-যোগাদিপথে তাহা নহে, সেখান হইতে পতিত হইলে আবার কেঁচে গণ্ডূষ

করিতে হইবে। ঐগুলি সব Experimental আরোহবাদ। একটা Experiment বিফল হইলে আবার নূতন করিয়া আর একটা Experiment করিতে হইবে। এরূপ Experiment করিতে করিতে জীবন শেষ হইয়া যাইতে পারে—ডাল কাটিতে কাটিতে বাঘের হাতে পড়ে মৃত্যু হইতে পারে, তখন আর কাঠ দিয়ে লাঠি-তৈয়াররূপ অভিধেয় বলে বাঘ মারিয়া শান্তিলাভের প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না। শ্রীগৌরসুন্দর বা গৌড়ীয়-দর্শন এরূপ আরোহবাদীর অভিজ্ঞতাবাদোথ সাধনপ্রণালীর বিচারগুলি স্বীকার করেন না।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা :—শ্রীরামানুজের পূর্ব্বগুরু গোষ্ঠীপূর্ণ প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ যোগাদিমিশ্র-ভক্তি দেখা গেলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে তাদৃশ যোগ পদ্ধতি পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। গৌড়ীয়-দর্শন অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, ব্রত,তপস্যাদি সর্ব্বপ্রকার আবরন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ সর্ব্ববিধ আবরণ উন্মুক্ত করিয়া কৃষ্ণ-দর্শনের কথাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-দর্শনে সাক্ষাৎ ভগবানের নাম-রূপ-গুন-লীলার কথা শব্দাকারে স্ফুটিত হইয়া 'দর্শন' শব্দের চরম সার্থকতা প্রকাশ করে। পুরুষোত্তমের লীলা-কথাকে যেরূপ নশ্বর কর্ম্মরাজ্যের অন্তর্গত করা উচিত নহে, তদ্রূপ তাহাতে আধ্যাত্মিক বিচার আনয়ন করাও বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।

মহান্ত-জগদ্গুরু ও এক-জগদ্গুরু-বাদ :—গৌড়ীয়-দর্শনে মহান্ত গুরুর অদ্বয়ত্ব-বিচার ও মহাত্মা যীশুর অনুগত সম্প্রদায়ের একজগদ্গুরুমতবাদে পার্থক্য আছে। একজগদ্গুরুমতবাদিগণ মহাত্মা যীশু ব্যতীত অপর গুরু করিবেন না। পরবর্ত্তিকালে কোন মহান্ত উদিত হইয়া পূর্ব্ব জগদ্গুরুর বাণী আমার কাণ পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলেও তাঁহাকে আমি জগদ্গুরু বা ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহরূপে বরন করিতে স্বীকৃত হইব না। একজগদ্গুরু-মতবাদিগণের বিচার গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমানে কোন মহান্ত-গুরুর সাক্ষাৎ না পাওয়ায় শ্রৌত-প্রণালীর অটুট ধারা-প্রাপ্তির পক্ষে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। যীশুখৃষ্টকে জগদ্গুরু বিচার করিয়া ১৯০০ বৎসর পরে যদি যীশুখৃষ্টের আদর্শ উপদেশ কেবল-গ্রন্থের মধ্যে অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা হয়, কোন শ্রৌতগুরু-পরম্পরায় আগত সাক্ষাৎ জীবন্ত মহান্তগুরুর চেতনময়ী বাণীতে কর্ণ পরিপূরিত না হয় এবং সেই আদর্শে চেতনের অস্মিতা অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে নানাপ্রকার মনোধর্ম্ম আসিয়া আমাদিগকে প্রকৃত সত্য, এমনকি, মহাত্মা যীশুর প্রকৃত প্রচারিত মত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। এইজন্য গৌড়ীয়-দর্শনে শ্রীগুরুদেবের অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত হইলেও শ্রৌত-পরম্পরায় ভগবৎপ্রেরিত নিজ-জন আমার নিকট পর্য্যন্ত আগত হইয়া আমার কর্ণে পরম চেতনময় মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক আমাকে মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করেন। যে মহান্ত-গুরুর পাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট পর্য্যন্ত আগত হইলে আমি সেই পাদপদ্ম তাঁহারই কৃপায় স্পর্শ করিতে পারি, সেই মহান্তগুরু-পাদপদ্ম বিভিন্ন কালে শ্রৌত পারম্পর্য্যে উদিত জগদ্গুরুগণের সহিত এবং জগদ্গুরুগণের গুরু কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত অভিন্ন অদ্বয়তত্ত্ব। এক-জগদ্গুরুমতবাদে আমি প্রকৃত মত হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারি, কিন্তু মহান্তগুরুর অদ্বয়ত্ব-বিচারে আমার নিকট কৃপা পূর্ব্বক যে গুরুপাদপদ্ম উদিত হন, তাহা আমাকে ভগবৎপ্রণীত শ্রৌতমার্গীয় বাস্তব সত্যধর্ম্ম হইতে কেশাগ্রও বিপথগামী করিতে পারে না। ভগবৎপ্রণীত ভক্তিসিদ্ধান্ত যথাযথ গুরুপরম্পরারূপ খাতের মধ্য দিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে সেবোন্মুখ চেতনতা পর্য্যন্ত এসে পৌছে।

গৌড়ীয়-দর্শনে গুরুতত্ত্ব :—গৌড়ীয়-দর্শনে যে গুরুতত্ত্বের বিচার রহিয়াছে, সেরূপ বিচার আর কোথাও নাই। শ্রীগুরুদেব অভেদ বিচারে উপাস্য-পরাকাষ্ঠা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥" নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করেন, তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-

প্রকাশ বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি। গৌড়ীয়-দর্শনের বিচারে শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণু-বিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী ;—বিষ্ণু-বৈষ্ণব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়তত্ত্ব ; শ্রীগুরুদেব—সেবক ভগবান্ ; শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ; শ্রীগুরুদেব—স্বয়ং প্রকাশ প্রাকট্য-শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ; শ্রীগুরুদেব—মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ; রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী-প্রকাশ।

শ্রৌতপন্থিগণ গুরুর নিত্যত্ব স্বীকারকারী :—শ্রৌতব্রুব মায়াবাদিগণ গুরুদ্রোহী :—যাঁহারা শ্রৌতপ্রণালী বা বেদ-পন্থা স্বীকার করেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের নিত্যত্ব বিচার করেন। বৈদান্তিকগণ সকলেই আচার্য্যের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বৈদান্তিকব্রুব, বেদ-মুখে-মানা মায়াবাদি-সম্প্রদায়, মুখে আচার্য্য বা গুরু স্বীকার করিলেও নিজের জড়বাহাদুরীর জন্য আচার্য্যের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ইঁহাদের সকলই কপটতা। বেদ মানা—কপটতা, বেদান্ত পড়া—কপটতা, গুরুমানা—কপটতা, সাধন—কপটতা, সিদ্ধি—কপটতা। আচার্য্যের পারমার্থিক নিত্যত্ব, ও বেদের পারমার্থিক নিত্যত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া ইঁহারা বেদবিরোধী প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, অর্হৎ ও নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বী দার্শনিকব্রুবগণ—কেহই গুরুর নিত্যত্ব স্বীকার করেন না।

বিভিন্ন মতবাদ ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত :—শ্রীগৌরসুন্দর যখন দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন এই সকল মত প্রচারিত ছিল—বৌদ্ধ, শৈব, মায়াবাদী প্রভৃতি বিরোধি-সম্প্রদায়ের মত দক্ষিণ দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। সায়নমাধব চারি প্রকার শিবোপাসকের কথা লিখিয়াছেন—নকুলীশপাশুপত ; প্রত্যভিজ্ঞা, মহেশ্বর ও রসেশ্বর। এই মতগুলি সকলই নির্ব্বিশেষবাদমূলে সৃষ্ট। ডক্টর মেকনিকল্ বোম্বাই অঞ্চলের শিবভক্তিকে সেরূপভাবে আদর করিতে পারেন নাই ; তিনি বরং বিষ্ণুভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদ যাঁহাদের লক্ষ্য, যাঁহারা ভজনীয় বস্তুর অপ্রাকৃত আকার স্বীকার করেন না, মুক্তিকালে নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলার অপ্রাকৃতত্ব বিচার করেন না, সেই সকল দার্শনিকব্রুব-সম্প্রদায় বেদান্তের বিচার প্রণালী হইতে পৃথক্ হইয়া নানাপ্রকার মনোধর্ম্মপর মতবাদকে বৈদান্তিক মতবাদ বলিয়া চালাইয়া গিয়া ভ্রান্ত হন। কিন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার-প্রচারকগণ এরূপ কথার আদর করেন না। অন্যান্য দার্শনিকগণ ন্যূনাধিক সকলেই প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট ইন্দ্রিয়-তর্পণকারী। কামদেবের কাম, নাম ও ধামের পরিপূর্ণ সেবা বা পূর্ণ শ্রদ্ধা—যাহা বেদান্তভাষ্য-ভূত শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা একমাত্র গৌড়ীয়-দর্শনের বিচারেই পরিপূর্ণতমরূপে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ দেশে লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের কথাও এককালে যথেষ্ট ছিল। শ্রীকরমিশ্র প্রভৃতি বিষ্ণুস্বামীরই অনুগত—প্রেমাকর প্রভৃতি রুদ্র-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইলেও বিষ্ণুভক্তিরই প্রচারক। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় এবং বিষ্ণুস্বামী ও রুদ্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে এককালে ভীষণ বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল। যেখানে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই—যেখানে স্ফোট অনিত্য আকারে স্ফুটিত হইতেছে, শ্রীচৈতন্যদেব তাহা বহুমানন করিতে প্রস্তুত হন নাই।

শৈবমতবাদ বিচার :—শৈবাদ্বৈতবাদ ; শৈবদ্বৈতবাদ এবং পরিমলের লেখকের শৈববিশিষ্টাদ্বৈতপর ভাষ্যগুলি—সকলই সুদার্শনিক বিচার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন—"ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।" কুদার্শনিকগণের মধ্যে ভগবানের নির্ব্বিশেষ বিচার নানাপ্রকারে পল্লবিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকের সাকার-নিরাকারের খণ্ডিত বিচার—সকলই মনোধর্ম্মের অন্তর্গত। নকুলীশপাশুপত শৈবগণ মহাদেবকে পরমেশ্বর এবং জীবগণকে পশু বলেন,—নকুলীশ-পাশুপাত-মতবাদ মধ্ব-সিদ্ধান্তের প্রতিযোগিতা করিয়া নির্ব্বিশেষ মতকেই স্থাপন করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছেন। মনোধর্ম্মী নকুলীশ-পাশুপত বলেন,—মধ্বাচার্য্যের কথিত ভগবদ্দাস্য-প্রাপ্তিকে মুক্তি বলা কেবল উক্তি মাত্র ; কারণ মুক্ত ব্যক্তি যদি দাসস্বরূপ অধীনতা-শৃঙ্খলেই বদ্ধ হইল, তাহা হইলে কিরূপে মুক্ত বলা যাইতে পারে ? মুক্তের ভগবদ্দাস্য বুঝিতে না পারিয়া নকুলীশপাশুপত

বলিয়াছেন,—অমূল্য মণিমাণিক্য-রত্নাদি-বিনির্ম্মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তিকেও লোকে বদ্ধই বলিয়া থাকে। অন্ধকে পদ্মপলাশলোচন বলার ন্যায় ভগবদ্দাসত্বে বদ্ধব্যক্তিকে মুক্ত বলা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ ও হাস্যাস্পদ। কিন্তু গৌড়ীয় দর্শন এই মনোধর্ম্মীর জ্ঞানের ফল্গুতা প্রদর্শন করিয়া বলেন,—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" অনর্থযুক্ত জীব যখন নিজের কৃষ্ণদাস্যরূপ নিত্যস্বরূপ বুঝিতে পারেন, তখনই তিনি ভগবদ্দাস্যরূপ নিত্যধর্ম্মে নিত্যাসক্ত হইয়া অতিমুক্তগণের প্রেমধর্ম্ম লাভ করেন। ইহাই চরম স্বাধীনতা। কৃষ্ণের সহিত বন্ধন, জাগতিক নশ্বর মায়িক রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথাকথিত স্বাধীনতার বন্ধন অথবা নির্ব্বিশেষবাদিগণের ফল্গুমুক্তিরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের দাস্য নহে; স্বরাট্-পুরুষোত্তমের দাস্যই পূর্ণতম স্বাধীনতা—পূর্ণতম হেয়তা-ছেদন। এই বন্ধন পরম মুক্তগণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিয়াছেন,—যেরূপ শকুনি সূত্রের দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়া এদিক ওদিক দিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্য কোন য়গায় আশ্রয় না পাইয়া শেষে বন্ধনকেই স্বীকার করিয়া থাকে, সেইরূপ মনোধর্ম্ম-চালিত ব্যক্তি মনোধর্ম্ম দ্বারা মুক্তি পাইবার জন্য নানাদিক অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কতই না চেষ্টা-চরিত্র করেন—মুক্ত হইবার জন্য। কেহ মনে করেন, এজগতের ক্ষুদ্র সুখলাভ হইলেই স্বাধীনতা পাইব, কেহ মনে করেন, এ জগতে কিছুকাল স্বায়ত্বশাসন লাভ করিলেই স্বাধীনতা লাভ হইবে, কেহ মনে করেন, স্বর্গসুখলাভ হইলে স্বাধীনতা হইবে, কেহ মনে করেন, ব্রহ্মের সহিত একীভূত-হইলে স্বাধীনতা হইবে—এরূপ নানাদিক দিয়া জড়িত হইবার কামনায় জড়ভোগময় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে লোক যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে—অন্য কুত্রাপি স্বাধীনতা নাই, আশ্রয় নাই বুঝিতে পারেন, তখন সকল প্রানের প্রাণ—সকল স্বাধীনতম পুরুষগণের স্বাধীন স্বরাট্ পুরুষোত্তমের পাদপদ্মকে আশ্রয় করে এবং সেই পাদপদ্মে নিত্যবন্ধনই—প্রেমবন্ধনই স্বাধীনতার চরমসীমা বুঝিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে জানায়াছেন,—"তবে হয় মুক্ত সর্ব্ব বন্ধের বিনাস মুক্ত হইলেই হয় সেই গোবিন্দর দাস।"

বিষ্ণুস্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞসূক্তে 'মুক্তপুরুষেরই ভগবৎসেবার' কথা জানাইয়াছেন,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু "আত্মারামশ্চ" শ্লোকে মুক্তপুরুষগণের ভগবৎসেবার কথা দেখাইয়াছেন। চিদ্বিলাসরাজ্যের কথা মুক্ত না হইলে কেহ বুঝিতে পারে না। যাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুক্তির চেষ্টা বা মুক্তির চেষ্টাকে কল্পিত স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রান্ত হন, তাঁহাদের অধিকার ও আশা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। গৌড়ীয়-দর্শনে সেইরূপ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিয়া লোককে বিপথগামী করা হয় নাই। কেহ বলিতেছে, পারদ-রসকে আশ্রয় করিলেই উত্তমা মুক্তি লাভ হইবে, মূর্চ্ছিত পারদের দ্বারা ব্যাধি বিনষ্ট হয়, মৃত পারদের দ্বারা জীবিত হওয়া যায়, শূন্য পারদের দ্বারা গতি শক্তি জন্মে। পারদ সংসার-সমুদ্রের যন্ত্রণা হইতে পার করে। পারদ-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের পূজা কাশী প্রভৃতি তীর্থের শিবপূজা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ মনে করেন,—ষড়্গুনজারিত মকরধ্বজ প্রভৃতি দ্বারা দেহের সুস্থতা বিধান করিলে মনের শান্তি হইবে। মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া আমরা ঐরূপ ভুক্তি-মুক্তি-কামী হইয়া পড়িব। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতার চেষ্টা জীবের বদ্ধদশার চেষ্টা-মাত্র। গৌড়ীয় দর্শন-সেইরূপ বদ্ধ-দশার কথা বা জীবকে অধিকতর বদ্ধ-দশায় আনয়নের শিক্ষার কৌশলের কথা বলেন না। গৌড়ীয়-দর্শনে অমুক্তগণের যথার্থ মুক্তির কথা এবং মুক্তগণের - পরমমুক্তগণের চিদ্বিলাস-সেবার কথা অতি সুন্দর-রূপে কীর্ত্তিত আছে। রসেশ্বর-শৈবগণ মনে করেন, প্রতিমা পূজার যদি ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা হইলে পারদ নির্ম্মিত শিবপূজার কেন না ব্যবস্থা হইবে? তাহারা পঞ্চোপাসকের অনিত্য প্রতিমা পূজা বা প্রতীক পূজাই লক্ষ্য করিয়াছেন। গৌড়ীয়-দর্শনে যে শ্রীবিগ্রহ পূজার কথা বর্ণিত আছে, তাহা ঐ সকল পৌত্তলিক পূজা হইতে বহু বহু দূরে। এই সকল কুদার্শনিকের বিচার, ভারতীয় ষড়্দর্শনের মধ্যে কেবলাদ্বৈতবাদিগণের স্বকপোল কল্পিত বেদান্ত-বিরুদ্ধ ভাষ্য ও পঞ্চদর্শনের বিচার শ্রীগৌরসুন্দর অল্পকথায় বাদ দিয়া দিয়াছেন।

'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্যার্থ—বিষ্ণু—নিমিত্ত ও উপাদানকারণ ব্রহ্মে অবস্থিত। 'ব্রহ্ম' শব্দে বিষ্ণুই লক্ষিত। জড়জগৎ হইতে গৃহীত ভাব ঈশ্বর নহেন। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা বা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা আছে। যেহেতু ভগবান্ বাগানের মালী নহেন অথবা আমাদের রাইয়ত নহেন, সুতরাং তিনি প্রকৃতি-বাধ্যও হন না। তিনি আমার মনগড়া খেয়াল-পরিপূরণের জন্য আসিবেন না।

ভোগিকুলের বিচার-প্রণালী এই যে, বিষ্ণুও কর্ম্মফল বাধ্য হইবেন—তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবেন। প্রত্যেক কার্য্যে যদি ঈশ্বরের সেবা না হয়, আর কোন উদ্দেশ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাই, তাহা হইলে সত্যের সেবা হইবে না—কাম-ক্রোধ লোভ বৃদ্ধি হইয়া এক একটা দলাদলিতে সময় নষ্ট হইবে। মানুষের সময় কি এত আময়দা পড়িয়া রহিয়াছে? এ রকম ধরণের কর্ম্মাগ্রহিতা-অন্যাভিলাষিতায় যদি প্রমত্ত হই—ভগবানের সেবা বাদ দিয়া যদি অন্য কার্য্যে সময় নষ্ট করি, তাহা হইলে তাহার সুখ-দুঃখ-ফল ভোগ করিতে হইবে। মানুষের এত সময় কোথায় যে, দাবা খেলিয়া, বাজে কথায় সময় নষ্ট করিবার অবকাশ পাইবে?

ভগবান্ই মুল—ভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সকল কার্য্য করিতে হইবে। আমরা ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সকল চেষ্টা করিব—আকাশ পাতাল আলোড়ন করিব—প্রবল উৎসাহের সহিত ভগবৎ সেবা সাধন করিব। ভগবানের অবশেষ ব্যতীত, ভগবানের ভক্তের অবশেষ ব্যতীত যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহা স্থূল পদার্থ হইলে বিষ্ঠা এবং তরল পদার্থ হইলে মূত্রস্থানীয় হয়। প্রসাদ-গ্রহণ-ব্যতীত অন্য সমস্ত গ্রহণে অসুবিধা আনয়ন করে।

নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার ও গতি—অনেকে ভগবনের হস্ত-পদ-মুখাদি বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত; তাঁহারা মনে করেন, ভগবানের আবার এ সকল থাকিবে কেন? তাঁহাকে ঠুঁটোরাম করিয়া রাখিয়া দিব, আর যত চক্ষু, মুখ, নাসিকা, কর্ণ, আমাদেরই থাকিবে, আমরা কৃষ্ণকে কলা দেখাইয়া নিজেরা ভোগ করিব, কখনও বা শ্রৌতব্রুব হইয়া "অপাণিপাদঃ" শ্লোকের কদর্থ করিয়া ভোগ চালাইব। যাহারা অদ্বিতীয় ভোক্তার ইন্দ্রিয়-তর্পণের মহামহোৎসব পরিত্যাগ করিয়া নিজেরা ভোগ করিতে যায়, তাহারা নিজেদের পাশেই নিজেরা বদ্ধ হয়।

কৃষ্ণানুশীলনই পূর্ণমঙ্গল-সাধক;—আমাদের প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে, ভ্রমণে, জাগরণে, শয়নে, তীর্থভ্রমণে, সদসৎকার্য্যকালে কৃষ্ণ যদি আমাদের স্মৃতিপথে না থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা বিপথগামী হইব। বিকৃত স্বদেশগত বা বিদেশগত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—প্রস্তাবিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রভৃতি দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে না। একমাত্র পারমহংস্যধর্ম্মে অবস্থিত অর্থাৎ অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলন-ব্যতীত জীবের পূর্ণ মঙ্গল নাই—নাই—নাই। ঐ জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ।

শরণাগতি ও তৎপ্রতিকূল নির্ব্বেদজ্ঞান,—কৃষ্ণের পূর্ণ শরণ গ্রহণ-ব্যতীত জীবের পূর্ণমঙ্গল নাই। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে 'আমি' 'আমার' ভাব প্রবল থাকিলে সুবিধা হইবে না। 'আমরা ভোক্তা, জড়জগৎ ভোগ্য'—এই বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেলে অধঃপাতে চলিয়া যাইব। আমরা—চিৎ, জড়জগৎ—অচিৎ; যাহাকে ভোগ করিতে পারি, তাহাকে বলি 'জড়'। আমরা এক তরফা বিচার করিতে গিয়া অচিদ্বস্তুটা আমাদের ভোগ্য, আমরা ভোক্তা—এরূপ অহঙ্কারের বশীভুত হই। ভোক্তৃত্ববাদ প্রসারিত হইয়া অহঙ্কারে পর্য্যবসিত হয়। অহঙ্কার প্রবল হইয়া—"অহং ব্রহ্ম", "আমি খোদা বা অনলহক্"—এরূপ বিচার আসে। "আমি বড় হইব, আমিই সব, আমি ব্যাপক"—এরূপ বিচারে আচ্ছন্ন হইলে জীবের মঙ্গলের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া যায়। আমার বড় হইবার পিপাসা বড়িয়া বাড়িয়া ঘটাকাশ-পটাকাশের বিচার-প্রণালী, বিম্ব-প্রতিবিম্ব-বাদের বিচার হৃদ্দেশ অধিকার করে; তখন কেবলাদ্বৈতবাদ গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রাহ হয়।

সেবার কথা আবিষ্কাকের কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিচারের অকর্ম্মণ্যতা-প্রতিপাদন;—মধ্যযুগীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের

যে প্রচার ছিল, তাহাতে পৃথিবীকে মানমন্দির মনে করিয়া সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি পৃথিবীর চারিধারে পরিভ্রমণ করিতেছে—এরূপ বিচার ছিল। আপাত-দর্শনে এইরূপ দেখা যায়। সাধারণ লোক বলিবে,—প্রত্যহ লক্ষ্য করিতেছি, প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, সূর্য্য ঘুরিতেছে, পৃথিবী স্থির রহিয়াছে। কালপ্রভাবে পৃথিবীর আহ্নিকীকি গতি নিরূপিত হইলে পৃথিবীর গতিশীলতা স্বীকার হইল। Heliocentric বিচার উপস্থিত হইলে Geocentric বিচারের অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। প্রত্যক্ষ বিচারে ভোগটাই সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পূর্ণভগবৎ-সেবার কথা আবিষ্কৃত হইলে ভোগের বা ত্যাগের বিচারে অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপন্ন হয়।

"স্ত্রীপুত্রাদিকথা জহুর্বিষয়িনঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ। জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরামাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত-বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধনক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞান-সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ভক্তিরস-ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

বিষ্ণুই সকলের কেন্দ্রে অবস্থিত ;—ভোগবাদ বা ত্যাগবাদ হইতেই 'হামখোদাই' মত প্রবর্ত্তিত হয়। ভোগবাদের বিপরীত ত্যাগবাদে বাহিরের বস্তু eliminate (নিরসন) করিতে করিতে ঐরূপই একটা বিচার উপস্থিত হয়। Personality of Godhead কে ignore (সবিশেষ ভগবানের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার) করিবার জন্য অত্যাগ্রহ উপস্থিত হইলে ঐ রকম কেবলাদ্বৈত-বিচার আসে। Heliocentric বিচারটা যেন Personality of Godhead স্বীকারের বিচারের মত। সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহ-উপগ্রহ সকল প্রদক্ষিণ করিতেছে। সেই বিষ্ণুবস্তুর চারিদিকে অন্যান্য সমস্ত বস্তু ঘুরিতেছে। বিষ্ণুই সকলকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন।

নির্ব্বিশেষ মতবাদ বহু নাস্তিক্যমতবাদের জনক ,—কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার-প্রণালীই ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। এই কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষমত হইতে জগতে ঈশ্বরবিরোধের বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদ—শূন্যবাদের রূপান্তর বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ। এই প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ হইতে তান্ত্রিকমত, বাউল-মত প্রভৃতি অসংখ্য ভগবৎসেবা-বিরোধি-মত জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চোপাসনাও ঐ মায়াবাদেরই সন্ততিস্বরূপ। Henotheist সম্প্রদায় বিষ্ণুকে কর্ম্মফলবাধ্য বিচার মনে করিয়া নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন করেন। বহুদেবতাবাদ প্রভৃতি নির্ব্বিশেষবাদকে তাহাদের প্রাপ্যসীমা বিচার করে।

ভাগবতেই পূর্ণ উপাসনার কথা প্রচারিত ঃ—একমাত্র ভাগবতেই ভগবদুপাসনার কথা—স্বরাট্ পুরুষের সেবার কথা পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিজ-চরিত্রে সেই ভাগবত-বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদাসগণ সেই বাস্তবসত্যের কথা প্রচার করিতে মাঝে মাঝে জগতের নিকট বিপন্ন হওয়ার অভিনয় করেন। সত্য এমন একটা জিনিস—যাহাতে অসত্য থাকে না—সত্যে কখনও কপটতা নাই,—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবো" শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।২ শ্লোক আলোচ্য এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও—"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥ তা'র মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেই এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম্ম॥

পরিণামবাদ ঃ—ব্রহ্মসূত্রে ব্যাস শক্তি-পরিণামবাদের বিচারই বলিয়াছেন। বস্তু-পরিণামবাদ ব্যাসের অভিমত নহে। কাজেই আচার্য্য শঙ্কর ব্যাস পাছে 'ভ্রান্ত' প্রতিপন্ন হন, এই আশঙ্কায় যে বাদ উঠাইয়াছেন, তাহার কোন অবকাশই নাই। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম-বাদ'। 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি' তা'র উঠাইল বিবাদ॥ পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী এত কহি 'বিবর্ত্ত-বাদ' স্থাপনা যে করি॥ বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ

সেই ত' প্রমাণ। দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥ অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগদ্‌রূপে পায় পরিণাম ॥ তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥ নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিও মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥ প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ?

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ একটী সংক্ষিপ্ত সুযুক্তি দ্বারা পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করিয়াছেন —উপাধির অবিদ্যা-কল্পিতত্ব স্বীকার না করিয়া যদি তাহার বাস্তবতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবিষয় ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ-বিষয়তা সম্ভব হইতে পারে না। যাঁহার কোন বিশেষধর্ম্ম নাই, তাঁহার উপাধির সম্ভাবনা কোথায় ? তিনি সর্ব্ব-ব্যাপক, তাঁহার বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ ভেদই বা কিরূপে হইতে পারে ? নিরবয়ব বস্তু দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হওয়ায় তাঁহার প্রতিবিম্বই বা কিরূপে হইতে পারে ? উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-আকাশে চন্দ্র-সূর্য্যাদি যে-সমস্ত জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তাহাদেরই প্রতিবিম্ব সম্ভব।

একত্বে বহুত্বের বৈচিত্র্য কিরূপে সম্ভব ?—সমীকরণ-বিচারে বহুবস্তুকে এক সূত্রে গুম্ফিত করিবার অধিকার আছে। 'বহুত্ব' প্রেমধর্ম্মে বাধা দেয় সত্য, কিন্তু 'বহুত্ব' যদি একত্বের স্বার্থ-পরতায় তৎপর হয়, তাহা হইলে তাহাই প্রেম-পদবাচ্য। বহুত্বকে নিরাস করিবার জন্য চেষ্টা জড়জগতের অভিজ্ঞতার দিক হইতে বহুমানিত হইলেও যেখানে অদ্বিতীয় একের বহু, সেখানে বহুকে বিনাশ করার চেষ্টা—একের সহিত বিরোধ-মাত্র। "নিত্যো নিত্যানাং" শ্রুতি-মন্ত্রে এক অদ্বয়-তত্ত্বেরই বহুত্বের কথা শ্রুত হয়।

জগতের বহুত্ব ত্রিতাপ-আকর—বহির্জগতে একত্বে নানা-প্রকার অভাব থাকায় বহুত্বের প্রয়োজন। আর সেই বহুত্ব ত্রিবিধ ক্লেশের বিচিত্রতা লইয়াই প্রকাশিত। যেখানে ক্লেশ ও ক্লিষ্টের ভেদ, সেখানেই অসুবিধা ; কিন্তু অদ্বয়-জ্ঞানের সেবায় বাহ্য-প্রতীতিতে যে দুঃখানুভূতি বা ক্লেশাদি, তাহা জড়ীয় বহুত্বের হেয়তার ফল-স্বরূপ ত্রিতাপ নহে। দেহ-দেহীর ভেদ-রাজত্বে ভাব-ধর্ম্মের অভাব আসিয়াছে।

পরমাণুর ব্যবধান ;—Object এর আবৃত-দর্শনে পরমাণু আসিয়া বাধা দেয়—অন্তর্য্যামিত্ব-দর্শনে পরমাণু আসিয়া চেতনের পূর্ণ-বিচার রুদ্ধ করিয়া দেয়।

বদ্ধজীবের অদ্বয়জ্ঞানাভাবের উদাহরণ ;—সূর্য্য যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া সংখ্যাগত বহু সূর্য্যের ধারণা করায়, তদ্রূপ বিভিন্ন বদ্ধজীবে একমাত্র ভগবৎ-সেবার একতাৎপর্য্যপরতা নাই,—মায়া এরূপ ভেদ বা ভ্রমপূর্ণ ধারণা জন্মায়।

চিন্মাত্রবাদের অনধিকার-চর্চ্চা :—চিন্মাত্রবাদী
চিন্মাত্রবাদ ও চিদ্‌বিলাস-সিদ্ধান্তে কতদূর ঐক্য ? জ্ঞানী ও ভক্ত—এই উভয়েই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের জড়ত্ব ও
ও ভগবদ্ভক্তে কিছুদূর পর্য্যন্ত মত-ভেদ নাই দেখা যায়। জ্ঞানী ও ভক্ত—এই উভয়েই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের জড়ত্ব ও জড়বিলাসে হেয়তা আছে, এ
হেয়ত্ব স্বীকার করেন। চেতনের অচিৎএর প্রবেশ নাই, ইহা উভয়েই বলেন ; জড়বিলাসে হেয়তা আছে, এ কথা উভয়েই বলেন। কিন্তু অচিদ্বিলাসে হেয়তা, অনিত্যতা প্রভৃতি দর্শন করিয়া চিদ্বিলাস ভগবল্লীলায়ও
কথা উভয়েই বলেন। কিন্তু অচিদ্বিলাসে হেয়তা, অনিত্যতা প্রভৃতি দর্শন করিয়া চিদ্বিলাস ভগবল্লীলায়ও অনিত্যতা-জ্ঞান সিদ্ধান্ত-প্রবেশাধিকার-বর্জ্জিত অনুমানের দ্বারা শব্দ-প্রমাণ ও বাস্তব-সত্যের সঙ্গে বিরোধ-মাত্র।
অনিত্যতা-জ্ঞান সিদ্ধান্ত-প্রবেশাধিকার-বর্জ্জিত অনুমানের দ্বারা শব্দ-প্রমাণ ও বাস্তব-সত্যের সঙ্গে বিরোধ-মাত্র। তৃতীয় মানেরই সকল প্রকোষ্ঠে যখন অনুমানের
চিদ্‌বিলাস রাজ্যে অনুমানের প্রবেশাধিকার নাই—তৃতীয় মানেরই সকল প্রকোষ্ঠে যখন অনুমানের
পূর্ণ প্রবেশ অধিকার নাই, তখন চতুর্থমানের অতীত চিদ্‌বিলাস-রাজ্যের কথায় যে অনুমানের কোনরকমই সার্থকতা
থাকিতে পারে না, তাহার আর কথা কি !

'বিলাস' ও 'বিরাগ' ; চিদ্‌বিলাসের বৈশিষ্ট্য—ইন্দ্রিয়-চালনার নাম—বিলাস, আর তাহা হইতে বিরতির
নাম—বিরাগ। অচিদ্‌রাজ্যে ইন্দ্রিয়-চালনা ক্ষুদ্র জীবের ত্রিতাপ আনয়ন্ করে বলিয়া তাহা হইতে বিরতিকেই
বহুমানন করা হয়। কিন্তু যে স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয় জড়ের কোন পরমাণু দ্বারা গঠিত নহে—

জড়াকাশে যাহা পরিচালিত হয় না—যিনি পূর্ণ চেতন—যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় পূর্ণ চেতন—যে-স্থানে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিপতি পৃথক্ নহেন, সে-স্থানে—চেতনরাজ্যে চেতনের ইন্দ্রিয়-চালনা কখনই জড়-বিলাসের মত অনিত্যাদি ধর্ম্মের বিষয় হইতে পারে না।

চিদ্বিলাসে জড়ের হেয়তা-আরোপ অন্যায় ;—চিদ্বিলাসের সঙ্গে যেন আমরা অচিৎএর হেয়তা, অবরতা না মিশাই—চিল্লীলা-মিথুনে যেন পৌত্তলিকতা বা অপৌত্তলিকতা, সগুণ বা তথাকথিত নির্গুণের বিচার না চাপাই। আমাদের চেতনের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে যখন সেই স্বরাটের স্বরূপ দর্শন করিবার সুযোগ হয়, তখনই আমরা এ সকল কথা উপলব্ধি করি।

জড় বা জড়-ব্যতিরেক চিন্তায় অধোক্ষজের রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই :— আমরা জড়-চক্ষুদিয়া জড়-বস্তুই দর্শন করি ; জড়-মনের অনুমানাদি-দ্বারা জড়-বস্তুর সম্বন্ধে বিচার করিতে পারি। জড় বা জড়-ব্যতিরেক চিন্তা-দ্বারা কখনই অধোক্ষজ পূর্ণ চেতনবস্তুর কোন অভিজ্ঞান হয় না। এই জন্যই শব্দের আবশ্যকতা।

শ্রৌত শব্দের আবশ্যকতা :—অপ্রাকৃত শব্দকে বাহন করিয়া অতীন্দ্রিয় বাস্তব-জ্ঞান অবতীর্ণ হইলেও সে-স্থানে শব্দী শব্দ হইতে পৃথক্ নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হইতে সেই শব্দ আমাদের কর্ণে সঞ্চারিত হইলেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। এই জন্যই আমরা শ্রুতি-মন্ত্র পাঠ করি,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

গৌড়ীয়গণ জড়াকার বা নিরাকার-পূজক নহেন :—সেই বস্তু অধোক্ষজ। কৃষ্ণ আধ্যক্ষিক বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণের অধিগম্য নহেন। গৌড়ীয়গণ জড়াকার বা নিরাকার-উপাসক নহেন। তাঁহারা ভগবানের সাক্ষাৎ আরাধনা করিয়া থাকেন।

প্রকট ও অপ্রকট-লীলায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণতম কৃষ্ণসেবা :—পরমেশ্বর চিদচিৎএর একমাত্র আশ্রয়, তটস্থা শক্তির একমাত্র শক্তিধর। গুরুদেব ইহজগতে প্রকট-লীলার বিস্তার-কালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে ও পূর্ণতম-ভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত এবং অপ্রকটলীলা বিস্তার করিয়া নিত্য-কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট।

অবৈধলাম্পট্য ও বৈধলাম্পট্য-নিরোধের জন্য যথাক্রমে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীসীতারাম-লীলার অবতার :—লাম্পট্য-বিনাশের জন্য এবং অপ্রাকৃত রসচমৎকারিতার চরম কাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলা অবতীর্ণ হইয়াছেন। আর বৈধস্ত্রী-আসক্তি নিবারণের জন্য শ্রীসীতারামের লীলা জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার পরমোচ্চতা ;—শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় ন্যায় পরমোচ্চ বিচার আর কিছুই নাই। ঈশ্বর-বিষয়ের ধারণা, মানবজাতির মধ্যে যাহা আছে বা হইবে, সেরূপ পরিমিত মায়িক ধারণা, কৃষ্ণে আরোপ করা যায় না। কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব অচিন্ত্য-ব্যাপার, অথচ তাহা অধোক্ষজ-সেবকগণের গম্য। নারায়ণের ঐশ্বর্য্য মাত্র কৃষ্ণত্ব নহে।

প্রাকৃত নীতি ও দুর্নীতির প্রবেশাধিকার কোথায় ? নাস্তিকতা কি ?

অভেদবাদী বলিতে পারেন যে, ভগবদ্‌বস্তু প্রাকৃত নীতির সঙ্গে অভিন্ন থাকিবেন। নীতি জড়জীবের দুর্ব্বলতার প্রতিষেধক হইতে পারে। যে-স্থানে বহু ভোক্তার অভিমান ; যে-স্থানে কাম-ক্রোধাদির হেয়তা ও দুর্ব্বলতা, সে-স্থানেই নীতির প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু যে-স্থানে জড়জগতের কোন হেয়তা, দুর্ব্বলতা বা পরিচ্ছিন্ন ভাব নাই, যে-স্থানে একমাত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় হইয়া বিরাজ করিতেছেন সে-স্থানে নীতির আদৌ প্রবেশাধিকার নাই, অথবা জাগতিক দুর্নীতিরও কোন ছায়া তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। নিরঙ্কুশ লীলা-পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়চালনায় বাধা-প্রদানের চেষ্টা ঈশ্বরের অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা।

অপরাধ-বৃদ্ধিক্রমে সবিশেষ হইতে নির্ব্বিশেষ গতি,—শ্রীসীতা ও শ্রীরামচন্দ্রে মানব-বুদ্ধি উদিত হইলে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। আবার লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনায় শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ শ্লথ হইলে বাসুদেবের উপাসনার কথা উপস্থিত হয়। আবার তাহা হইতে ক্লীবত্বকে abstract করিয়া চিন্মাত্রধারণার গ্রাহক হয়।

প্রাকৃত স্বর্গ ও ভূতাদির গুণ-পরিচয় ;—প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উদয় হয়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াই প্রপঞ্চের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গকারিণী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—সেই মায়া ত্রিবর্ণা—লোহিতা, শুক্লা ও কৃষ্ণা। লোহিত-বর্ণে প্রাপঞ্চিকসৃষ্টি, শুক্লবর্ণে অবস্থিতি এবং কৃষ্ণবর্ণে বিলুপ্তি। এই মায়া হইতে মহত্তত্ত্বের উদয় হয়। ইহাতে ত্রিবিধ অহঙ্কারের অধিষ্ঠান আছে। তামস-অহঙ্কার হইতে পঞ্চমহাভূত, রাজস-অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবগণের বৈশিষ্ট্য উদ্ভূত হয়। লয়কালে পঞ্চমহাভূত তামস-অহঙ্কারে লীন হয়, একাদশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি রাজস-অহঙ্কারে মিলিত হয় এবং দেবগণের সঙ্গে সাত্ত্বিক অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে মিশিয়া প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে। আকাশ হইতে যে-কালে শব্দগুণ অপহৃত হয়, তখনই আকাশের অধিষ্ঠান লীন হইয়া যায়। বায়ু হইতে স্পর্শগুণ অবসর লাভ করিলে বায়ুর অধিষ্ঠান লীন হয়। তেজঃপুঞ্জ হইতে অন্ধকারের দ্বারা রূপ অপসারিত হইলে সেই তেজঃ বায়ুতে বিলীন হয়। জল হইতে রস বিযুক্ত হইলে তেজঃপুঞ্জে জলের অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। বায়ুই স্পর্শাপহরণের হেতু হইয়া তেজে বিলীন হয়। পৃথিবী হইতে গন্ধ বায়ু-কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে উহা নির্গন্ধ-সলিলে লীন হয়। পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বর্ত্তমান; জলে গন্ধ-রাহিত্য অবস্থা আছে বলিয়া শব্দ, স্পর্শ-রূপ ও রস বর্ত্তমান; তেজে রস ও গন্ধ-রাহিত্য আছে বলিয়া শব্দ, স্পর্শ ও রূপ বর্ত্তমান; বায়ুতে গন্ধ, রস ও রূপ-রাহিত্য আছে বলিয়া, শব্দ ও স্পর্শ বর্ত্তমান; আকাশে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ,-রাহিত্য-ধর্ম্ম আছে বলিয়া শব্দ বর্ত্তমান। আকাশ কাল-রহিত হইলে উহার আত্মা মহত্তত্ত্বে অবস্থান করে।

আকাশাদির গুণের দৃষ্টান্ত-দ্বারা রসের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ্য-প্রদর্শন :—আকাশাদির গুণের একটী প্রাকৃত উদাহরণের দ্বারা গৌড়ীয়-দার্শনিকগণ রসের তারতম্য বলিয়াছেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পাঁচটীকে মহাভূত বলে। আকাশের শব্দ-গুণ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ—দুইটী গুণ; অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—তিনটী গুণ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চারিটী গুণ; মৃত্তিকার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী গুণ আছে। আকাশাদি পর পর ভূতসকলের ক্রমশঃ গুণ-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। একত্রে পঞ্চগুণের সমাবেশই পৃথিবীতে লক্ষিত হয়। সেইরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুরে ক্রমশঃ গুণ বৃদ্ধি হইয়া মধুর-রসে পাঁচটী গুণই পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়।

আশ্রিত-ভক্তের অন্তরে ও বাহিরে বিষয়-তত্ত্ব,—যেরূপ প্রাণিগণের ভিতরে ও বাহিরে পঞ্চভূত বর্ত্তমান আছে; সেইরূপ আশ্রিতগণের ভিতরে ও বাহিরে ভগবদ্বস্তু স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হন। "যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচে- ষনু। প্রবিষ্টানি প্রবিষ্টান্য তথা তেষু নতেষহম্॥

"অহমেবসমেবাগ্রে" শ্লোকে ত্রিরাবৃত 'অহং' পদদ্বারা নিত্য অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব-স্থাপন,—চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে অর্থাৎ "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে তিনবার "অহং" শব্দ আছে। প্রথম চরণের "অহমেব" পদে, তৃতীয় চরণের "পশ্চাদহং" পদে এবং চতুর্থ চরণের "সোঽস্ম্যহং" পদে "অহং" শব্দ বর্ত্তমান। ইহার দ্বারা ভগবানের ব্যক্তিগত বিগ্রহ নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তিনি নির্ব্বিশেষ-মাত্র নহেন। নির্ব্বিশেষবাদী ভগবানের অপ্রাকৃত-সবিশেষ-বিগ্রহ স্বীকার করেন না বলিয়া তাহার বিচার যে ভ্রম-পূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য, ইহা বুঝাইবার জন্য 'অহং'-শব্দ তিনবার বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক ও অনুভব ;—জ্ঞান—শাস্ত্রোত্থ, বিজ্ঞান—অনুভব। গুরু বা শাস্ত্র-ব্যতীত অন্য

মূল হইতে আগত 'বিবেক' অনেক সময় মনোধর্ম্ম বা নির্ব্বিশেষপর। আবার অনুভব অনর্থ বা চেতন-ধর্ম্মের আবরণ-গত বৃত্তি নহে। অপ্রাকৃত অনুভূতি হইতে বিবেক উদিত হইলে ভগবদ্বিগ্রহের উপলব্ধি হয়। **ভগবদ্বিগ্রহ জড়মায়া ও মায়িক কার্য্য হইতে ভিন্ন**—বিজ্ঞানের অনুদয়ে জীবের সেই বোধ হয় না। যেরূপ সূর্য্যে রশ্মি প্রকাশিত, কিন্তু রশ্মি সূর্য্য হইতে ভিন্ন, আবার সূর্য্য-ব্যতীত রশ্মির স্বতঃপ্রকাশও সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ ও মায়া—এই দুইটী বিজাতীয় বিভিন্ন প্রতীতি, জীব মায়াতীত না হইলে অনুভব করিতে পারে না। অর্থাৎ মায়ান্তর্গত বুদ্ধিতে ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহত্ব বুঝা যায় না।

ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মাদি ও তত্ত্বশাস্ত্রে জ্ঞান বিজ্ঞানাদি তত্ত্ব চতুষ্টয়ের-বিচার,—ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটী তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে, তত্ত্বশাস্ত্রেও তদ্রূপ জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদঙ্গ ও তদ্রহস্যের বিচার আছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সামান্য সংসার-নীতির অনুগত। কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞানাদি তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের বিচার তদ্রূপ নহে। ঐ তত্ত্ব চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রাথমিক যে সাধনভক্তি, তাহাও ধর্ম্মাদি তত্ত্ব-চতুষ্টয় হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। অভিধেয় সাধনভক্তি—দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নিরপেক্ষ। "'অভিধেয়' সাধনভক্তির শুনহ বিচার। সর্ব্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যা'র।। ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে এ 'চারি' বিচার। সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার।। সর্ব্ব দেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য। গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য।।"

পরাৎপরতত্ত্ব—পুরুষোত্তম; প্রকৃতি নহেন কেন? কৃষ্ণ—'পুরুষ' 'পুরুষ' অর্থে—যিনি "স্ত্রী" নহেন, অর্থাৎ কাহারও বাধ্য নহেন। স্ত্রী—পুরুষের অনুগত, স্ত্রী—অনাথা, অবলা; পুরুষই নাথ ও প্রকৃতির বল-স্বরূপ। শক্তিমানের অধীনতা স্বীকারেই শক্তির শক্তিত্ব; শক্তির স্বতন্ত্র-শক্তিত্ব নাই। পুরুষ—ভোক্তা; স্ত্রী—ভোগ্যা।

শুদ্ধ শক্তি ও বিদ্ধ শক্তি :—সেব্য বস্তু পুরুষ না হইলে ন্যূনাধিক ভোগ্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়েন। প্রকৃতির কখনও নিরপেক্ষ ভোক্তৃত্ব নাই। গৌড়ীয়গণ যে শ্রীমতী বার্ষভানবী বা গোপীগণের সেবা করেন, তাহা কৃষ্ণের ভোগ্য-বিচারে। শ্রীমতী ও গোপীগণ অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের নিত্য-প্রিয়তম ভোগ্যবস্তু। কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সম্ভোগের জন্যই,—পরমভোক্তা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের পরমভোগ্যের পরস্পর সুখ-তাৎপর্য্যার্থই গৌড়ীয়গণের আত্মবিচারে আপনাদিগকে 'প্রকৃতি' জ্ঞানে মূল-প্রকৃতি-বর্গের অনুগত হইয়া লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা; এজন্য গৌড়ীয়গণকে 'শুদ্ধশাক্ত' বলা যায়। আর যাঁহারা পরমেশ্বরের স্ত্রীত্ব, মাতৃত্ব প্রভৃতি আরোপ করিয়া নিজেরা পুরুষ বা 'শিব' (শিবোঽহং) হইয়া যাইতে চাহেন এবং তাঁহাদের কল্পিত ঈশ্বরের নিরপেক্ষ-ভোক্তৃত্বের মৌখিক পরিচয় প্রদান করিয়া কার্য্যতঃ ভবানীভর্ত্তা, ভোক্তা সাজিয়া বসেন, তাঁহারা 'বিদ্ধশাক্ত'।

পরমেশ্বর বস্তু 'প্রকৃতি' হইলে কি অসুবিধা?—সেব্য বস্তু পুরুষ না হইলে সেব্য সেবকের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ-সেবা পাইতে পারেন না। 'স্ত্রী' সেব্য বস্তু হইলে জীব-প্রকৃতি সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সেব্যের সেবা করিতে পারে না। জীব ও পরমেশ্বর উভয়েই যদি প্রকৃতি হয়েন, তাহা হইলে এক প্রকৃতি আর এক প্রকৃতির সকল কামনা পরিতৃপ্তি করিতে পারে না। জীব যদি আপনাকে 'পুরুষ' কল্পনা করে, আর পরমেশ্বরকে প্রকৃতি সাজায় তাহা হইলেও পুরুষাভিমানী জীব সেব্যা প্রকৃতির কামনা পরিতৃপ্তি করিতে গিয়া প্রকৃতিকে কোনও না কোন-ভাবে ভোগ করিয়া বসিবে। শাস্ত্র জীবকে 'প্রকৃতি' বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।। (গীতা ৭।৫)।। পুরুষোত্তমই পরমেশ্বর-শব্দ-বাচ্য এবং তাঁহারই নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র-ভোক্তৃত্ব। গৌড়ীয়-দর্শনে এই বিচারই সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

পুরুষই সকল রসের ভোক্তা হইতে পারেন, প্রকৃতিতে তাহা অসম্ভব—তটস্থবিচারে মধুর-রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জাগতিক উদাহরণেও দেখা যায়, আদিরসকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ ব্যাকুলতা, আকর্ষণ, প্রীতি, মমতা, উদ্দীপনা ও সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা-উদিত হয়, অন্য কোন রসে তাদৃশী চেষ্টা দেখা যায় না। সেব্য-বস্তু লীলা,

পুরুষোত্তম না হইলে কোন রূপেই এই মধুর-রতি প্রকাশিত হইতে পারে না। পরমেশ্বর প্রকৃতি হইলে সেখানে মধুর-রতির অবস্থান থাকিতে পারে না। মায়ের সঙ্গে সন্তানের চাওয়া ও দেওয়ার সম্বন্ধ আছে। জীব সেখানে আপনাকে সন্তান বলিয়া কল্পনা করে, সেখানে তাহার পাওয়ার অধিকার, আর মায়ের দেওয়ার অধিকার, সেখানে জীবের কেবল দোহন-ক্রিয়া। বিশেষতঃ মাতা ও সন্তানে মধুর-রস অস্বাভাবিক; কিন্তু পুরুষ মধুর-রসের বিষয় হউন, আর বাৎসল্যরসেরই বিষয় হউন, উভয় ক্ষেত্রে পুরুষই ভোক্তা। বাৎসল্যরসের বিষয় হইয়া পুরুষ শিশু সমস্ত ভোগ্যবস্তু মাতা-পিতৃ-রূপী সেবকের নিকট হইতে স্তন্যরূপে দোহন করে, আবার সেই দোহন ক্রিয়াই মধুর-রসে আরও অধিকতর প্রীতি, ব্যাকুলতা ও সর্ব্বাঙ্গীন হইয়া প্রকাশিত হয়।

অপ্রাকৃত-রতি-বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের ক্রম :—বিরজায় স্নানের পরে গুণত্রয়ের সাম্য অবস্থা বা শান্তরতি প্রকাশিত হয়; শান্তরতিতে মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্যরতি প্রকাশিত হয়। সেই মমতা সমতা ও বিশ্রম্ভে মথিত হইলে সখ্যরতির উদয় হয়। সখ্যরতিতে পাল্য-বিচার সংযুক্ত হইলে বৎসলরতির উদয় হয়। বৎসলরতিতে বৎসলরতির আস্পদের কাছে যাহা গুপ্ত থাকে, তাহাও সর্ব্বাঙ্গীনভাবে উন্মুক্ত হইলে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গে সেবার উৎকর্ষ প্রকাশিত হইলে মধুর-রতি প্রকাশিত হয়।

সকল রতিতেই পুরুষোত্তমই ভোক্তা, প্রকৃতির স্বতন্ত্র-ভোক্তৃত্ব অসম্ভব :—এই সকলপ্রকার রতিতেই পুরুষই পরমেশ্বর; কোথাও প্রকৃতির পরমেশ্বরত্ব নাই। কেন না, পুরুষ-ব্যতীত আর কেহ নিরপেক্ষ-ভোক্তৃতত্ত্ব হইতে পারেন না। শান্তরসে গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু অজ্ঞাতসারে লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন। 'রক্তক', 'পত্রক', 'চিত্রক' দাস্যরসে লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণেরই সেবা করিয়া থাকেন। সুদাম, শ্রীদাম, সুবলাদি সখাও সখ্যরসে লীলা-পুরুষোত্তমের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাঁহারাই সুখ-সেবা বিধান করেন। নন্দ-যশোদাও লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে তাঁহাদের পাল্যজ্ঞানে সেবা করিয়া থাকেন। ব্রজগোপীগণও সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা করেন। অতএব সকল রসেই বিষয় বা সেব্য—পুরুষোত্তম।

পরমেশ্বরের পুত্রত্ব ও মাতৃত্ব-বিচারের উৎকর্ষ সাধারণ-যুক্তিমূলে প্রদর্শন :—ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ করিলে আমরা আমাদের পরিদৃশ্যমান অস্তিত্বের পূর্ব্ব হইতে মাতা বা পিতার সেবা করিতে পারি না। পরবর্ত্তিকালে সেবা করা না করাতেও সংশয় থাকে। আর পরবর্ত্তিকালে যদিও সেবা করি, তাহাও কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ বিনিময়-সম্বন্ধে অবস্থিত লৌকিক ব্যবহারযুক্ত পূজা-মাত্র। কিন্তু পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মাতা-পিতা পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন; সেই সেবা কৃতজ্ঞতা বা বাধ্যতা-মূলক নহে, তাহা স্বাভাবিক অনুরাগমূলক।

পরম পালক হইয়াও প্রেম-পাল্য :—কৃষ্ণই—পালক; আবার পালক হইলেও অপ্রাকৃত বাৎসল্য-প্রেমিকের পাল্য। সেই গোপালের সেবাই বাৎসল্যরতির বিষয়।

গৌড়ীয়-দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও রহস্য :—জগতের ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট সম্প্রদায় ক্লেশ হইতে নিবৃত্তি বা শান্তি-লাভই পরম মঙ্গল মনে করেন। কিন্তু যাঁহারা ক্লেশ হইতে স্বভাবতঃই পরিমুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা শান্তরসের উদ্দীপক ও উপদেশক উপনিষদের প্রাথমিক পাঠসমূহ বহু পূর্ব্বেই সমাপ্তি করিয়াছেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত-সেবা-রস-বৈচিত্র্য অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য ব্যাকুল হন। সেবার উন্নতিতে দেখা যায়, শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িতে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণদর্শন, এইটি অপ্রাকৃত স্ফোটবাদ বা গৌড়ীয়-দর্শনের রহস্য।

গৌড়ীয়-দর্শনে স্বরূপ-দর্শন—বিশ্বরূপ-মাত্র দর্শন নহে,—'গৌড়ীয়' অভ্যন্তরের জিনিসের সন্ধান দেয়। বিশ্বরূপ-দর্শনের কথা জাগতিক বিভিন্ন-দর্শনের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বরূপ-দর্শনের কথা একমাত্র 'গৌড়ীয়'-দর্শনই বিশেষরূপে বিকশিত করিয়া প্রদর্শন করেন। এজন্য 'প্রকাশানন্দ' গৌড়ীয়-দর্শনে দীক্ষিত হইবার পর

বলিয়াছিলেন,—"তা'তে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। মহাজন যেই কহে, সেই সত্য মানি॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার। তিঁহ যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্বসার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৫৫,৫৭)।

গৌড়ীয়-দর্শনেই বাস্তবতত্ত্ব-দর্শন সম্ভব :—একমাত্র গৌড়ীয়-দর্শনেই তত্ত্ব-দর্শন হয়। 'তৎ' অর্থাৎ সেই বস্তু যাহা, ঠিক তাহাই—As He is, not as He is couceived by man or many এরই নাম 'স্বরূপ'। সেই স্বরূপ-দর্শন একমাত্র গৌড়ীয়-দর্শনেই সম্ভব।

নির্ব্বিশেষবাদ 'দর্শন' নহে; দর্শনাভাব মাত্র :—পরতত্ত্ব, ব্রহ্ম, বৈভব অন্তর্য্যামী, অর্চ্চা প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনের তত্ত্বালোচনার অভাবে নির্ব্বিশেষ দর্শন হয়। নির্ব্বিশেষবাদকে 'দর্শন' না বলিয়া 'দর্শনাভাব' বা অন্ধের ন্যায় অবস্থান-মাত্র বলা যাইতে পারে। চক্ষুষ্মানের দর্শনে বিচিত্রতার দর্শন হয়। চক্ষুহীন ব্যক্তি দর্শনাভাবে সকলই নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ও অন্ধকার বলিয়া অনুভব করে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা সাত্বত-দর্শন চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণতা-সাধন :—এই দর্শনাভাবকে বিদূরিত করিবার জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—এই চারিটি বিষ্ণুহস্তস্থিত অস্ত্রের অবতার-স্বরূপ চারিটী সাত্বত সিদ্ধান্ত বা সুদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে এবং সকল আচার্য্যের আচার্য্য ও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার গৌড়ীয়-দর্শনের মধ্যে ঐ চারিপ্রকার অস্ত্রের সমন্বয়, পূর্ণতা ও পরিশিষ্ট-বিচার প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য :—পরমেশ্বরে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকাশিত; মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের দাস্য করিতে প্রস্তুত নয়। ঐশ্বর্য্যগন্ধ-শূন্য মাধুর্য্যের মহাদানই ঔদার্য্যে প্রকাশিত।

রূপানুগ-গৌড়ীয়-সঙ্গে গৌড়ীয়-দর্শনের দিব্যচক্ষু লাভ :—রূপানুগ-গৌড়ীয়ের সঙ্গ-ব্যতীত গৌড়ীয়-দর্শনের দিব্যচক্ষু লাভ হয় না। গৌড়ীয়-দর্শনে সর্ব্বত্রই বিপ্রলম্ভময় অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবা দর্শন হয়। "পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে-বাহিরে। ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১২৩)॥ (১) "যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥" (ভাঃ ২।৯।৩৪) "ভক্ত আমা বাঁধিয়াছে হৃদয়-কমলে। যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা দেখয়ে আমারে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২২৫)

"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ॥" (ভাঃ ১১।২।৫৫) (২)
"গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥ (ভাঃ ১০।৩০।৪) (৩)

(১) [যে প্রকার ক্ষিত্যপ্তেজঃ প্রভৃতি মহাভূত-সকল দেবতির্য্যগাদি উচ্চনীচভূত-সমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপ আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে (সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ ভগবৎস্বরূপে সকলের অন্তরে ও বাহিরে স্ফূরিত হই।] (২) "সর্ব্ব-পাপ-বিনাশক হরি অবশে অভিহিত হইলেও যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়-রজ্জু-দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে আবদ্ধ আছে, তিনিই ভাগবত-প্রধান"॥ (৩) [একত্র মিলিত গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় এক বন হইতে অন্য বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় বহিঃ ও অন্তঃস্থিত সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের বিষয় বনস্পতিদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।]

বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তির ভূমিকা ও ফল :—গৌড়ীয় এরূপ দর্শন করেন বলিয়া তিনি 'গৌড়ীয়'—মহাপ্রভুর আশ্রিত। বাহিরের খোলসে বাহিরের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করায় যে বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে জীবকে মতিচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে, তাহাতে আচ্ছন্ন না হওয়াই গৌড়ীয়-দর্শনের কথা। কেহ বাহিরের স্থূল খোলস, সূক্ষ্ম খোলস, কেহ বা সুসূক্ষ্ম খোলস-দার্শনিক হইয়াছেন। সকলেরই প্রাকৃত বা প্রাকৃত-ব্যতিরেক-সম্বন্ধে দর্শন।

গৌড়ীয়-দর্শনই একমাত্র অনাবিল অপ্রাকৃত-দর্শন :—এই "অপ্রাকৃত" শব্দটি একমাত্র গৌড়ীয়-দর্শনেই পাওয়া যায়। অপরাপর দার্শনিকম্মন্য ব্যক্তিগণ এই 'অপ্রাকৃত' কথাটির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ঠাট্টা-তামাসা করিয়া থাকেন।

অজ্ঞতাই অপরাধী :—ইহাতে তাঁহাদের কিছু দোষ নাই, তাঁহাদের অজ্ঞতারই দোষ। তাঁহারা যে প্রাকৃত গবাক্ষের মধ্য দিয়া অপ্রাকৃত-রাজ্যের বিকৃত ছবি দেখিতে পান, তাহাতে তাঁহারা অপ্রাকৃত বলিয়া যে একটি ব্যাপার আছে—যাহা সমস্ত প্রাকৃত বিচিত্রতার আকর—একথা ভাবিতেই পারেন না।

পদ্মানীতি :—কংসের জননী পদ্মা ভাবিত, বৃন্দাবনে গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণকে লইয়া এত নাচানাচি করে কেন? বোধ হয়, কৃষ্ণের কাছে ইহারা কিছু ধার ধারে। তাই পদ্মা একটা পরামর্শ দিলেন; ব'ল্লেন—"একটা হিসাব নিকাশ হউক। কৃষ্ণ গোপ-গোপীদিগের গরু চরাইয়া কতটা তাহাদের খাটিয়া দিয়াছে, আর গোপ-গোপীরাই বা কৃষ্ণকে শিশুকাল হইতে লালন-পালন-খাওয়া-পরার বাবত কতটা খরচ করিয়াছেন। যদি কৃষ্ণের কাছে তাহাদের পাওনা কিছু বেশী থাকে, তবে সেই পাওনার কএকটা টাকা কৃষ্ণকে দিয়া তাহার সঙ্গে গোপীদের সম্বন্ধটা চিরতরের জন্য চুকাইয়া দেওয়া যাউক। এই বৃদ্ধা অপস্বার্থপরতার পরিমিত চস্‌মা চক্ষে দিয়া কৃষ্ণকে ও গোপ-গোপীগণকে যে ভাবে দেখিয়াছিল, তাহাতে সে ঐ প্রকার ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাইবে না। কৃষ্ণ ও গোপীদিগের মধ্যে যে নিত্য ও স্বাভাবিক আকর্ষণ, এ কথা কি করিয়া বুঝিবে? পদ্মার এই দর্শন-নীতি লইয়া যদি 'গৌড়ীয়'-দর্শন করা যায়, তাহা হইলে 'গৌড়ীয়'-দর্শন হইবে না, 'অগৌড়ীয়-দর্শন' হইয়া যাইবে। গৌড়ীয়—আত্মবিৎ, তাঁহাকে অনাত্ম-দর্শনে দেখিলে চলিবে না। আত্মবিৎ হওয়ার পরে -স্বরূপাবস্থানের পরে যে-সব চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের কথা, সেইটী 'গৌড়ীয়-দর্শনের' কথা। গৌড়ীয় স্বরূপে অবস্থিত না হইয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা মোক্ষকামনার জন্য বস্তু দর্শন করেন না।

গৌড়ীয়-দর্শনের কথা, মুক্ত হইবার পরের কথা। যাঁহারা মুক্ত হন নাই, যাঁহারা অনর্থ-যুক্ত, তাঁহাদের ঐ সমস্ত ব্যাপারে তাৎকালিক প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের কথা—মুক্ত হইবার পরের কথা।

সর্ব্ববিভক্তিতে গৌড়ীয়-দর্শনের সমন্বয় :—প্রথমা হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত যতগুলি বিভক্তি, সবগুলির মধ্যেই গৌড়ীয়-দর্শনের সমন্বয় হয়। "গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়কে দর্শন, গৌড়ীয়-দ্বারা দর্শন, গৌড়ীয়ের প্রতি দর্শন, গৌড়ীয় হইতে দর্শন, গৌড়ীয়ের দর্শন, গৌড়ীয়ে দর্শন,"—এই সমস্ত পদেই গৌড়ীয়-দর্শন তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব প্রচার করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয় :—গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়—'গৌড়ীয়া-নাথ'; গৌড়ীয়া-নাথই—'শ্রীগৌরসুন্দর'। গৌরসুন্দরই—'কৃষ্ণ'। কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, আদি ও গোবিন্দ। **'দর্শন' অর্থ—সম্ভোগ নহে,—সেবা।** গৌড়ীয়-দর্শনে যে 'দর্শন'—শব্দ, তাহার অর্থ সম্ভোগ নহে, তাহা সেবার দ্যোতক। **সেবার পরম প্রগাঢ়তায় যে-সব চেতন-বৃত্তি সর্ব্বাঙ্গীনভাবে চক্ষুষ্মান হইয়া থাকে, সেই সব বৃত্তি দ্বারাই গৌড়ীয়-দর্শন সম্পন্ন হয়।**

সেবোন্মুখ কর্ণ ও জিহ্বার দ্বারা গৌড়ীয়-দর্শন :—যেমন 'রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাম্' বলিয়া একটা কথা আছে, তেমনি গৌড়ীয় কর্ণের দ্বারাই 'গৌড়ীয়', 'গৌড়ীয়কে,' গৌড়ীয়ের দ্বারা', 'গৌড়ীয়ের প্রতি', 'গৌড়ীয় হইতে', 'গৌড়ীয়ের', 'গৌড়ীয়েতে' গৌড়ীয়-নাথ দর্শন করেন এবং গৌড়ীয় সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত জিহ্বাতেই গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়কে দর্শন, গৌড়ীয়-দ্বারা দর্শন, গৌড়ীয়ের প্রতি দর্শন, গৌড়ীয় হইতে দর্শন, গৌড়ীয়ের দর্শন ও গৌড়ীয়ে গৌড়ীয় দর্শন করিয়া থাকেন।

গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়-ব্রুব :—'গৌড়ীয়' ও 'গৌড়ীয়ব্রুব', 'বিদ্ধগৌড়ীয়' ও অগৌড়ীয়—এক নহে।

অকৃত্রিম গৌড়ীয়ের সঙ্গে কৃত্রিম বেশধারী গৌড়ীয় কখনও এক নহে। ভিতরে-বাহিরে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে, ইহ-পরলোকে, অর্থে-পরমার্থে, সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বপাত্রে গৌড়ীয় না হইতে পারিলে গৌড়ীয়-দর্শনে প্রবেশ হইবে না।

দর্শন—সম্বন্ধ, দর্শন—অভিধেয় ও দর্শনই—প্রয়োজন :—দর্শনের পর ক্রিয়া, ক্রিয়ার পর ইষ্টসিদ্ধি। দর্শনকে সম্বন্ধবিচার করিলে দর্শনময় অভিধেয় এবং দর্শনময় প্রেম-প্রয়োজন উদিত হয়। যাঁহারা দর্শন-রহিত ভজনের ছলনা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের চেষ্টা অন্ধকারে হাত্ড়ান-মাত্র। দর্শন—বস্তুর বাস্তবতা বিনির্ণয় করিয়া দেয়। তাঁহার পর বাস্তব বস্তুর প্রতি ভজন হইয়া থাকে। দর্শন না করিয়া ভজন 'আন্দাজে ঢিল মারা'। তবে এই রক্ত-মাংসের চক্ষু দিয়া গৌড়ীয়-দর্শন হয় না। তাই বিল্বমঙ্গল এই দুইটি চক্ষুকে অন্ধ করিয়া অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন করিয়া ভজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। আবার 'দর্শন' জিনিসটাই—ভজন। যেখানে ভজনে ও দর্শনে ব্যবধান নাই, যেখানে ভজনে ও প্রয়োজনে ব্যবধান নাই, যেখানে দর্শনে প্রয়োজনে তফাৎ নাই, সেখানেই গৌড়ীয় দর্শনের আসন।

গৌড়ীয়-গৌরবে - 'সম্বন্ধ', গৌড়ীয়-সাহিত্যে—'অভিধেয়' ও গৌড়ীয়-দর্শনে—'প্রয়োজন'-কীর্ত্তন : —ফলাকাঙ্ক্ষিগণকে সম্বন্ধ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গৌড়ীয়-গৌরবের কথা বলা হইয়াছে। গৌড়ীয়ের অভিধেয়ের কথা জানাইবার জন্য গৌড়ীয়-সাহিত্যের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু টীকাকার সহিতা-শব্দে ভগবদ্ভক্তি বলিয়াছেন। আর প্রয়োজনের ইঙ্গিত দিবার জন্য "গৌড়ীয়-দর্শনে"র কথা বলা হইল। সমস্তটা মিলিয়াই "গৌড়ীয়-দর্শন।" গৌড়ীয়-দর্শনে গৌড়ীয়-গৌরব আছে, গৌড়ীয়-সাহিত্য আছে ও গৌড়ীয়-প্রয়োজন আছে।

কৃষ্ণপ্রীতিই গৌড়ীয়-দর্শনের মূলকথা :—ভগবৎপ্রীতি ও নিজের প্রীতি যেখানে একটা জিনিষ, সেখানে কোনও অসুবিধা নাই। সেই অখণ্ড প্রবাহেই গৌড়ীয়-দর্শন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে ঔপাধিক-প্রীতি ভগবৎপ্রীতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে বা মোক্ষাদি-প্রীতি ভগবৎ-প্রীতিকে আবৃত করিয়াছে, সেখানে কৃষ্ণ-প্রীতির সন্ধান নাই। ঐ প্রকার ত্রিতাপাদি ক্লেশ হইতে নিবৃত্তিরূপ-প্রীতির আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্ম-প্রীতি, অর্থ-প্রীতি, অনর্থ-প্রীতি, কাম-প্রীতি বা মোক্ষ-প্রীতি। এ সমস্তই অগৌড়ীয়-দর্শনের কথা। গৌড়ীয়-দর্শনে কৃষ্ণ-প্রীতি-ব্যতীত অন্য প্রীতির গন্ধও নাই।

গৌড়ীয়ের প্রদত্ত চক্ষুর দ্বারা গৌড়ীয়-দর্শন আবশ্যক :—গৌড়ীয় যে-ভাবে দর্শন করেন, সেইভাবে দর্শন করিলেই অভীষ্টলাভ করা যাইবে—নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ অভিন্ন বলিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে। গৌড়ীয়-দর্শন যদি আত্মসাৎ না করেন, তাহা হইলে মনুষ্য-জীবনের স্বার্থকতা হইল না, দিবান্ধ পেচক হইয়া থাকিতে হইল। তাই গৌড়ীয়-দার্শনিক গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

> "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
> তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ (ভাঃ ১১।৯।২৯)

গৌড়ীয়-দার্শনিক মাংসদৃক্-নহেন, তিনি বেদদৃক্-শ্রেষ্ঠ :—একথা পুনঃ পুনঃই বলা আবশ্যক যে, চর্ম্ম-চক্ষু বা ভোগ-চক্ষু-দ্বারা 'গৌড়ীয়'-দর্শন হয় না। গৌড়ীয়-দার্শনিক মাংসদৃক্ নহেন—তিনি বেদদৃক্‌গণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম। তাই গৌড়ীয়-দর্শনের আদি আচার্য্য ব্রহ্মা জানাইয়াছেন,—"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি। যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

ভক্তিচক্ষু—অপ্রাকৃত :—প্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে হৃদয়ে দর্শন করেন। যে ভক্তিচক্ষুতে গৌড়ীয়-দর্শন হয়, তাহা কাল্পনিক বা মিছাভক্তিচক্ষু নহে। অনেকে ভাব-

-প্রবণতার নিসর্গ পিচ্ছিল চক্ষুকে 'ভক্তিচক্ষু' মনে করেন। তাই গৌড়ীয়-দর্শনের অচিন্ত্যতত্ত্ব তাহাদের দর্শনের বিষয় হয় না।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত মহাবাক্য :—

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই—গৌড়ীয়-দর্শন। জীব ভূতশুদ্ধি-দশা লাভ করিবার পর—অনর্থমুক্ত হইবার পর আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া -তত্ত্বমসি' শ্বেতকেতো' 'অহং ব্রহ্মাস্মি'; 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', প্রভৃতি বেদমন্ত্রের স্বরূপ 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের মধ্যে বুঝিতে পারেন এবং "কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ" এই শ্রীচৈতন্য-বাণীকে প্রকৃত মহাবাক্য জানিয়া বেদের সার্ব্বদেশিক মহাবাক্যের বিগ্রহ প্রণবের সম্প্রসারিত মূর্ত্তি 'শ্রীকৃষ্ণ'-নামে গৌড়ীয়-দর্শনের সম্পুট আবিষ্কার করেন। তখন ঋগ্‌বেদের মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বলেন,—ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।"

শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে শ্রীনাম ভজনের কথা :—ইহা পারমার্থিকতার প্রথম পাঠ শ্রুতিমন্ত্রের মধ্যেও নিহিত রহিয়াছে। উপনিষদে ভগবদ্ভক্তির যথেষ্ট কথা আছে। বেদান্তের প্রতি-সূত্রের আদি ও অন্তে শ্রীনাম-প্রভুর অসম্প্রসারিতরূপ প্রণবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার চরম ফল—গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়বিগ্রহ শ্রীনাম বা শব্দব্রহ্মের সেবা—তাহাই বেদান্তের চরম সূত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন।

'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' 'শ্রীকৃষ্ণ'-নামের বৈশিষ্ট্য:—বিভিন্নদেশে বিভিন্ন নাম প্রচলিত আছে। যেমন জিহোবা, জিয়ুস, জুপিটর, অহুর মজ্‌দ, আল্লা, গড্, ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি। কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়—প্রণবের সম্প্রসারিত অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীনন্দ-নন্দন, শ্রীবৃন্দাবনেন্দ্র প্রভৃতি শ্রীভগবানের মুখ্যনাম-সমূহে যে পরিপূর্ণতম রসমাধুর্য্য আছে, তাহা অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

শ্রুতি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ ও শক্তি-পরিণাম-সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ :—গৌড়ীয়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-দর্শন, গৌড়ীয়-দর্শনের শক্তিপরিণামবাদ, শ্রুতির বহু বহু মন্ত্রে অনুস্যূত রহিয়াছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "আত্মৈবেদং সর্ব্ব মিতি," "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং", "একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ" ইত্যাদি বহুবিধ অভেদ-পক্ষীয় শ্রুতি পাওয়া যায়; আবার ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরং", "মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি," "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা." "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ," "যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ," "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং," "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশ," "তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং," "তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং," "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ." "নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি," "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত. তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে," "নিত্যো নিত্যানাং," সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ, অয়ং আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" ইত্যাদি অসংখ্য বেদ-বচন-দ্বারা নিত্যভেদ সিদ্ধ হয়। নিত্যভেদ—সত্য, নিত্য অভেদও—সত্য। যুগপৎ উভয় তত্ত্ব সত্য হওয়ায় ভেদ ও অভেদ উভয়নিষ্ঠ শ্রুতিসকল বিদ্যমান। এই যুগপৎ ভেদাভেদ অচিন্ত্য অর্থাৎ মানব-চিন্তার অতীত ইহাতে বিতর্ক করিতে গেলে প্রমাদ উপস্থিত হয়।

অচিন্ত্য-বিষয়ে তর্কের যোজনার অবকাশাভাব :—আমাদের বুদ্ধির পরিমাণ অল্প বলিয়া বেদার্থের অবমাননা করা উচিত নহে। "নৈষা তর্কেণ মাতিরাপনেয়া," "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ"। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥" এই শ্রুতি-মন্ত্র গৌড়ীয়-দর্শনের কথাই জানাইয়াছেন। উপনিষদ্ তারস্বরে ভগবদ্ভক্তির কথা বলেন।

বেদসংহিতার স্তব-স্তুতিও বিষ্ণুতত্ত্বেই পর্য্যবসিত :—সংহিতা-অংশে স্তব-স্তুতি প্রভৃতির মধ্যে দেবগণের

অধিকারে যে-সমস্ত কথা উল্লিখিত আছে, তাহাও চরমে বিষ্ণুতত্ত্বেই পর্য্যবসিত হয়। "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥"

পঞ্চরাত্র ও ভাগবতে গৌড়ীয়-দর্শনের অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে। বেদান্তেরঅকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতই গৌড়ীয়-দর্শনের মূল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত যে কত বড় দার্শনিক মহাগ্রন্থ, মানবজাতি তাহা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদ গোস্বামিপাদগণ যদি শ্রীমদ্ভাগবতকে গৌড়ীয়-দর্শনের মূলগ্রন্থ বলিয়া না জানাইতেন তাহা হইলে হয়ত শ্রীমদ্ভাগবতের নাম পর্য্যন্ত আজ কম লোকেই জানিতেন। দুঃখের বিষয়, গৌড়ীয়-দর্শনের এই মূল গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে জীবিকা-অর্জ্জনের যন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ বা এই গৌড়ীয়-দার্শনিক মহাগ্রন্থের মধ্যে নির্ব্বিশেষবাদের কথাও টানিয়া বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদকে তাঁহারা মায়াবাদী বলিতেছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্। যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা।" (ভাঃ ১০।২০।৩৬)

"শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে। সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাও বরিষে॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৪)

জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গৌড়ীয়-দর্শন সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তামৃত প্রকট করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইল।

পরমার্থ পিপাসু যুবক-চতুষ্টয় প্রত্যহই সাধুসঙ্গে গমন করিয়া নিয়মিতভাবে উক্ত অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করিয়া নিজদিগকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিলেন এবং ভাবিলেন, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এত সুসূক্ষ্ম সুযুক্তিপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুসিদ্ধান্ত আছে, যাহা অন্য কোথাও নাই। জীবজগতে এমন কোনও প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে না,—যাহা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে সুমীমাংসিত হয় নাই। আমরা কি শুভক্ষণে এখানে আসিয়া এই সাধুসঙ্গ লাভ করিলাম! আমরা ভুলিয়াও আর অসৎসঙ্গ করিব না, ইহা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছি। আহা! সাধু সঙ্গের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! আমাদের অতিকঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইয়া শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা সাধুগণের অপার অহৈতুক কৃপারই ফল। কিন্তু আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই মহা অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে—এই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন।

পরদিন সেই সাধুসভায় শ্রবণ শেষ করিয়া সাধুগণের নিকট মর্ম্মান্তিক দুঃখ নিবেদন করিয়া, বিদায়ের প্রস্তাবনা করিলেন। সাধুগণ বলিলেন,—বাবা! তোমাদের কোথায় যাইতে হইবে? শ্রীনবদ্বীপের নাম শুনিয়া সাধুগণ একযোগে উচ্চৈস্বরে হা গৌরাঙ্গ! হা শচীনন্দন! হা মহাপ্রভু! হা পঞ্চতত্ত্ব! বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকলেরই অঙ্গ পুলকিত, চক্ষে অবিরাম অশ্রুধারা-বিগলিত হইতেছে; কেহ বা ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! তাঁহারাও সাধুগণের সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কেহ কেহ যুবকগণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আহা আপনারা কত ভাগ্যবান্ তাই শ্রীগৌরধামে জন্মলাভ করিয়াছেন। বহুক্ষণ এইরূপ ভাবাবেশের পর একটু বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া বৈষ্ণবগণের মধ্য হইতে একজন বলিলেন,—ভাই সকল শ্রীবাসঅঙ্গনে কয়েকজন শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধ ভক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিবেন ও তাঁহাদিগের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অপূর্ব্ব হৃদ্‌কর্ণ-রসায়ন-সর্ব্বসিদ্ধান্তচূড়ামণি সর্ব্বরসময় বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। এই সঙ্গ যদিও ত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে হৃদয়-বিদারক ও অসহ্য হইয়াছিল। তথাপি তাঁহাদের পদধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরদিন শ্রীধাম-নবদ্বীপে আসিয়াই শ্রীবাস অঙ্গনে বৈষ্ণব দর্শন করিতে গেলেন। কারণ তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা—সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-ব্যতীত জলহীন মীনের ন্যায় দুস্তজ্য হইয়াছিল। ধন্য সাধুসঙ্গের প্রভাব।

ইতি ভজন-সন্দর্ভ-গ্রন্থ প্রথমবেত্ত সমাপ্ত।